# চতুর্বর্গ

চিরঞ্জীব সেন

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম বর্গ

# পৃথিবীর এই দুঃসময়ে

ছুটির দিনে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট, অনেকদিন ধরে এটাই নিয়ম। আজও বসেছি আমরা, —আমি, স্ত্রী মল্লিকা, ছেলে অরিন্দম, তার স্ত্রী অর্পিতা। ছেলে অফিসে যায়, তাই খবরের কাগজ প্রথমে ওর তারপর আমার। এটাও নিয়ম, এমন কি ছুটির দিনেও। ছেলে খুব আগ্রহ নিয়ে কাগজ পড়ছে, একসময় পড়া শেষ করে টেবিলে রাখতে আমি তুলে নিলাম। পড়া শুরু করার আগে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছি, পৃথিবী কেমন আছে আজ?

চায়ের কাপ ঠোঁটে লাগাতে যাচ্ছিল, ওর ভ্রূ-দুটো কুঁচকে গেল, ঠোঁটে সামান্য বাঁকা হাসি। —তার মানে?

মানে আর কী। কাগজটা তো পড়লি, পৃথিবীর শরীর কেমন জিজ্ঞেস করছি।

মল্লিকা আর অর্পিতা কৌতূহল নিয়ে একবার আমার মুখের দিকে, একবার অরিন্দমের মুখের দিকে। অরিন্দম চায়ে এক চুমুক দিয়ে কাপটা প্লেটে রেখে বলল, পৃথিবীর খবর আমি কি জানি? আমি আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে কী দরকার?

সে কী! তাহলে কী পড়লি? কোনো খবর নেই?

তা থাকবে না কেন। তার সঙ্গে পৃথিবীর কী সম্পর্ক। আমি কি জিয়লজিস্ট নাকি?

এটা ঠিক বললি না। তুই কেমন আছিস জানতে আমি কি ডাক্তারের কাছে যাব? তোর যদি অসুখ হয় তবেই ডাক্তারের খোঁজ, ভূমিকম্প হলে যেমন জিয়লজিস্টের খোঁজ পড়ে।

এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরেছে, এই ভাব নিয়ে অরিন্দম হাসল, তোমায় কথায় পেয়েছে, মজা করছ তুমি।

আমি ততক্ষণে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হেডলাইনগুলি পড়ে ফেলেছি। ডানদিকে আধপাতা জুড়ে একটি পরিবারের আত্মহত্যার ঘটনা, তার ছবিও অনেক। বাঁদিকের সিকিভাগে একটা বাস দুর্ঘটনায় ঊনচল্লিশজনের মৃত্যু। নিচে অনেকটা জুড়ে একটা বাচ্চাদের স্কুলে আগুন লেগে অনেক শিশুর মৃত্যু, আরো অনেকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। ফাঁকফোকরে আরো খবর, বন্ধুর হাতে ছাত্র খুন, ছাত্রী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় মুখে এ্যাসিড, দুর্বৃত্তরা চড়াও হয়ে স্বামীর সামনেই এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, মজা নয় মোটেও। পৃথিবীটা ভালো নেই, রক্তাক্ত শরীর, নিদারুণ বিপর্যস্ত।

অরিন্দম বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়েছে। হ্যাঁ, সমস্ত পাতা জুড়ে যত বাজে বাজে খবর।

হ্যাঁ তাই, কিন্তু তোর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, আশ্চর্য! আদার ব্যাপারী কেন, তুই তো এই জাহাজেরই বাসিন্দা।

তা না হয় হল, কিন্তু বলো তো, এসব খবরে আমার কী করা আছে? কোন ভূমিকায় নামতে বলছ আমাকে? মানুষজন বিকৃতমনস্ক, এসব থামানো যাচ্ছে না, প্রশাসন ব্যর্থ। কাগজ এসব ছেপে মুনাফা লুটছে। আমাদের ওপর এইসব খবর অনর্থক ভার জমিয়ে দেয়,

কিছুই করার নেই। আমার তো মনে হয়, খবরের কাগজ পড়া মানে শরীর-মনকে শুধু শুধু উত্যক্ত করা।

তার মানে! ধরে নিচ্ছি তোর কিছু করার নেই, তবু এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবি?

তাছাড়া আর কী। আমার নিজের কাজ আছে, তাতে মন দেওয়াই আমার কর্তব্য। আমি উঠি, বেরোতে হবে। অরিন্দম উঠে গেল, আমার মনের ওপর আরো ভার জমিয়ে।

হয়ত অরিন্দম ঠিকই বলেছে। মনে এসবের প্রতিক্রিয়ায় তার কাজের ক্ষতি হতে পারে। ওর যদি এসব প্রতিহত করায় কোনো ভূমিকা না থাকে, কেন অনর্থক নিজেকে জড়াবে? অথচ কাগজগুলি প্রতিদিন সকালে ব্যস্ত মানুষদের মন খারাপ করে দেয়, উত্তেজিত করে তোলে, ওদের প্রাত্যহিকতা বিষময় হয়।

কিন্তু আমি তো অবসর নেওয়া এক মানুষ। সময় পার করার জন্যে আমি এবং আমার মতো মানুষেরা এইসব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ব, মনকে বিষণ্ন করব, কিছু করতে না-পারার জন্য অবসন্ন হতে থাকব, এই পৃথিবী সম্পর্কে এক ভয়াবহ ধারণা তৈরি হবে আমাদের ভাবনাচিন্তায়। আমাদের রাগ হবে, এই রাগ প্রকাশ করারও কোনো উপায় থাকবে না।

বিকেলবেলায় ব্রজমাধববাবু আমাদের বাড়ি এসেছেন। প্রায় প্রতিদিনই আসেন, গল্প করেন, এটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল তিনি আসেননি। জানালেন, তাঁর সুগার কিছুতেই কমছে না। এত হাঁটাহাঁটি, নিয়মমতো ওষুধ খান, তবুও। বললেন, সুগার বড় পাজি রোগ।

অপেক্ষা করছি, কাল উনি আসেননি, নিশ্চই নতুন কোনো খবর দেবেন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তিনি শুরু করলেন,—গতকাল মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা খুব আতঙ্কের ভেতরে আছে, পাশের বাড়িতে আগের দিনই ডাকাতি হল। টাকা পয়সা, সোনার গয়না যা ছিল সব নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির কর্তা চাবি দিতে রাজি হয়নি, তাই ওকে বেঁধে রেখে কুড়ি বছরের মেয়েকে রেপ করেছে। মা বাধা দিতে গেলে মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। অজ্ঞান অবস্থায় রাত্রে নার্সিং হোমে দিতে হল, আইসিইউ-তে আছে, কন্ডিশন ভালো না। মেয়ে-জামাইকে বললাম, কদিন আমার বাড়িতে এসে থাকো, রাজি হল না। এ অবস্থায় বাড়ি ছেড়েও আসতে চায় না। পুলিশে খবর দিয়েছে, ওরা বলেছে নজর রাখবে। আমি তো বিশ্বাস করি না পুলিশের এসব নিয়ে মাথাব্যথা আছে। ওদের কাছে জলভাত এসব ঘটনা।

ব্রজমাধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন। আমার ভেতর থেকেও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, দমবন্ধ অবস্থা, কিছু বলতে পারলাম না। সকালবেলার কথা মনে পড়ছে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠা-জুড়ে ভয়ংকর ভয়ংকর সব ঘটনার দৃশ্যগুলি পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে, তার ভেতরে বসে আছি অসহায় আমি আর ব্রজমাধববাবু।

সহসাই একসময় ব্রজমাধববাবু নীরবতা ভাঙ্গলেন। আমাকে চমকে দিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো—কোথায় চলেছি আমরা! মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমরা কি সত্যিই মানুষ?

আমার যেন দিব্যচক্ষু। দেখছি, ব্রজমাধবের পৃথিবীর এক শ্বাপদসংকুল পরিণতি। তার ভেতরে ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চারপাশে কোনো জলের রেখা নেই, ওপরে উন্মুক্ত আকাশ নেই, শুধুমাত্র ভয়-কোলাহল ঘিরে আছে তাঁকে। যেন দূর থেকে তিনি আমাকে

ডাকলেন, আর আমি তক্ষুনি নিজের পৃথিবীটা দেখলাম। সংসার-জীবনের কাঠামোয় দাঁড়িয়ে, চারদিক থেকে ঘিরে আছে ভয়ংকর সব দৃশ্যগুলি। ছেলে, স্ত্রী, পুত্রবধূরা দেখতে পাচ্ছে না, অথচ আমি দেখছি কত তীব্র। এই বিষম অবস্থান আমাকে আরো অসহায় করে তুলল। আমার পৃথিবী থেকে ব্রজমাধবের পৃথিবী তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছি, তার ভেতরেই বলছেন, অথচ মজা দেখুন, ওদের টেবিলে পড়ে আছে তিনটে নেমন্তন্নের চিঠি, দুটো বিয়ের, একটা অন্নপ্রাশনের। সবই সেই পাড়ায়। বলতে বলতে বজ্রমাধববাবুর মুখচোখ বিকৃত হয়ে,— এখন ওর পৃথিবীটা আলো-আঁধারিতে কেমন রহস্যময়। বিস্ময়বিকৃত কণ্ঠে বললেন, এটাই আশ্চর্য, এমন সব ভয়ঙ্কর ঘটনা পাশে ঘটছে, তবু হেলদোল নেই, পাশাপাশি বিয়েও করছে লোকে, ছেলেপুলে হচ্ছে, অন্নপ্রাশন দিচ্ছে। ভেবে অবাক হই, মানুষ এমন নির্বিকারও থাকে!

ব্রজমাধবের বিস্ময় যেন আমার পৃথিবীতেও সঞ্চারিত হল,—ছেলের বিয়ে দিলাম বছরখানেক হয়নি, পুত্রবধূ মাসদুয়েক বাদে সন্তান উপহার দেবে, কিন্তু কোন পৃথিবীতে সেই সন্তানের জন্ম হবে, ভাবতে ভাবতে আমি যেন বেদনাগ্রস্ত হচ্ছি। ব্রজমাধববাবুর কথায় সায় দিয়ে বললাম, যা বলেছেন।

তিনি এর মধ্যে এককাপ চা খেয়েছেন। প্রতিদিন দু কাপ ওর জন্যে বরাদ্দ, দ্বিতীয় কাপের জন্য অপেক্ষা করছি, তিনি বললেন, আমাদের দিন প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু ছেলেমেয়েরা তো আরো অনেকদিন বাঁচবে। ওদের কথা ভেবে বড় দুশ্চিন্তা হয়। তাদের পরের জেনারেশনের কথা তো ভাবতেই পারছি না।

দেখলাম, ব্রজমাধবের পৃথিবীতে ভয়সংকুল অরণ্যটা দূরে সরে গেছে। সেই দূরবর্তী অরণ্যে সন্তানেরা, তাদের পরবর্তী সন্তানসন্ততিরা। সেই পৃথিবী থেকে সরে যাবার আগে বড় বেদনার্ত, বড় ভয়ার্ত তাঁর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হল, আমার পুত্র, পুত্রবধূরাও তাদের সন্তানদের নিয়ে এরপর অন্য অন্য পৃথিবীতে, আমার পৃথিবী তখন থাকবে না হয়তো কিন্তু এখন তা বিষাদ-ভাবনার মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ছেলে অফিস থেকে ফিরে চা-জলখাবার নিয়ে বসলে, তারপর ঘুমোবার আগে পর্যন্ত ডাইনিং রুমের টিভিটা ওর এবং অর্পিতার দখলে চলে যায়। টিভির পর্দায় তখন অদ্ভুত সব কান্ড ঘটতে থাকে। মাঝেমাঝেই নানা প্রয়োজনে ডাইনিং রুম পার হয়ে এ-ঘর থেকে অন্যঘরে যেতে হয়, যাতায়াতের পথে এবং রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসলে টিভির পর্দায় চোখ পড়েই। আর তখনই দ্যাখা যায় উদ্দাম নাচ-গান চলছে। মাঝেমাঝে টুকরো টুকরো দৃশ্যে কখনো জাতীয়তাবাদ, কখনো আদর্শ-খচিত কথোপকথন এবং স্পষ্ট বোঝা যায়, পৃথিবীতে শুধু প্রেমের জন্যই যাবতীয় উদ্যম, এছাড়া যাবতীয় দুষ্টের দমন অবলীলায় সেখানে ঘটে চলেছে। ছেলে মাঝেমাঝে আমাকে ও তার মা-কে নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কোনো আড় নেই ওর কথাবার্তায়, আমি শুধু শুনি আর মাথা নাড়ি। ওর কখনো বিহ্বল, কখনো উদ্ভাসিত মুখচোখ দেখে কোনো বিতর্কে যাই না। আমাদের বাড়িতে এটাই নিয়ম, রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসা। তখন ছেলের পৃথিবীতেই আমাকে থাকতে হয়, যদিও সে-পৃথিবী আমার খুব পরিচিত বা তাতে নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করি, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।

বুঝতে পারি, ছেলে এবং ছেলের বৌ ঐ পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। হয়তো সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঐরকম একটা পৃথিবী ওদের কাঙ্ক্ষিত, এরপর ঐ পৃথিবীটা সঙ্গে নিয়েই ঘুমোতে যাবে। লক্ষ্য করেছি, আমার স্ত্রী স্বচ্ছন্দ থাকে সেখানে। হয়তো ওদের এই স্বাচ্ছন্দে তার নিজের জীবনের সার্থকতাও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আমি শুধু ভাবি, কত বিচিত্র পৃথিবীর মেলবন্ধন ঘটে চলেছে আমাদের জীবনে। সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সারাদিন আমার পৃথিবী যেভাবে ভারাক্রান্ত হয়, অথবা ব্রজমাধববাবু প্রতিদিন তাঁর যে-পৃথিবী আমার সামনে এসে উদ্ঘাটিত করেন, সার্বিক পৃথিবীর ভেতরে আমরা যার যার পৃথিবী নিয়ে একটা আশ্চর্য ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছি, কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই, কোনোরকম বিতর্ক উত্থাপন না করেই।

ছেলে কখনো কখনো বলে, তোমাদের আমি বুঝতে পারি না বাবা। রিটায়ার করেছ, সারাদিন কত সময় তোমাদের। ভোগ করছ না কিছুই। একদিন তুমি আর মা গিয়ে আইনক্সে সিনেমা দেখে এসো।

মল্লিকা তখন আঁতকে উঠে, থাক থাক, আর দেখে কাজ নেই। যা টিকিটের দাম।

আমি বলি, ঘরে বসে টিভিতেই তো দ্যাখা যাচ্ছে সব। এতদূরে কষ্ট করে যাওয়ার কী দরকার।

এতদূর! এটা কি একটা কথা হল? ট্যাক্সিতে যাবে-আসবে।

সেটাও তো বেশ খরচ। একটা সিনেমা দ্যাখার জন্য—

ছেলে হাসতে হাসতে বলে, তোমাদের সেই এক কথা। খরচ আর খরচ। টাকা তো কাগজের টুকরো, কী দাম আছে তার? এর বদলে যা পাবে তার দাম অনেক বেশি। টাকা-পয়সা জমিয়ে কী করবে বলো তো? সল্টলেকে থাকো, পাশেই সিটি সেন্টার। একদিনও গেলে না সেখানে, কোনো মানে হয়? কার জন্যে তবে তৈরি করা হল?

এসব আমাদের জন্য নয় বাবা। যাদের জন্য, তারা তো সব যাচ্ছে।

তোমাদের জন্য নয় কেন? তোমরা কি অন্য গ্রহের লোক?

এরপর আর তর্ক চলে না। শুনি আর মৃদু হাসি।

ছেলে নিরস্ত হয়ে বলে, তোমাদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আমার পোষায় না। কতবার বললাম, সমস্ত ব্যাঙ্ক আজকাল লোন দেবার জন্যে বসে আছে, ডাকাডাকি করছে। লোন নিয়ে একটা গাড়ি কেনো, ড্রাইভার রাখো, যেখানে খুশি ঘুরতে যাও। তা না, বাসে-ট্রামে ঘুরছ আর ঘরে মন খারাপ করে বসে থাকছ। মাঝে মাঝে আলমারি খুলে দেখছ, কত হাজার টাকা এন এস সি আর কত হাজার টাকার কিষাণ বিকাশ। সারাজীবন কষ্ট করেই গেলে, কত মজার জিনিস আছে, কত ভোগ করার জিনিস আছে, চোখ মেলে দেখলে না।

হাসিটা মুখে আর থাকে না, তির্যক হয়ে মনের ভেতরে ঢোকে। মনে মনে বলি, সারাজীবন কষ্ট করেছি বলেই তো তোদের মনে আনন্দের রেশ এখনো আছে।

প্রতিদিন সন্ধেবেলা হাঁটতে বেরোই। আধঘণ্টা হেঁটে কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ি। সেখানে কিছুটা বিশ্রাম, মূলত আড্ডা এবং চা খাওয়া। তারপর আধঘণ্টা হেঁটে বাড়ি ফিরে

আসা। এটা প্রতিদিনের নিয়ম হয়ে গেছে। আজ গেলাম বিশ্বপ্রিয়-র বাড়ি। সুগার আর প্রেসারের ধাক্কায় বেচারা কাবু। বাড়িতেই ছিল, সস্ত্রীক আমাকে সাদর আহ্বান করল।

যেভাবে সাধারণত আড্ডা শুরু হয়, বললাম, যা বিচ্ছিরি গরম পড়েছে, এটুকু হেঁটেই জামা ভিজে গেল।

বিশ্বপ্রিয় কিছু বলল না। কথা এগোচ্ছে না দেখে ওর স্ত্রী গৌরী বলল, দেখুন না, ডাক্তার ওকে রোজ অন্তত একঘণ্টা হাঁটতে বলেছে। সুগার, প্রেসার এত বেশি, কিছুতেই কমছে না। মন খারাপ করে বাড়িতে বসে থাকলেই হবে?

মন খারাপ কেন, কী হয়েছে?

কী আর হবে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তা। রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ঘুমের ওষুধ খেত, এখন তাতেও কাজ হচ্ছে না। এর ওপর যদি ওর কিছু হয়, আমি কোথায় দাঁড়াব বলুন তো?

ঠিকই তো, অকারণ দুশ্চিন্তা করছ কেন? ছেলেমেয়েদের নিজের সংসার হয়েছে, নিজেদের সমস্যা ওরা নিজেরাই সামলে নেবে। তুমি ভেবে কী করবে?

বিশ্বপ্রিয় এতক্ষণে মুখ খুলল।—চিন্তা না করে উপায় আছে? এই খবরের কাগজগুলো হয়েছে আর এক জ্বালা। পৃথিবীতে কি ভাল কিছু ঘটছে না? সমস্ত পাতা জুড়ে শুধু আজেবাজে খবর, খবর জানিয়ে মহা উদ্ধার করছে আমাদের।

তা যা বলেছ, কিন্তু ছেলেমেয়েদের তাতে কী সমস্যা হল?

সমস্যা কী একটা? মাধুরীর মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল, কাল রেজাল্ট বেরিয়েছে। আর এই সময় কত যে উল্টোপাল্টা খবর বেরোচ্ছে। মেয়েটা পড়াশোনায় যথেষ্ট ভাল কিন্তু এবারে রেজাল্ট খুব খারাপ হয়েছে। ওর বন্ধুরা সবাই ভাল নম্বর পেল, কিন্তু ওর এমন হল কেন কে জানে, সবসময় মুখ গোমড়া, থমথমে মুখ, কারো সঙ্গে কথা বলছে না, বন্ধুদের সঙ্গেও না। মাধুরী আর সমীর ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে, মেয়ে যা জেদি আর সেন্টিমেন্টাল, কী যে করে বসে। মাধুরী ফোন করেছিল, রেজাল্ট যা হবার হয়েছে কিন্তু মেয়ের ভাবগতিক দেখে—, ফোনে তো কেঁদেই ফেলল।

চিন্তার কথাই বটে। ভয় আমাকেও ছুঁয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করা সমীচীন নয়। খুব দৃঢ়ভাবে না হলেও আশ্বাস দিলাম, না না কিছু হবে না। রেজাল্ট ওকে হতাশ করেছে তাই মন খারাপ, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। খাতা দ্যাখায় নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল হয়েছে, বি. এ. পরীক্ষায় সব মেক-আপ হয়ে যাবে। আসলে ঠিকই বলেছ, খবরের কাগজ পড়ে পড়ে মাধুরীর মনে ভয় ধরেছে।

বিশ্বপ্রিয় কী ভাবতে ভাবতে থমকে গেছে দেখে গৌরী তার ভূমিকায় এগিয়ে এল, আপনি যা বলছেন হয়তো ঠিক কিন্তু ওদের তো মেয়ে, বলছে, কতদিন আর পাহারা দেব মেয়েকে, যদি কিছু ঘটে যায়? সত্যি বলতে কি, আমরাও ভয়ে ভয়ে মরছি। আবার দেখুন না, অজয় বোম্বের যে কোম্পানিতে চাকরি করে সেখানে ওর কলিগের ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে। পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছে। অজয়েরও ওই বয়েসের ছেলে আছে। আর সিনেমায় এইসব ছবি হরদম দ্যাখায়। প্রণতির ওপর ভরসা না করে অজয় নিজেই

ছুটি নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে সবসময়। স্কুলেও বসে থাকছে। পুলিশকে বলেছে, কিন্তু ওদের ওপর কি ভরসা রাখা যায়? এভাবে কদ্দিন করবে ও?

আমার মনেও শঙ্কা চেপে বসেছে, তবু বললাম, ভয় পেয়েছে ঠিকই, ভয় পাবারই কথা কিন্তু মনে হয় না একই অফিসের লোককে নিয়ে পরপর একই কান্ড করবে। তবু সাবধানে থাকতে হবে, কিন্তু বেশি দুশ্চিন্তা করতে বারণ করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছাড়া কিছু করার নেই।

বিশ্বপ্রিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কোন দেশে বাস করছি বলো তো!

আমি যোগ করলাম, দেশ নয় বিশ্বপ্রিয়, কোন ভয়ংকর এক পৃথিবীতে বাস করছি আমরা? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'চলি' বলে উঠে দাঁড়াতে গৌরী বলল, কী লজ্জার কথা, আপনি এলেন আর আমরা কেবল নিজেদের কথা নিয়েই। বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

বসতে হল। তারপর চা খেয়ে ফেরবার পথে নিজেকে বড্ড ভারি মনে হচ্ছে। শরীর? না, মনটা? বুঝতে পারছি না।

প্রতি রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে আধঘণ্টা চুপচাপ নিজেকে নিয়ে বসি। এটা অভ্যেস হয়ে গেছে, কেন না নিজেকে বুঝে না নিলে কে ঘুমোতে যাচ্ছে, হদিস থাকে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে যে 'আমি' সারাদিন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে ঘুমোতে যাবার আগের 'আমি'তে পৌঁছোল, সে কতটা উদ্বুদ্ধ অথবা উন্মুক্ত কিংবা চূর্ণ, এটা বুঝে নিতে না পারলে ঘুমের ভেতরে যাবার অভিযান অনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে সেই হদিস অত্যন্ত জরুরি।

আজ বসতে গিয়ে দেখলাম, নিজের পৃথিবীটা কোথায় যেন তলিয়ে গেছে। অথচ অরিন্দম-মল্লিকা-অর্পিতার পৃথিবী, ব্রজমাধবের এবং বিশ্বপ্রিয়-র পৃথিবী,—এরা প্রবলভাবে উপস্থিত আমার চারপাশে। অরিন্দম, তার চাকরি এবং এতদিনের অবদমিত বাসনা নিয়ে যে পৃথিবীতে, যার সঙ্গে সহযোগে আছে তার স্ত্রী ও মা, অন্যান্য পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে চায় না। নিজের পৃথিবীকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়ে অন্যান্য পৃথিবীর সঙ্গে সাযুজ্যে নেই, অন্য পৃথিবীর প্রতি কোনো সহমর্মিতা দূরে থাক, সহানুভূতিও তিলমাত্র নেই। এমনকি সেইসব ভয়ংকর তথ্যকে উপেক্ষা করতে চায়, নেহাৎই তা প্রচার বলে অবজ্ঞা করে। এমন এমন সব কান্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ তাদের প্রতি নিরুদ্বেগে সে শুধু নিজের পৃথিবীটাই চেনে, বরং আরো আরো আগ্রাসনে উৎপাত ঘটিয়ে যেতে তৎপর। আমার পৃথিবীতে এতকাল থাকার পর নিজের পৃথিবী গড়তে গিয়ে ছিন্নমূল হয়ে গেল! এমনকি আমার নিজস্ব পৃথিবীর ওপরও তার চাপ এমন নির্মম! আশ্চর্য এই, সার্বিক পৃথিবীতে বাস করতে গেলে, তাকে সুষম করতে যে সহবৎ চাই, এ তত্ত্ব তার বোধেই নেই। ওর এই উন্মার্গগামীতায় আমার পৃথিবী আরো সংকুচিত হয়ে আরো বেশি বিভ্রান্ত। পুরনো কক্ষ থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রসৃতি আবর্তনে না থেকে কীভাবে বিরুদ্ধাচরণের পথে চলে যায়, এই বিস্ময় নিয়ে আমি, কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এটা ঘটল, কোনো বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়ছে না এখন।

অথচ ব্রজমাধব ওর পৃথিবীতে গভীর উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। প্রতিবেশী অন্য পৃথিবীতে ভয়ংকর সব তথ্যের যে সমাবেশ, তার পৃথিবীতে এখনো নেই, ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় শুধু। অরিন্দমের মতো তা উপেক্ষা করা বা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বা সাহস তাঁর নেই। হয়তো

তারুণ্য অরিন্দমকে এই সাহস দিয়েছে, কিন্তু তার তো মনে রাখা উচিত, আরো অনেকদিন এই সার্বিক পৃথিবীতে বসবাস করবে সে, আমাদের চেয়ে অনেক অনেকদিন বেশি। সেই পৃথিবীটা সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ হওয়া উচিত, এ-তো বরং ওরই কাম্য হবে। ব্রজমাধববাবুর যে উৎকণ্ঠা তা নিজের পৃথিবীকে ঘিরেই, কেননা মেয়ের পৃথিবী তারই অন্তর্গত হয়ে গেছে। হয়তো দূরবর্তী অন্য পৃথিবীর প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতার কারণে নয়, তবু তো সার্বিক পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিচলিত। এক্ষেত্রে কী করতে পারেন তিনি? যারা দায়িত্বে আছে অর্থাৎ পুলিশ ও প্রশাসন, তাদের প্রতি আস্থা নেই তাঁর, এ কারণেই নিজের পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু না ঘটলেও উৎকণ্ঠা গ্রাস করে আছে তাঁকে। তাঁর সহমর্মী হয়ে আমারও কিছু আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল, অন্তত সান্ত্বনা, কিন্তু পারিনি কেননা নিজের পৃথিবীতে যে আশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, অন্য পৃথিবীকে সে ভরসা দেব কী করে?

বিশ্বপ্রিয়-গৌরীর পৃথিবী তো আরো বিপর্যস্ত। তাদের প্রসৃতিরা যে পৃথিবীতে, তার উৎকণ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব পৃথিবীও স্বস্তিতে নেই। বিশ্বপ্রিয়-র যদি কিছু হয়ে যায়, এই ভাবনায় গৌরী স্বাভাবিকভাবে নিজের পৃথিবী নিয়ে উৎকণ্ঠিত, সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠার চেয়ে বেশি। কিন্তু বিশ্বপ্রিয়-র মনে নিজের বিষয়ে ভাবনা অতটা গভীর নয়, তাই ওদের চিন্তায় চিন্তায় নিজের পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনছে, গৌরীর কথা ভাবছে না। আমি ওকে আশ্বাস দিতে চেয়েছি কিন্তু তা কি নিজের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য ছিল? ছিল না বলেই ওদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে এবং এখনো সেই ভার আমার পৃথিবীতে। অরিন্দমের জীবনে এ পর্যন্ত তেমন কোনো অশুভ সংকেত নেই, তাই এখনো আগ্রাসনের ভেতরে, একই কারণে আমার পৃথিবীও হয়তো ততটা বিপর্যস্ত নয়, তবুও তো ভার টের পাচ্ছি আমি, এক অজানা আশঙ্কা ঘিরে থাকছে আমায়।

রাত্রি গভীর হচ্ছে ক্রমশ। চোখে ঘুম নেই, অন্যদিনের মতো অস্বস্তি নয়, বরং গভীর ভাবনায় তলিয়ে যেতে যেতে সার্বিক পৃথিবী তার পাপড়ি মেলছে ক্রমাগত। —সেই ছোটবেলার পৃথিবী—অনাবিল। তা যে আমার একান্ত পৃথিবী ছিল তা নয়, তবু কেমন এক সুঘ্রাণ ছিল সেই পৃথিবীতে।—নিজেকে প্রসারিত করা বাবা-মা-র স্নেহমমতায়, বন্ধুদের সাহচর্যে। কোথাও কলুষ ছিল না এতটুকু। ধীরে ধীরে নিজের পৃথিবী গড়ে উঠল, তারপর সেই পৃথিবীর জন্য ভবিষ্যৎ-ভাবনা, কোমল কল্পনায় তা আরো প্রসারিত হয়েছে। কত কত মহাপুরুষের সাহচর্য, তাদের বাণীসমৃদ্ধ বইগুলি, আমাকে সমৃদ্ধ করতে করতে এক সুন্দর পৃথিবীর দিকে ক্রমশ—সংসার হল, ছেলে এসে তাকে আরো প্রসারিত করল, তার পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ। ধীরে ধীরে বন্ধুদের, প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদের আলাদা আলাদা পৃথিবী। তাদের সঙ্গে আমার পৃথিবীর সুন্দর সহবৎ এখনো। কোথাও কোথাও কলুষ হয়তো ছিল, চাপা পড়ে থাকত সহনশীলতায়।

এরপর কবে থেকে কীভাবে যেন বদলে গেল সব। এরই মধ্যে নানা প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলে তার নিজস্ব পৃথিবীর দিকে। আমার পৃথিবীতে সে আর আঁটল না, আমার পৃথিবীতে আমাকে একা রেখে আমারই প্রতিযোগী। এখন সহনশীলতা

কাজ করে না কোথাও, রাজনীতি, সামাজিক অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরে গভীরে কলুষ এতটাই সঞ্চারী, ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রতিযোগিতার, ধর্ষকামিতার এক গভীর কালো মেঘ কোথা থেকে এসে এতটাই সর্বগ্রাসী, ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, সন্ত্রস্ত সবাই, যে যার নিজের পৃথিবীকে আগলে রাখার জন্যে অন্য পৃথিবীর প্রতি নিস্পৃহ অথবা প্রতিযোগিতায়, সার্বিক পৃথিবীর ভেতরে এরা সবাই কেমন এক অন্তর্গত দূরত্ব রেখে অবস্থান করছে। সবার পৃথিবী এত ছোট হয়ে গেছে, এত সংকীর্ণ, সার্বিক পৃথিবীর তাৎপর্যই কারো কাছে নেই।

এরই ভেতরে আমার পৃথিবীকে তুলে আনতে চেষ্টা করলাম। তরল বুদবুদের মতো তার অস্তিত্ব, যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো পীড়নে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে। অথচ তার ওপরে সেই সার্বিক পৃথিবীর প্রতিবিম্ব, অন্যান্য সংকীর্ণ পৃথিবীগুলোরও। কিন্তু কতদিন তাদের ধারণ করবে এই ভঙ্গুর বুদবুদের মতো পৃথিবীটা, চারপাশে নিরন্তর আস্ফালনের ভেতরে। বুদবুদটির চোখে এখনো গভীর স্বপ্ন, কিন্তু সেই স্বপ্ন নিয়ে কী করতে পারে সে। চারদিক থেকে উঠে আসছে হিংস্র চোরামুখের সারি, ঘিরে ফেলছে তাকে। তার স্পর্শকাতরতা আক্রান্ত হয়ে, তবুও এর ভেতরে স্বপ্নের রূপদান হয়তো সম্ভব ঘুমের ভেতরে চলে গেলে, যেখানে প্রতিযোগী পৃথিবীরা নেই, চোরামুখের ঊর্দ্ধগামিতা নেই; কিন্তু ভয় হয়, বুদবুদটা ফেটে গিয়ে যদি আর নিজেকে ফিরে না পায়, ঘুম আর না ভাঙ্গে তারপর। চারপাশে কোথাও সাহায্যের হাত বাড়ানো নেই, তার হাত ধরবার জন্যেও কেউ কোথাও নেই, যে যার নিজের পৃথিবীতে হাত গুটিয়ে বসে আছে।

একা একা তাই তরল বুদবুদের মতো পৃথিবীটায় কেমন অলৌকিক ভেসে আছি সার্বিক পৃথিবীতে। সামনে অবারিত ঘুমের সাম্রাজ্য। সেখানে যাব কি যাব না এই দোটানায় অনির্বচনীয় থমকে গেছি আমি।

## প্রেম ও ভালবাসার গল্প

স্বপ্নময় আজ বরের পোষাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। বিয়ের দিন বরযাত্রী হওয়ার এবং বৌভাতের, দুটো নিমন্ত্রণই আছে। যাবে কি যাবে না, স্থির করে উঠতে পারে নি। যাওয়া উচিৎ কিনা এ ভাবনাটাই বিশেষ এখন। বিয়ের কার্ডটা হাতে নিয়ে, সেখানে ছাপা অক্ষরগুলো অনেক অনেক দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছে। এলোমেলো ছবিগুলো, তাদের পরম্পরা তৈরী করতে নিখুঁত সম্পাদনা দরকার। এর জন্যে একটা সুস্থির মন চাই, তার হদিস পাচ্ছে না। মনের আকাশ মেঘলা হয়ে, সেখানে পরিষ্কার সূর্যোদয় না হলে মনের স্থিরতা আসবে না। এই স্থিরতা আনতে বোধের ওপর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এটা জানে, তবু সেই ঘটনাটা জরুরি হয়ে উঠছে না। এক গভীর অনিশ্চয়তার ভেতরে থাকতে হচ্ছে তাকে।

অনন্যা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, তার মন, হৃদয় ও বোধের ভেতরে এই অনিশ্চয়তা। জানালার চোখ দিয়ে দূরে পার্কটা দেখছে। প্রতিদিন না হলেও, কখনো কখনো দৃষ্টিতে পড়েছে, কিন্তু আজ পার্কটা অন্যরকম। মনে হল, ওটা স্বচ্ছন্দে ভাবনার পটভূমি হতে পারে। পটভূমি না থাকলে ছবিগুলি সাজানো যাবে না। তা হয়ত এরপর পাল্টাবে, তা হোক, নতুন নতুন স্তরে নানা মাত্রার ছবিগুলি ঠিক বিন্যাসে রেখে—কিন্তু এজন্যেও মনকে ঠিকমত প্রস্তুত করা দরকার।

বরং অন্য ছবিগুলো এনে, যা এখানে প্রসঙ্গ নয়, গ্রন্থনার আগে পূর্বকথার মত সাজানো যাক—

ছোটবেলায় ঐ পার্কে খেলত অনন্যা। তখন কত বড় মনে হত পার্কটাকে। স্কুল থেকে ফিরেই টিফিন না খেয়ে ছুট। অলোক, সুবোধ, মিতালি, বিশাখারাও আসত। তারপরে ছুটোছুটি, কীসব খেলা মনে নেই, ছুটোছুটিতেই মজা ছিল। বুড়িছোঁয়া, চোর-পুলিশ এ খেলাগুলি মনে আছে। সুবোধটা ছিল বোকা, সহজে ধরা পড়ে যেত। এখন ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, ভাল মাইনের চাকরিও পেয়েছে। একদিন শোভাবাজারের মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, বাড়ি ফিরছে, স্যুট-টাই পরেছে, কেমন বোকা-বোকা লাগছিল। অনন্যাকে দেখে 'আরে তুই!' বলে একটা লাজুক হাসি, তারপর হাসিটা আস্তে আস্তে মেটেরঙের হয়ে গেল। 'তোকেএখন বেশ বড় বড় লাগছে', একথাটা কেন যে বলল, এরপর আর কোনো কথাই বলতে পারল না।

তুলনায় অলোক কিছুটা চুপচাপ, খুব বেশী ছোটাছুটি করত না। একদিন তখনো কেউ আসেনি, শুধু অলোক আর অনন্যা। 'চল, ঐ বেঞ্চি টায় বসি', অলোক একথা বললে অনন্যা উত্তর দিল না—ওরা দুজনে গিয়ে বেঞ্চি তে বসল। কী কথা যে বলেছিল ওরা, আজ আর মনে নেই কিন্তু সবটাই অন্যরকম। সেই অনুভবটা অনেকদিন, আজও বুকের ভেতরে। অলোক স্কুলমাস্টারির বেশি কিছু পায় নি, তা-ও যেন কার সুপারিশে, একটু বেআইনিভাবেই। এখন কবিতা লেখে। মাঝে মাঝে দ্যাখা হয়, অনন্যা একদিন বলল, কবিতা লিখিস শুনলাম। কেমন লিখিস, একদিন আয় না আমাদের বাড়ি, শুনব তোর কবিতা। হাতে একটা মুদ্রা করে অলোক

বলেছিল, দূর দূর। ব্যর্থ কবির কবিতা শুনে কী হবে? কেউ ছাপে না, ছাপলেও কেউ পড়ে না। কলম নিয়ে হিজিবিজি কাটি, এই আর কি।

হিজিবিজিটাই শুনব। একদিন আয়। ও আসে নি, অনন্যাই জোর করে ওর বাড়ি গিয়েছিল। অনেকগুলি কবিতা শুনেছে সেদিন, কেমন যেন, কিছুই বোঝা যায় না। যে-আশায় কবিতা শুনতে চেয়েছিল, সেই পুরনো অনুভূতি ফিরে এলো না তো? অলোকের মন থেকে সেই বোধ হয়ত হারিয়ে গেছে, কিংবা আছে, এই কবিতাগুলির ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে, অনন্যার মনে ধরা পড়ল না।

অনন্যা কিন্তু এসব কিছুই বলল না। শুধু হাসল। বেশ লিখছিস তো, কোথায় ছাপে আমায় বলিস, পড়ব। কিরে, চা খাওয়াবি না?—চা খেতে খেতে অনেক কথা বলল ওরা, এর ভেতরে কোথাও সেই ছোটবেলার কথা নেই, সেই অন্যরকম অনুভূতির ছোঁয়া নেই।

মিতালি খেলতে খেলতে খুব ঝগড়া করত। রোজই। সবাই রেগে যেত। কিন্তু দ্যাখা গেল তো, ও-ই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী! কলেজে পড়তে পড়তেই আই আই টি-পড়া একটা ছেলেকে ধরে ফেলল। তারপর বিয়ে করে দুজনেই স্টেট্সে চলে গেছে। কিছুদিন আগে নিউ মার্কেটে দ্যাখা হল, চুল বব্ করেছে, দেখতেও ঝলমলে। বরটা তুলনায় অত চকচকে নয়। তা হোক, মনে হল, ভালই আছে ওরা। অথচ বিশাখা ওর চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে ছিল, এখনো তাই। একটা ব্যাঙ্কের কেরাণীকে বিয়ে করেছে, একদিন বরকে নিয়ে অনন্যার বাড়ি এল। কেন এসেছিল? বরটা ভাল নয় মোটেও, ওর চাউনিটা খারাপ। অনন্যার খারাপ লাগছিল, কী করবে ও, বিশাখার জন্য কষ্ট হচ্ছিল শুধু। মনে মনে বলেছিল, ভাল থাকে যেন বিশাখা। ওরা এখন হায়দারাবাদে থাকে, আর কোনো খবর পায় নি। খবর নেয়নি বলে আফশোস হচ্ছে, একদিন ওর বাড়ি গিয়ে জেনে আসতে হবে।

এখন পার্কটা দেখে নতুন মনে হচ্ছে অনন্যার। পুরনো পার্ক ওখান থেকে উঠে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গিয়ে এখন নতুন অলোক-সুবোধ-মিতালি-বিশাখারা ওখানে খেলছে। এরপর ওরাও ছড়িয়ে যাবে, নতুন করে আবার খেলার আসর....অনন্যার চোখে কি জল? কেন!

পার্ক থেকে উঠে অনন্যা এরপর কোথায় গেল? একস্তর থেকে অন্যস্তরে পৌঁছতে মাঝখানে কোনো ধাপ থাকে? সেখানে শূন্য সময়ের অলৌকিক খেলায় এই বদলে যাওয়া! নাহলে কলেজ-চত্বরে পৌঁছল কিভাবে, তার হদিস নেই কেন?

সেই কলেজ-চত্বর কি এখনো সেইরকম? সেই দৃশ্যগুলি এখনো অনন্যার মনে ভেসে আছে।—ভিড় করেছে কত ছেলে-মেয়ে ভর্তি হবার জন্যে। তাদের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে গেল, জেগে থাকল শুধু স্বপ্নময়, বিভাস, অর্পণ, সুতপা, অনিন্দিতা, আর মাধুরী। দিনের পর দিন ক্লাশের পর ক্লাশ—পি.ডি-র ক্লাশটা করেই সিনেমায় যাব বুঝলি, কে বি-র ক্লাশটা বোর, সময় নষ্ট করার মানে হয় না। অনিন্দিতা ক্লাশটা করবি? তাহলে নোটটা দিস ভাই লক্ষ্মীটি। তোরা তাহলে ক্যান্টিনেই আড্ডা মারবি?—মাধুরী গেলে বিভাস আর অর্পণ যাবেই। হবে না কেন, টিভি সিরিয়ালে কত তো মেয়ের মুখ, মাধুরীর মত কি একটাও? মাধুরী সবসময় নিজের চারপাশে একটা দূরত্ব রাখে, খুব ভাল, যা হ্যাংলা ছেলেগুলি। সুতপা আবার একটু

আলগা-আলগা, ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে দিবাকর না কে ওর সঙ্গে কোথায় কোথায় যায়। ছেলেটা অন্য কলেজে পড়ে, ঠিক সময়ে কলেজের গেটে এসে হাজির। তবু সবার থেকে স্বপ্নময় ছিল আলাদা। বেশী মাখামাখি নেই, তেমন দূরত্বও রাখে না। ওর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলা যায়, সিনেমায় যাওয়া যায়, রেস্টুরেণ্টে বসে আড্ডা দেয়া যায়। মাধুরীর মধ্যে বিশাখা, সুতপার মধ্যে মিতালি, অর্পণের মধ্যে বিশাখার বর, স্বপ্নময়ের মধ্যে অলোককে কেন খুঁজে পায় অনন্যা, বুঝতে পারে না। ওদের মধ্যে সত্যিই তো কোনো মিল নেই।

তারপর কিভাবে কেটে গেল চার-চারটে বছর! এর মধ্যে স্বপ্নময় চলে গেছে যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয় নি, নতুন সিনেমা এলে ফোনে কথা বলে প্রথম শো-তে যেতেই হবে। স্বপ্নময়ের বাড়িতেও গেছে, মাসীমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ঠিক মায়ের মত। নানারকম মজার কথা বলে হাসাতেন খুব। স্বপ্নময়ও এসেছে ওর বাড়ি, মা নেই, বাবার সঙ্গে বসে কত গম্ভীর-গম্ভীর কথা। অনন্যা হাসত, স্বপ্নময়ও বাবাকে আড়াল করে হাসত। বাবা সব ব্যাপারেই সিরিয়াস, এমনকি কলেজে নিয়মিত ক্লাশ করা নিয়েও, স্বপ্নময় সেই কথায় সায় দিত। বাইরে বেরিয়ে স্বপ্নময়ের অভিনয়-ক্ষমতার প্রশংসা করলে বলত, কথাটা তো ঠিকই, আমরা মানতে পারছি না বলে তার গুরুত্ব কমে যাবে কেন? এদিকে অর্পণটা বড় বেশী মাখামাখি শুরু করেছিল মাধুরীর সঙ্গে। মাধুরী পছন্দ করত না বোঝা যেত। তবু ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে মাধুরীর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল, এমন হ্যাংলা। বি.এস.সি. পাশ করেই মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেল, এখন বরের সঙ্গে দিল্লীতে, ম্যানেজমেণ্ট পাশ-করা ছেলে। ঠিকই করেছে। অর্পণ হতাশ হয়ে মাধুরী সম্পর্কে যা-তা বলত—অকৃতজ্ঞ, কী না করেছি ওর জন্যে। আশ্চর্য, কী করেছে? কী করার ক্ষমতা আছে ওর? তারপর তো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে সিগারেট, মদ, আরো কত কি। অনেকদিন ওর কোনো খবর নেই। কিছুদিন আগে স্বপ্নময় বলেছিল, কোন একটা এজেন্সি নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরে, বিয়েও করেছে এর মধ্যে। এই তো মুরোদ।

বরং বিভাস, সুতপা, অনিন্দিতারা বেশ আছে। তিনজনই ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে বি. টেক-এ ভর্তি হল। মাঝে মাঝে অনন্যার বাড়িতে ওরা আসে, আড্ডা মারে, বলে, সিরিয়াসলি পড়াশোনা করছে। 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু—', অনন্যার মুখে প্রশ্নচিহ্নগুলো পড়তে পড়তে বিভাস বলেছে, যা ভাবছিস তা নয়। বেশ আছি, কোনো ঝিলিক নেই, টেনশনও নেই। 'তাই বুঝি—', অনন্যা তবু নিরস্ত হচ্ছে না দেখে অনিন্দিতা হেসেছে, ঘাবড়াস না মোটেও, চুলোচুলি করারও সময় নেই, যা পড়ার চাপ, সেশনাল আর ল্যাব। 'সেই তো দেখছি, কী হবে তাহলে?' বলেই হেসে ফেলে অনন্যা।— 'এখনো একসঙ্গেই আমার বাড়ি আসছিস, আড্ডা মারছিস, এত পড়ার চাপ, কীভাবে যে সামলাচ্ছিস!'—সুতপা পাল্টা বলেছে, পড়ার চাপ বলেই শুনতে পাই, স্বপ্নময় তোর বাড়ি আসে না, তুই ওর বাড়ি যাস না, তোরা আর প্রথম শো-য়ে সিনেমা দেখিস না। সত্যিই তো, কি মুশকিল হল বল দেখি।

অনাবিল হাসির তোড়ে ওরা চারজনই ভেসে গেছে।—অনন্যার মনে এখনো কত স্পষ্ট সেই ছবিটা! এই ছবিগুলো তো হারায় না! কত মজবুত এদের ফ্রেম, অথচ কত কিছুই যে হারিয়ে যায়। সে ফ্রেমগুলি এত ভঙ্গুর, কিছুতেই ধরে রাখা যায় না।

তাই এর পরের ছবিগুলির ফ্রেম নেই। আলো-আঁধারিতে কখনো জাগে কখনো হারিয়ে যায়;কখনো এমন যেন যত্নে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে, আবার কখনো অবহেলায় একপাশে। এমনও হয়েছে, কোনো ছবি সহসা ভেসে আসে অলৌকিক, সময়ের স্তব্ধতায় যাবতীয় লৌকিকই তখন অলৌকিক হয়, তারপর আবার সময় ফিরে এলে অলৌকিক হারিয়ে যায়, ধবস্ত লৌকিক এগিয়ে চলে পুরনো ঘর্ষণবৃত্তের পথে। হয়ত কোনোদিন একটি ছবির সন্ধান করে করে হয়রান, ফোটে না কিছুতেই, ক্বচিৎ তার আভাসমাত্র, সেই ছবিকে নতুন করে নির্মাণ করতে হয়। তবু কি সেই ছবি ফিরে পাওয়া যায়? যায়না, যায় না কিছুতেই।

এখন এই জানালায় চোখ রেখে অনন্যা দাঁড়িয়ে আছে। সামনের পার্ক থেকে দৃষ্টি ওপরে তুলে অনাবিল আকাশের মুখোমুখি কেমন আছে তার মন?—উদাস?—তা তো ঠিক নয়। —আশাহত? —তাই বা হবে কেন? —আনন্দিত? —তার কী কারণ থাকতে পারে!—তবু মনটা কেমন যেন, অনন্যা ঠিক বুঝতে পারছে না। অনাবিল আকাশ তার মনের আকাশ কখনো ছুঁয়ে দেয়, কখনো ছুঁতে পারে না। যখন ছোঁয়, সামনে ভবিষ্যৎ ছড়িয়ে মনটা উদাসী, প্রসারণে গড়ে তোলে ভবিষ্যৎ-ছবিগুলি;আর যখন পারে না, দেয়াল ওঠে, অতীত প্রসারণে গিয়ে—সেখানেও কত ছবি, যেন প্রত্ন-সম্ভার।

এইভাবে অনির্দেশে অনন্যা কিছুতেই নির্বাচন করতে পারছে না, কী করবে সে? —স্বপ্নময়ের বিয়েতে বরযাত্রী হবে কি হবে না। ঠিক এক ঘণ্টা পরে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে উঠে বিয়ের সাজপোষাক-পরা স্বপ্নময় নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছে অনন্যা তার সহযাত্রী হতে পারে। যাত্রার সুরুতেই তবে নতুন জীবনের জন্য অভিনন্দন জানানো যায়। নাহলে বিয়েবাড়িতে সরাসরি পৌঁছে হয় বরের ঘরে অথবা বিয়ের মণ্ডপে তার নতুন জীবনের সাক্ষী হতে পারে। সময়কে তখন নিজস্ব ব্যবহারে নিয়ে আসা যায়। এই নমনীয় সময়ের ভেতরে অনন্যা তার মনের দোলাচলে অস্থির, অতীতের কোনো স্থিরচিত্র সেখানে নেই, ভবিষ্যতের ছবিও গড়া যাচ্ছে না। বর্তমানের সময়-মুহূর্তগুলি শুধুই স্পন্দন, স্থির অনুভূতির অবকাশ রাখছে না তারা।

বরের পোষাক পরতে পরতে কী ভাবছে স্বপ্নময়?—ভাবী বৌ-য়ের কথা?—মনীষা যার নাম, যে বলেছে চাকরি সে কোনোদিন করবে না, শুধুই সংসার করবে। দিন তিনেক আগে ফোনে এই কথা কেন বলল স্বপ্নময়? ওকে উসকে দেবার জন্যে? ওর কি মনে হয়েছে, সেই ভাবী সংসারচিত্রে অনন্যার ছবি ঢুকে পড়লে স্বপ্নময় তাকে প্রশ্রয় দেবে কি দেবেনা,—হঠাৎ এসব ছবি কেন অনন্যার মনে! মনে মনে হাসল সে। আশ্চর্য, কৌতূহল কতদূর যে এগিয়ে যায়!

এই সময়ে হঠাৎ সেই ছবিটা! কত স্পষ্ট ছিল একদিন, এখন যেন ঘষা কাচ সামনে রেখে দেখছে। কিছুটা আবার তৈরী করেও নিতে হচ্ছে।—বেলুড় মঠে গিয়েছিল। গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় চলা থামিয়ে স্বপ্নময় বলল, বসা যাক একটু। বসার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গম্ভীর স্বপ্নময় হঠাৎই বলেছিল, আচ্ছা, এমন হয় না যে, আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলাম, বিয়ে করলাম না, এভাবে আজীবন?

ভ্রূ কুঁচকে গেল অনন্যার, তারপর সামলে নিয়েছে।—মানে লীভ টুগেদার?

তোমাদের নিয়ে এই সমস্যা। একটা নাম না দিলে, ফ্রেমে না রাখলে বুঝতে পার না। ধর ওর নাম নেই, শুধুই একটা জীবনযাপন। পরে হয়ত কেউ তার নামকরণ করবে।

অনন্যা হেসে বলেছিল, সন্ন্যাসীদের আখড়ায় বসে হঠাৎ এমন ভাবনা?

সেটাও তো সন্ন্যাসজীবনই, দুজন সন্ন্যাসী।

কামিনী কাঞ্চন থাকবে না তাহলে?

থাকবে না কেন, কামিনী কামিনীর মত, কাঞ্চন কাঞ্চনের মত?

সেটা আবার কি?

সেটা বুঝতেই তো সেই জীবনযাপন। কী মনে হয় তোমার?

বোঝার আগে বলব কি করে? ভাবতে সময় লাগবে।

স্বপ্নময় কথা বলে নি আর। ওখান থেকে উঠে বাড়ি ফেরার আলাদা পথে যাবার আগে পর্যন্ত আর কোনো কথা বলে নি ওরা।

এখন ছবিটা যদি আরো উজ্জ্বল করে দেয়? ভাবছে অনন্যা, বদলে দিয়ে নতুন নির্মাণ?—স্বপ্নময় বিয়ের মণ্ডপে বসে হঠাৎ মাথার টোপর খুলে, মনীষা সেখানে বসার আগেই অনন্যা পাশে এসে দাঁড়াল, স্বপ্নময় আর অনন্যা পাশাপাশি হেঁটে গেল বিয়ের মণ্ডপ ছেড়ে অন্য কোনো দিকে।—অনন্যার হাসি পেল। বড্ড নাটকীয়, চলবে না। জীবনে নাটক পছন্দ করে না ও, জীবনটা বুঝে নিতে নাটক কোনো কাজে লাগে না, ওটা তৈরী করা ব্যাপার।

বরং বাড়িতে একদিন স্বপ্নময় হঠাৎই এসে পড়েছে, কেউ ছিল না।—এই ছবিটা স্পষ্ট, উজ্জ্বল। যেন গোটা পৃথিবীর ভেতরে ওরা মাত্র দুটো প্রাণী মুখোমুখি। প্রতিদিনের যে স্বপ্নময়, তার চোখে-মুখে অন্য চোখ-মুখ খেলা করছে। অনন্যার চোখে-মুখেও কি স্বপ্নময় অন্য চোখ-মুখ দেখছিল? অনন্যা জানে না। ঘোরের ভেতরে সেদিন কত যে কথা, সব মনে নেই, অধিকাংশ অনাবশ্যক, ঝরে গেছে। তবু যেটুকু স্পষ্ট এখন, যেন উজ্জ্বল-উদ্ধার।

স্বপ্নময়ই কথাটা তুলেছিল। আচ্ছা অনন্যা, তোমার কী মনে হয়? এই যে চারদিকে দেখছি প্রেম-ভালবাসা করে বিয়ে, তারপরই ভেঙ্গে যায়, এর কী কারণ?

অনন্যা হতাশ। স্বপ্নময়কে এত লঘু কথা বলতে এর আগে শোনে নি। তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, তোমার কথায় কোনো সার পাচ্ছি না।

কেন? স্পষ্ট করেই তো বললাম।

তাই? তুমি যেভাবে বললে, প্রেম-ভালবাসা, তারপর বিয়ে, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া—এর কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল আছে?

স্বপ্নময় সামান্য উষ্ণ হয়ে, নেই? তুমি কি সিরিয়াস? না হেঁয়ালী করছ?

অবশ্যই সিরিয়াস। প্রেম আর ভালবাসা কি এক জিনিস? এর সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক, বিয়ে ভাঙ্গারই বা কী সম্পর্ক?

স্বপ্নময় অবাক।—প্রেম আর ভালবাসা আলাদা! আশ্চর্য কথা শোনালে তুমি?

আশ্চর্য কথা! আলাদা না হলে একই বিষয়ের জন্য দুটো শব্দ তৈরী হয়? আর তা জানো না বলেই তো বলছ, বিয়ে করে, তারপর ভাঙ্গে।

ঠিক আছে, আলাদা-টা কী তুমিই বল।

এটা তোমার নিজেরই বোঝা উচিৎ ছিল। শব্দ দুটো নিজেরাই তো বলছে, ভালবাসা একটি ক্রিয়াপদ আর প্রেম হচ্ছে বিশেষ্য। এদের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?— প্রেম থাকলে ভালবাসা কার্যকরী হয়, না থাকলে হয় না। এর উল্টোদিক হল, ভাল না বেসেও একজন প্রেমিক বা প্রেমিকা হতে পারে।

যেন মজাটা বুঝে ফেলেছে, এই ভাব নিয়ে স্বপ্নময় বলল, আমি তবে কী ভুল বললাম যে এভাবে ঠাট্টা করছ?

একদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছ। তবুও আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। এই ধর না, স্বীকার করছি তোমার প্রতি আমার প্রেম আছে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি, একথা তো বলতে পারি না।

স্বপ্নময় সোজা হয়ে বসল। তীক্ষ্ণ চোখে অনন্যাকে দেখছে।

অবাক হচ্ছ কেন? তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে আমি তোমাকে ভালবাসি? আমার শরীর কি তোমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছি কখনো? কখনো কি তোমার সামনে আমার মনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে?

কিন্তু তুমি যে বললে আমার প্রতি প্রেম আছে, কী করে বুঝবো সেটা?

বুঝব তো আমি, আমার বোধের ভেতরে। তুমি যদি বুঝতে চাও আমার বোধকে ছুঁতে হবে।

স্বপ্নময়কে দিশাহারা হয়ে যেতে দেখে অনন্যা বলল, তুমিও তোমার নিজের বোধ ছুঁয়ে জেনে নাও আমার প্রতি তোমার প্রেম আছে কি না, আর তার জন্যে ভালবাসতেই হবে এটা জরুরি নয়। আসলে এটাই ঠিক বুঝে নেবার ব্যাপার। বোঝে না বলেই নিজের ভেতরে প্রেম কতটা লোকে জানে না।

স্বপ্নময়কে একথার প্রতিবাদ করতে হয়েছে।—তুমি যা বলছ সব মনগড়া, বাস্তবে এর প্রয়োগ হতে পারে না। বিয়ে-প্রথাটা তাহলে উঠেই যেত। এতদিনের সংস্কার কয়েকটা কথায় উড়িয়ে দিতে চাও তুমি?

অনন্যা হাসল। যা ঘটনা তাই তো বলেছি, উড়িয়ে তো দিচ্ছি না। মানুষের ভেতর প্রেম থাকেই, কম আর বেশী, কিন্তু সেটা কোন স্তরে আছে, সে বোঝে না। ভালবেসে সেটা বুঝতে চায়, তাই বিয়ে করে। তার জন্য শরীর ব্যবহার করে, হয়ত মনও ব্যবহার করে। সেই অনুপাত ঠিক না থাকলে, অযথা শরীরের বেশী ব্যবহার হলে নিজের অজান্তেই প্রেমের ক্ষয় হয়। উৎস নষ্ট হলে ভালবাসা আর থাকে না।

স্বপ্নময় এবার স্পষ্ট হতে চাইছে। নিজের সম্পর্কে কী ভাবছ বলতো? এই যে আমরা এতদিন মেলামেশা করছি, ধর আমরা একদিন বিয়ে করলাম, এর ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম নষ্ট হয়ে যাবে?

অনন্যাও স্পষ্ট হল, এতদিন মেলামেশা করছি পরস্পরের প্রতি প্রেম আছে বলেই। এর সঙ্গে বিয়ে জুড়ছ কেন? লীভ টুগেদারও হতে পারে। বিয়ে মানেই শরীরের প্রতি অধিকার, আর তার যথেচ্ছ ব্যবহার। মনের ব্যবহার অনেক কমে যাবে তখন।

স্বপ্নময় ততক্ষণে অসহিষ্ণু।—আর বিয়ে না হলেই মনের ব্যবহার হবে, তাতে প্রেমের ক্ষয় হবে না, এ আমি মানতে পারছি না। শুধু মন নয়, প্রেম বোঝার জন্য শরীরও দরকার।

অনন্যা তবু অনড়। শরীর দরকার নয় একবারও বলি নি তো, কিন্তু কতটা, তা কেউ নির্দিষ্ট করতে পারে? তুমি যদি জানতে মন কতদূর ব্যবহৃত হতে পারে, একথা বলতে না। তুমি কি জানো, প্রেম এতটাই গভীরে যায় যে মৃত্যুকেও সহজে গ্রহণ করতে পারে। তুমি যা বলছ তার চেয়ে আমি বরং এভাবেই প্রেমকে বুঝে নিতে রাজি। মনে রেখো, ভালবাসাও একটা শিল্প; এটা বুঝতে না পারলে শুধুই ব্যবহার। তখন কি আর গড়া যায় কিছু? দাম্পত্য-জীবন তো নয়ই।

স্বপ্নময় যেন চমকে উঠে—নাঃ এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি উঠি। তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বিদায় জানাতে অনন্যা উঠে দাঁড়ায় নি, শুধু বলেছিল, আবার দ্যাখা হবে তো? উত্তর না দিয়ে স্বপ্নময় চলে গেছে।

এরপরও স্বপ্নময়ের সঙ্গে দ্যাখা হয়েছে। ওরা একসঙ্গে সিনেমায় গেছে, রেস্টুরেন্টে বসেছে। কথাও বলেছে অনেক—যার যার সংসারের কথা, চাকরির কথা, রাজনীতির কথা, অবক্ষয়ের কথা, ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনার কথা। কিন্তু এমন কথা বলে নি যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

তারও পরে একদিন স্বপ্নময় বলল, বাড়িতে বিয়ের কথাবার্তা চলছে, আমি স্থির করতে পারছি না। তুমি কী পরামর্শ দাও এ ব্যাপারে?

আমার পরামর্শ চাইলে কেন? তোমার বোধের কাছে খবর নাও, সেখানে প্রেম কী বলছে, কী ব্যবহার সে চায়। সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

বুঝতে পারছি, এড়িয়ে যেতে চাইছ। তবু বলতো, ভালবাসার জন্য প্রেমের কি একমুখী হওয়া অনিবার্য? নাকি দ্বিমুখী বা ত্রিমুখীও হতে পারে?

দ্বিধা না করে অনন্যা বলেছিল, সহস্রমুখীও হতে পারে। ভালবাসার ঠিক ঠিক ব্যবহার হলে প্রেম এতটুকু নষ্ট হয় না।

কেমন বিস্মিত স্বপ্নময় আর কথা বলে নি। এরপর আর দ্যাখাও হয় নি ওদের। বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর ফোনে একবার কথা বলেছিল। আবার যোগাযোগ হল এই বিয়ের কার্ড দিয়ে। হাতের লেখায় সেখানে একটা লাইন ছিল—'তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিয়ের মন্ডপে যেন দ্যাখা পাই।'

সেই কার্ড হাতে অনন্যা এখন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতীতের ফ্রেমবন্দী ছবিগুলি, ফ্রেম-না-থাকা দৃশ্যগুলি এতক্ষণ ধরে চুরমার করে, এখন এই বর্তমানে কোনো দৃশ্য নেই, শুধু জানালার চোখ দিয়ে পার্কের ওপরে অনাবিল আকাশে জেগে উঠছে একটাই দৃশ্য—বরের পোষাক পরে স্বপ্নময় চলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। সেই দৃশ্য ভবিষ্যৎ-প্রসারণে আরো এগিয়ে যাবে, তখন দৃশ্যগুলি হবে শুধুই কল্পনা, তার নিজের প্রত্যয়-ঘেরা অভিমুখ সেখানে নির্মাণ করবে আরো অনেক নতুন নতুন দৃশ্য, আগামী বর্তমানে যার রূপ দিতে হবে তাকে।

অতএব এখনই সময়, নিজেকে ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া দরকার। ভাবল অনন্যা। সে কি কষ্ট পাচ্ছে? তার প্রেম কি কোনো ব্যবহার করতে না-পারার জন্য ক্ষয়িত হচ্ছে?—আশ্চর্য,

কেন কষ্ট পাবে সে? তার প্রেম তো স্বপ্নময়কে পরাধীন করেনি কখনো। স্বপ্নময় হয়ত তার নিজের প্রেমকে অন্য ব্যবহারে নিয়ে যাচ্ছে, অনন্যার প্রেম তাতে ক্ষয় হবে কেন! সে তো কখনো ব্যবহার করে নি বা ব্যবহৃত হয়ে মলিন করে নি সেই প্রেম? তবে সে কি ভাবছে, এরপর নিজস্ব জীবন-প্রবাহের ভেতরে চলতে চলতে স্বপ্নময়ের মনে তার প্রতি যে প্রেম ছিল, মুছে যাবে একসময়? কেন তা হবে? অনন্যার দিক থেকে এমন কোনো ঘটনা তো ঘটে নি? যদি তাই হয়, বুঝতে হবে, অনন্যার প্রতি ওর প্রেম এতদিন দৃঢ় অবস্থানে ছিল না, ধসে যাচ্ছে সে-কারণেই। সেটা তো ওর ব্যাপার, ওর ক্ষতি। অনন্যার তাতে কোনো ক্ষতি নেই তো?

তবে কেন স্বপ্নময় বিয়ের মণ্ডপে ওকে দেখতে চেয়েছে? এই ভাবনাই বিব্রত করছে বেশী করে। স্বপ্নময় কি ভয় পাচ্ছে? নিজের প্রেমের প্রতি আস্থা নেই তার! নতুন ব্যবহারে যাবার আগে অনন্যাকে একবার দেখে নিয়ে নিজের অবস্থানে সুস্থিতি দিতে চায়? না কি সামনে বসে থাকা মনীষা আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্যা, এই দুজনকে একসঙ্গে দৃশ্যের ভেতরে রেখে প্রেমের দ্বিমুখিনতা যাচাই করবে? আশ্চর্য, নিজের মনে জোর নেই? পরনির্ভর হয়ে কিভাবে সেই স্থাপত্য টিকিয়ে রাখবে স্বপ্নময়! প্রেমের সহস্রমুখিনতার কথাও কি বলে নি অনন্যা? সেদিন অবশ্য বিশ্বাস করে নি ও, বিভ্রান্ত হয়ে দূরে সরে গেছে। কিন্তু অনন্যা তো ঠিকই আছে, বিয়ের কার্ড হাতে পেয়েও ওর বিশ্বাসে কোনো ফাটল ধরে নি তো?

এছাড়া কেনই বা যাবে ওর বিয়ের মণ্ডপে? প্রেমের পরীক্ষা দিতে? হাসল অনন্যা। এসবের ভেতরে ও একেবারেই নেই। প্রেম ওর কাছে দুর্লভ বিষয়, বেচাকেনার জিনিস নয়। তার নিজস্ব এক জীবন-প্রণালী আছে, তার প্রবাহ স্বচ্ছন্দ করার জন্যে প্রেমই তো সম্বল। কে এক দুর্বল মনের স্বপ্নময়, যার নিজের প্রতি আস্থা নেই, তার জন্যে কেন তা সুলভ করবে? যে দুর্বল, প্রেম নিয়ে বাঁচার অধিকার নেই তার, তাকে হারিয়ে যেতে হবে। এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

তবুও মনের গভীরে কোন এক বোধ কাজ করছে যেন। অনন্যা অনুভব করল। একদা স্বপ্নময়কে দেখেই তো প্রেমের অনুভবটা আবিষ্কার করেছিল। সেই উৎস অস্বীকার করতে মন চাইল না। এটা ঠিক, নিজের প্রতি আস্থা স্বপ্নময়কে নিজেই অর্জন করতে হবে, তবু ওর ঠিক কী প্রয়োজন, আন্দাজ করতে চেষ্টা করছে, সঠিক হদিস তো তার কাছেও নেই। তবুও, ও যখন সাহায্য চাইছে, সে কি প্রত্যাখ্যান করবে?—ওর নিজস্ব প্রেম তাতে সায় দিল না। ঠিক করল, প্রথমে স্বপ্নময়ের বাড়ি যাবে, তারপর প্রয়োজন হলে বিয়ের মণ্ডপে। ঘড়ি দেখল, যা সময় আছে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া দরকার।

মৃদু সাজগোজ সেরে অনন্যা বেরিয়ে পড়ল। এর আগে অনেকবার এসেছে কিন্তু আজ স্বপ্নময়ের বাড়ি অন্যরকম। ফুলের গেট, সামনের দেয়ালে অনেকগুলি আলোর মালা, সুশোভিত মানুষজন বাড়ির সামনে, ফুলের মালা দিয়ে ঢাকা গাড়িটা রাস্তায় দাঁড় করানো আছে।

এখানে পৌঁছে হঠাৎ-ই অনন্যার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেছে। স্বপ্নময়ের বাড়ি ও চিনতে পারছে না, যে বাড়িতে গড়ে উঠেছিল কত কত দৃশ্য। এইসব সমারোহ সেই দৃশ্যকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। এ যেন তারই উৎসব। এই কি সেই বাড়ি, যেখানে স্বপ্নময় থাকত একদা? অনন্যা মাঝে মাঝে যেত? দুর্ভেদ্য এই কারাগারে অনন্যা কিছুতেই ঢুকতে পারল না।

তবুও দাঁড়িয়ে আছে অনন্যা, নিজ অনুভব জাগিয়ে রেখে শেষ দৃশ্য দ্যাখার জন্যে, অথবা অন্য সুরুর দৃশ্য! সহসা কোথায় যেন উচ্চকিত ও বিচিত্র শব্দ তুলে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সজ্জিত কে-একজন, তার দুপাশে পুরুষ ও নারীরা। সবার মুখ এত চকচকে, সাজানো, অভিব্যক্তিহীন, কোনো গ্রহণ নেই, ফিরিয়ে দিচ্ছে শুধুই প্রতিফলন। সজ্জিত লোকটি গাড়িতে উঠছে, সঙ্গে আরো কয়েকজন, অনন্যার সংস্কার বলছে, ও স্বপ্নময়। অনন্যার মন তা বলছে না। ওর যেন মনে হল, একজন শৃংখলিত কয়েদীকে কারাগার থেকে বার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে ওর বিচার হবে।

অনন্যা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকল, এগোতে পারল না,—তার প্রবেশাধিকার নেই। গাড়ি চলে গেছে, তারপরই সবকিছু নিঝুম-বিস্তারে কোলাহলহীন। উৎসবের বাড়িটা নির্জীব এখন। ওখানে না গিয়ে অনন্যা এক গভীর স্বস্তিতে ফিরে এসেছে। ও স্পষ্ট দেখছে, ওখানে শুধুই কোলাহল। ওখানে প্রেম নেই। কোলাহলে প্রেম মরে যায়।

# অপেক্ষা

মহীতোষ সকাল থেকে অপেক্ষা করছে। খুব ভোরে কে একজন ফোন করেছিল, তারপর থেকে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে, ওর কোনো কিছুই স্বাভাবিক নেই আর।—সকালের হাঁটা বাতিল করেছে, নিয়ম ভেঙে চা-জলখাবারের আগেই বাথরুমের কাজ সেরে ফেলা, এমনকি স্নান পর্যন্ত। এরপর পড়ার টেবিলে না গিয়ে বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে আছে। চায়ের কাপ সেন্টার টেবিলে রাখা। চা ঠাণ্ডা হলে তবে খায়, আজ তার ব্যতিক্রম হল। ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে, অনভ্যাসে অস্বস্তি হচ্ছে, তবুও। চা শেষ করে ডাইনিং টেবিলে রেখে এল। ফিরে এসে চেয়ারে বসেই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দরজায় চোখ, স্থির বসে আছে মহীতোষ।

বাড়ির সবাই লক্ষ্য করেছে, সকাল থেকে মহীতোষের আচরণ অন্যরকম। স্ত্রী মল্লিকা এসে জিজ্ঞেস করল, এভাবে বসে আছ! ব্রেকফাস্ট করবে না?

এখানে দিয়ে যাও।

ডাইনিং টেবিলে বস গিয়ে।

না, এখানেই দাও। তাড়াতাড়ি কর।

কী ব্যাপার। কী হয়েছে তোমার?

একজন আসবে, তাই অপেক্ষা করছি।

কে আসবে? যার জন্য সব ছেড়ে দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে আছ?

সকালে ফোন করেছিল, নাম বলে নি। তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

কে আবার সকালে ফোন করল।

তোমরা জান না, তোমাদের ঘুম ভাঙেনি তখনো।

সে আবার কি! কখন আসবে বলেছে? কী জন্য আসছে সে?

বলল, ওর সময়মত আসছে। এসে সব বলবে।

আর তার জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে চুপচাপ বসে আছ? সকালে হাঁটতে গেলে না, আগে স্নান সেরে ফেললে, পড়ার টেবিলেও বসলে না। কী হয়েছে, ঠিক করে বলতো? কোনো খারাপ খবর?

আমি জানি না। লোকটি এলে জানতে পারব।

বিরক্ত হয়ে মল্লিকা বাইরের ঘরেই ব্রেকফাস্ট রেখে ভেতরে চলে গেছে।

সকালে ফোনটার কথা মনে পড়ছে মহীতোষের। কে করল ফোন? কিভাবে ফোনটা বেজেছিল, ফোনেই কথাগুলি শুনল কিনা, এসব কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু সব শুনেছে। কেমন অলৌকিক কণ্ঠস্বর! এখনো কানে বাজছে। সেই স্বর তার ভবিষ্যৎ রুদ্ধ করে, সময় এখন পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।—একে একে ভেসে উঠছে তার যাবতীয় ব্যর্থতা।—কিছু করার ছিল, কিছু করা হল না, এইসব দৃশ্যগুলি। কতবার ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াতে

চেষ্টা করেছে, পারে নি, কিছুতেই পারল না, এইসব দৃশ্যগুলিও। কেন কিছুই করা হল না, কেন ব্যর্থতা অতিক্রম করে ফের দাঁড়াতে পারল না, লোকটি এসে সে-কথাই জানাবে তাকে, এই আশায় বসে আছে মহীতোষ। অন্তত লোকটির কণ্ঠস্বরে তার আভাস ছিল। কিন্তু সে আসছে না কেন? না-আসা পর্যন্ত ওঠার উপায় নেই তার, ওর কথা জেনে নিতে না পারলে ভবিষ্যতের দিকে এগোনো যাবে না। মহীতোষ নিরুপায়, তাকে বসে থাকতেই হচ্ছে।

দুপুরে রান্না সেরে, ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম শেষ হলে, কাজের মেয়ে বাকি ঘরগুলো মুছে বাইরের ঘরে এল। মল্লিকা তদারক করতে এসে, মহীতোষ সেভাবেই চুপচাপ বসে আছে দেখে অবাক! আরে, এখনো সেইভাবে বসে আছ?

লোকটি আসে নি এখনো।

ও আর আসবে না, ওঠো তো, ঘর মুছবে।

এই পা তুলে বসছি, মুছে যাক।

তার মানে? ওভাবে মোছা যায় না, চেয়ার সরাতে হবে।

কিন্তু মহীতোষকে ওঠানো গেল না। সেভাবেই কাজের মেয়ে ঘর মুছে চলে গেলে পাশে একটা চেয়ার টেনে মল্লিকা বসল।— নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে তোমার। আমায় বলবে না তুমি?

জানলে তো বলব।

তুমি কিন্তু জ্বালাচ্ছ আমাকে। জানা নেই শোনা নেই কে একজন ফোন করল, তার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুমি এভাবে বসে থাকবে? ওঠ, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও, ও আর আসবে না। ওটা ভূতুড়ে ফোন, এটা বুঝতে পারছ না?

স্পষ্ট শুনেছি আমি। আমার ভুল হতে পারে না। এখন উঠতে পারব না, লোকটি এসে আমাকে না দেখে ফিরে যাবে।

মল্লিকার সন্দেহ হল। একদৃষ্টে দেখছে মহীতোষকে। চোখেমুখে একটা কঠোর ভঙ্গি। কেউ শাসিয়েছে নাকি? এখন যা দিনকাল। মল্লিকা কোমল হয়ে বলল, ভয় পেয়েছ? আমি আছি না? দরকার হলে পুলিশে খবর দেব।

তার দরকার নেই। পুলিশে খবর দিলে ও আর আসবেই না। আমি ভয় পাই নি, তুমি নিশ্চিন্তে থাক। ওর জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

মল্লিকা হাল ছেড়ে দিয়ে বসার ঘরেই ওর খাবার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার পর ফোনে বীথিকে সব জানাল। বলল, তাড়াতাড়ি চলে আয়, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

বিকেলবেলায় বীথি এল, ওর চোখে-মুখে আতংক ও আশংকার ছাপ। এসে বাইরের ঘরে বসে-থাকা মহীতোষকে দেখছে, কেমন স্থির, অনড়। অন্যরকম দ্যাখাচ্ছে বাবাকে। বীথি ওর আদরের মেয়ে, ওকে দেখতে পেয়ে মহীতোষ শিশুর মত উচ্ছ্বসিত,—তুই এসেছিস? কী যে ভাল হল। থাকবি তো?

বীথি কেঁদে ফেলল, থাকব তো। কিন্তু তুমি এভাবে বসে আছ কেন? শুনলাম সকাল থেকেই বসে আছ। কী হয়েছে তোমার?

তোর মা বলেছে বুঝি? ওর বুদ্ধি বরাবরই কম, তাই বুঝতে পারছে না। তোকে বললে তুই ঠিক বুঝবি। দ্যাখ, এতদিন যা খুঁজে এসেছি, মনে হচ্ছে তার একটা সুরাহা হল।

কী সুরাহা হল, কী খুঁজছিলে তুমি? আমাকে খুলে বল।

তা কি আমিই জানি যে খুলে বলব তোকে? আভাসে সব বুঝতে পারছি, সেজন্যেই তো অপেক্ষা।

সে যখন আসবে তখন ডেকে দেব তোমায়, এখন ভেতরে চল।

পাগল হয়েছিস? যখন জানতে পেরেছি সে আসবেই, আমাকে না দেখতে পেলে সে ফিরে যাবে, এতদিনের চেষ্টার পর সে ঝুঁকি নিতে পারি? তুই বরং হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নে, আমাকেও এক কাপ দিয়ে যাস। তারপর তোর সঙ্গে বসে গল্প করব।

এসবের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝল না বীথি। মহীতোষের জন্য চা করতে গেল।

সকাল থেকে অস্পষ্ট যে আভাস, তার গূঢ় অঞ্চলে প্রবেশ করছে মহীতোষ। সকালের ফোনে গলার স্বর এত আন্তরিক, এত বর্ণময়, চারপাশ যেন ফিকে হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল অসুস্থতা তাকে সমাচ্ছন্ন রেখেছে, কোনোদিকেই কোনো অভিমুখ এতদিন ছিল না। চারপাশে যারা প্রিয়জন, যেমন বীথি এইমাত্র এল, দেখে ভাল লাগল, তাদের প্রতি মায়া আছে তার। ওরা তাকে আশ্বাস দেয় ঠিকই কিন্তু সে আশ্বাস ভেতর পর্যন্ত পৌঁছয় না। ওদের ক্ষমতাই না কতটুকু! বরং ওরা নিজেরা সুখে থাকুক, ওকে নিয়ে বিব্রত হওয়ার দরকার কি! কত ডাক্তার, কতবার নার্সিং হোম, কিছুতে কি কিছু হল? কাল ওরা আবার স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাবে, যাবার দরকার নেই তবু জোর করবে ওরা। এসব ওকে আরো অসহায় করে দিচ্ছে। অথচ সকালের কণ্ঠস্বরে যেন শান্তির প্রলেপ, তার অন্তর ছুঁয়ে গেল। যেন কত আপনার, তার মর্মমূল পর্যন্ত জেনে গেছে সে। এই যে কদিন ধরে দাঁতের যন্ত্রণা, নতুন এক উপসর্গ। এইভাবে একের পর এক উপসর্গ এসে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে, মনের ভেতরে কোনো আকাশ নেই, সর্বক্ষণ মেঘে ঢাকা। কিন্তু সকালে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছে, এবারে সব অবসান। অন্তরাকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল, কেমন নির্ভার। এখন সে এলেই সবকিছু মিটে যাবে, এমনই প্রত্যয় তার কণ্ঠস্বরে। কিন্তু কখন যে সে আসবে! অধৈর্য হয়ে উঠছে মহীতোষ। তবু ধৈর্য হারানো চলবে না, তার সঙ্গে দ্যাখা হওয়া চাই-ই। অতএব সে ফিরে যাবে এই ঝুঁকি কিছুতেই নিতে পারে না। প্রিয়জনরা এটা বুঝতে পারছে না, তাই ওকে নিবৃত্ত করতে চায়। মহীতোষ এখন আরো নিখুঁতভাবে একাগ্র হয়ে তার অন্তরাকাশে স্থিত হয়ে আছে।

বীথি চা নিয়ে এসে পাশে বসল।—কাল তো ডাক্তার চৌধুরীর কাছে যাবে। আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

মহীতোষ হাসল। হ্যারে, মিষ্টুকে নিয়ে এলি না কেন, অনেকদিন দেখি নি।

মঙ্গলবার পরীক্ষা। আজ, কাল প্রবীরের ছুটি আছে, ওকে পড়াবে।

মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে তোরা সব জেরবার হয়ে যাচ্ছিস নারে?

এ আর নতুন কি? কিন্তু শুনলাম, তোমার নাকি দাঁতের যন্ত্রণাটা কমছে না? সুগার আছে বলেই এসব এসে জুটছে। মা বলল, আজকাল হাঁটাও বন্ধ করে দিয়েছ তুমি। তাহলে সুগার কমবে কি করে? চল আজ আমার সঙ্গে বেরোবে, অনেকটা হাঁটব আমরা।

মহীতোষ আঁৎকে উঠল। কেমন সন্দেহের চোখে দেখছে বীথিকে—বলিস কি? তোর মতলব তো ভাল নয়। আমার মিষ্টি মেয়েটার মনে এমন দুষ্টুবুদ্ধি? জোরে জোরে হাসছে মহীতোষ।

দুষ্টুবুদ্ধি কেন? আগে আমার সঙ্গে হাঁটতে না তুমি?

সে তো অনেক আগে। আজ আমার উপায় নেই, আমি অপেক্ষা করে আছি দেখছিস না?

সে তো দেখছি, বুঝছি না কিছুই। কে আসবে, কী বলবে, অপেক্ষা করছ কেন, এসব কিছুই জান না তুমি। তবুও একঠায় অপেক্ষা করছ, এসব পাগলামির কোনো মানে হয়?

শোন মা, পাগলামি যদি বলিস তাই সই। এই পাগলামিই তো ভরসা দিচ্ছে এখন। এই যে সারাজীবন ধরে এত দুঃখকষ্ট আমাকে কাবু করে ফেলেছে, এই যে জীবনে কিছুই হল না বলে হতাশা, কেউ কি তা বোঝে? কেউ কি তার সুরাহা করতে পারে?

বীথি রেগে গেল। আর আমরা বুঝি তোমার পাশে নেই? তাই বুঝি মনে কর তুমি?

তা মনে করি না, তোরা তো কাছেই আছিস। কিন্তু কতটা কাছে? আর তোদের সাধ্যই বা কতটুকু। লোকটার কথায় মনে হল, সে আমার ভেতরে। আর তোরাই বা আমার জন্যে এত অস্থির হবি কেন? তোদের তো সংসার আছে, তার ঝক্কি কম না, আমি বুঝি না? তোদের জন্য বরং আমারই কষ্ট হয়। কিন্তু লোকটাকে মনে হল শুধু আমারই জন্য, তাই—

থামো তো, খালি লোকটা লোকটা করছ। চেন না, নাম জান না, কেন আসছে তা-ও জান না, সে তোমার সঙ্গে মজা করছে, এটা বুঝতে পারছ না?

মহীতোষের মুখে মৃদু হাসি।—নারে। অমন বলিস না, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, এমন বন্ধু আর কে আছে।

আর আমরা তোমার শত্রু? মহীতোষ হাসতে হাসতে বীথির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বীথি কিছুক্ষণের জন্যে ভেতরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল, মহীতোষ আগের মতই বসে আছে।—সোজা, একাগ্র, গভীর কোনো ভাবনায় মগ্ন। বীথির কাছে এসব মোটেই ভাল ঠেকছে না।

সন্ধের পর বীথি ও মল্লিকা গভীর চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এত অসুখে ভুগে ভুগে মহীতোষের কি মাথায় গন্ডগোল দ্যাখা দিল! কে ফোন করল এত সকালবেলায়, ফোনের শব্দ শুনতে পেল না কেউ, তার নাম জানে না, ফোনে কী বলেছে তা-ও স্পষ্ট নয়, কখন আসবে সেই ভদ্রলোক তার ঠিক নেই, সারাটা দিন কেটে গেল, লোকটির জন্যেই বা এত ঠায় অপেক্ষা কেন!—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মহীতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিপ্রদাসবাবুর কথা মনে পড়ল হঠাৎ করেই। উনি প্রায়ই আসেন। না এলে ফোন অন্তত করেন। ওর সঙ্গে কথা বললে মহীতোষের মন ভাল থাকে, কিছুটা উদ্দীপ্ত হয়, এটা ওরা লক্ষ্য করেছে। দিন তিনেক হল উনি আসছেন না, উনিই কি তবে ফোন করেছিলেন?—কিন্তু এত সকালে উনি ফোন করবেন কেন! মল্লিকার মনে বিভ্রান্তি,—তাছাড়া আসবেন বলে সারাদিনে আসলেন না, এমন মানুষ তিনি নন। তবু বীথি বলল, বিপ্রদাসবাবুকে ফোন করে দ্যাখ না একবার?

মহীতোষের ডায়েরী খুঁজে বার করল ওরা। নম্বর খুঁজে পেয়ে ডায়াল করল, বিপ্রদাসবাবুই ফোন ধরলেন।

মল্লিকা বলল, কেমন আছেন? শরীর ভাল তো? অনেকদিন আসেন নি আপনি।

শরীর খুব ভাল বলা যায় না, এই বয়েসে এরকমই হবে। তেমন বিশেষ কিছু নয়। আপনারা সব ভাল আছেন তো? মহীতোষ কেমন আছে?

ওকে নিয়েই তো চিন্তায় পড়েছি আমরা। আচ্ছা, আপনি কি খুব ভোরে ওকে ফোন করেছিলেন?

না তো! কেন কী হয়েছে?

সেটাই তো। কেএকজন সকালে ফোন করে ওর কাছে আসবে বলেছে। তার অপেক্ষায় সারাদিন বাইরের ঘরে ঠায় বসে আছেন। নড়ছেন না একদম, যদি লোকটি ওকে না দেখতে পেয়ে ফিরে যায় এই ভয়ে। কি এক জরুরি কথা নাকি আছে, এসে বলবেন। কী জ্বালা বলুন তো, ব্যাপারটা আমাদের কাছে মোটেই স্বাভাবিক ঠেকছে না।

খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করছে তো?

তা করছেন, কিন্তু ঐ বাইরের ঘরে বসে বসেই।

আশ্চর্য, ওর আর কে বন্ধু আছে ফোন করতে পারে?

সেরকম কারো কথা তো মনে পড়ছে না, তেমন কেউ যোগাযোগ রাখেন না আজকাল, একমাত্র আপনিই—।

তাই তো, কী করা যায়? ব্যাপারটা আমারও অদ্ভুৎ ঠেকছে।

আপনি একবার আসবেন?

যাওয়া দরকার বুঝতে পারছি। মুশকিল হচ্ছে, মেয়ে-জামাই এসে গেছে, ঘর ভর্তি, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি অবশ্যই কাল সকালে যাব।

একবার ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন? দেব ফোনটা?

দিন তো দেখি।

বীথি কর্ডলেস হাতে করে মহীতোষের কাছে এল। ফোনটা ধর, বিপ্রদাসবাবু কথা বলবেন।

মহীতোষ ফোন ধরছে না। না, না, আমি যার জন্যে অপেক্ষা করছি সে বিপ্রদাস নয়। আমি এখন খুব ব্যস্ত।

ঠিক আছে, তুমি ব্যস্ত আমরা জানি। তবু বিপ্রদাসবাবু কী বলতে চান, শোনই না।

ফোন ধরল মহীতোষ, কী বলবে বিপ্রদাস? জরুরি কিছু? আমার এখন অন্য কিছু ভাল লাগছে না।

মহীতোষের কথায় বিপ্রদাসবাবু বিব্রত হয়েছেন, তবু বললেন, জরুরি তো বটেই, তোমার শরীর কেমন আছে?

বুঝতে পারছি না। যার জন্য অপেক্ষা করছি সে সব দায়িত্ব নিয়েছে। সে এলে তারপর সবকিছু নতুন করে ভাবব। এটুকু শুনে নাও, নতুন কিছুর অপেক্ষায় আছি। এভাবে আর চলছে না, বুঝলে?

কাল সকালে গিয়ে শুনব সব। আজ অনেক অপেক্ষা করেছ, এবার বিশ্রাম নাও। লোকটা কে চিনতে পেরেছ?

মহীতোষ হাসছে। একটু একটু পারছি, ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। তুমি চিন্তা কোরো না। কাল এসো, নতুন আমাকে দেখবে।

খুব ভাল। শরীর নিয়ে যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছ, তোমাকে নতুনভাবে দেখতে ভালই লাগবে।

তোমাকে আবার বলছি বিপ্রদাস, আমাকে নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। তোমরা সবাই ভাল থাক।

ঠিক আছে, কিন্তু বাড়ির সবাই তোমাকে নিয়ে খুব ভাবছে কিন্তু।

ওদেরও বলেছি আর না ভাবতে। এবার ছাড়ি।

আর শোন—। মহীতোষ ফোনটা কেটে দিয়েছে।

রাত ন'টা বেজে গেছে, বীথি ও মল্লিকা আর দেরী করতে রাজি হল না। আবেদন-নিবেদন নয়, এবার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা এনে মহীতোষকে বলল, আর বসে থাকতে দেব না তোমাকে। ঐ লোক আজ আর আসবে না আমরা নিশ্চিত, ওঠ এবার খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে চল।

মহীতোষ ক্লান্ত বোধ করছিল না, ওঠার ইচ্ছেও ছিল না, তবু ওদের জোর এবার একটু বেশীই। বলল, তোরা কিভাবে নিশ্চিত হলি যে ও আর আসবে না?

যদি আসে লোকটা হয় পাগল, নয় সেরকমই অন্য কিছু।

মহীতোষ হাসল। পাগল? হয়ত তাই। অন্য কিছু হতে পারে, আমি এখনো ঠিক জানি না।

আর জানতে হবে না, ওঠ দিকি।

আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু লোকটা এলে আমাকে আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে। ভেতরে যাবে না, তোদের চেনে না তো।

সে যা হয় হবে।

কিছুক্ষণ চেয়ার আঁকড়ে থেকে অবশেষে উঠল। চারদিক তন্ন তন্ন করে কী যেন খুঁজল, তারপর ওদের সঙ্গে ভেতরে গেল। খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বীথি ও মল্লিকা এরপর আলোচনায় বসেছে।

বাবার ঠিক কী হয়েছে বলতো মা?

বুঝতে পারছি না। কদিন থেকে গুম মেরে আছে, কথার মধ্যে শুধু বলছে, তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি, ছেলেমেয়েরা ওদের সংসার ফেলে আমাকে নিয়ে ভাবছে, এটা ঠিক নয়। এই দ্যাখ না, দাঁতের যন্ত্রণাটা এত, সহ্য করতে পারছি না। কথাটা ঠিক, কদিন হল দাঁতের যন্ত্রণা নতুন উপসর্গ হয়েছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে, ঠিকমত খেতেও পারছে না।

কিন্তু আজ তো একটু বেশীই কথা বলছে। ভুগে ভুগে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি দুশ্চিন্তা বল তো।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য এটাই, কে ফোন করল? আমরা কেউ শুনতে পেলাম না! ঘুম থেকে যখন উঠেছি, ও তখন শুয়েই ছিল। আমি উঠতেই বসার ঘরে এসে বসল, তারপর থেকে ঐ একই কথা। আজ কিন্তু দাঁতের যন্ত্রণার কথা একবারও বলছে না।

আজ রাতটা তুমি একটু খেয়াল রেখো মা। কাল তো ডাক্তারের কাছে যাবার কথা?

মহীতোষ ঘুমোয় নি। ওদের কথা শুনে হেসে উঠল। ডাক্তারের কাছে আর যাবার দরকার নেই। আমার কথা ভেবে তোরাও আর দুশ্চিন্তা করিস না। লোকটা যেভাবে বলেছে, নিশ্চয়ই আসবে। এখন তোদের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা।

দুজনেই প্রায় আঁৎকে উঠেছে। সে কি, এখনো ঘুমোও নি? ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছ?

তার আর দরকার নেই। তোরা শুয়ে পড়।

বিপ্রদাসবাবু সকালেই তৈরি হয়ে নিয়েছেন। মহীতোষকে সম্ভবত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তারপর আরো কী কী করতে হবে, এখনো জানেন না। ভারী জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দূর থেকে দেখছেন, একতলায় ফ্ল্যাটটার সামনে মানুষের ভিড়। অনেকবার এসেছেন মহীতোষের ফ্ল্যাটে, কিন্তু তার চারপাশ আজ অন্যরকম যেন! কাছে এসে, হ্যাঁ, এটাই তো মহীতোষের ফ্ল্যাট। ওর অসুখ নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু? পুলিশের পোশাক-পরা দুজন লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, তবে কি চুরি-ডাকাতি? কাল সকালের ফোনে মহীতোষকে কেউ হুমকি দিয়েছিল? মহীতোষ তাই সারাদিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে।

ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। বাইরের ঘরের মেঝেতে মহীতোষ শুয়ে! কী হয়েছে ওর? একজন লোক চারপাশ খুঁটে খুঁটে দেখে কী সব লিখছেন নোটবুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ঘটনা জানা হয়ে গেল তাঁর। মহীতোষ ভোরবেলা সিলিং ফ্যান থেকে কাপড় ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘরের এককোণে মল্লিকা চোখে কাপড় দিয়ে শুয়ে আছে। যে লোকটি নোট করছেন, তার হাতে একটা কাগজের টুকরো, তাতে কিছু লেখা।

বিপ্রদাসবাবু এসেছেন খবর পেয়ে বীথি ভেতর থেকে বাইরে এসেই কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল কাকু।

কী করবেন, কী-ই বা বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না বিপ্রদাস।

কাল সারাদিনই বাবা অন্যরকম ছিল, কিন্তু এমনটা যে হবে স্বপ্নেও ভাবি নি।

সব গুছিয়ে বীথির কাছে যা শুনলেন,—রাত্রে ঘুমোতে গিয়েছিল মহীতোষ। মল্লিকা পাশে শুয়ে চিন্তায় চিন্তায় তার ঘুম আসছিল না। শেষরাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পায়নি। যখন ঘুম ভাঙল, দ্যাখে, পাশে নেই। সারা বাড়ি খুঁজে বাইরের ঘরে এসে দেখল এই কান্ড। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

যে ভদ্রলোক তাঁর নোটবুকে লিখছিলেন, বিপ্রদাসবাবুর পরিচয় পেয়ে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গেই তো রাত্রে শেষ কথা বলেছেন ফোনে, একজন লোকের আসার কথাও বলেছিলেন আপনাকে। আপনি ওর অনেকদিনের বন্ধু। দেখুন তো, এমন কোনো বন্ধুর কথা জানেন কিনা।

বিপ্রদাসবাবু দেখলেন, কাগজের ওপর লেখা কয়েকটা এলোমেলো লাইন। বোঝা যাচ্ছে, খুব দ্রুত লিখতে হয়েছিল, তাই কাঁপা-কাঁপা অক্ষর। লাইনগুলোও। কিন্তু আশ্চর্য, কত শান্ত, কত সংহত ভাবনার প্রকাশ সেখানে। মহীতোষ তার শেষ চিঠিতে লিখেছে, —মা বীথি, লোকটার আসার সময় হয়েছে। সারাদিন সারারাত অপেক্ষা করতে করতে এতক্ষণে এল। ওর সঙ্গে কথা বলব, এটা আমার পরম শান্তি। দেখবি, এরপর থেকে আমি ভাল থাকব, তোরাও ভাল থাকিস। আমার কথা ভেবে মন খারাপ করবি না, জানবি, আমার আর কোনো কষ্ট নেই। —তোর বাবা।

বিপ্রদাসবাবুর চোখের সামনে ছবিটা ভেসে উঠছে।—ওর বাড়িতে সেদিন একটা ফাঁসির দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছিল মহীতোষ। ফাঁসির আসামীটি কনডেমড্ সেলে বসে বসে, যেন অনন্ত

সময় ধরে যোজন যোজন দূরে থাকা মৃত্যুকে দেখছিল আর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। কিন্তু যেদিন ফাঁসি হল, জীবন আর মৃত্যুর মাঝে মাত্র কয়েক সেকেন্ড, শুধু পায়ের তলার পাটাতনটুকু সরে যাওয়া। অথচ লোকটির দুর্ভাগ্য, এই চমৎকার অতিক্রমের স্বাদ সে পেল না। তারপর মহীতোষ মৃত্যুর অধিকার নিয়ে দীর্ঘ সওয়াল করেছিল। ওর বক্তব্য ছিল, যে কোনো ব্যক্তির নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ। বিপ্রদাসবাবুর বিরুদ্ধ-বক্তব্যকে সেদিন সে কোনোভাবেই আমল দেয় নি। কেননা ঐ মৌলিক অধিকারটি না থাকায় কত শত মানুষের শান্তি নষ্ট করে চলেছে এই সমাজ, এই রাষ্ট্র।

বিপ্রদাসবাবু গভীর শোকে ভেঙে পড়েছেন। কাল ফোনে কথা বলছিলেন যখন, মহীতোষের প্রার্থিত ব্যক্তিটির কথা কেন মনে পড়ল না তাঁর। বড্ড দেরী হয়ে গেল, সেই লোকটি তাঁর এত চেনা অথচ ঠিক সময়ে তাঁকে মনেই করতে পারলেন না!

হাতে নোটবই ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, হদিস পাচ্ছেন কিছু?

পরাজিত থমথমে মুখ বিপ্রদাসবাবুর, পাচ্ছি, তবে বড্ড দেরী হল চিনতে। এই তো সেই লোক, যার হাত ধরে উনি চলে গেলেন।

ভদ্রলোকের দৃষ্টি রহস্যময়, কণ্ঠস্বরে শ্লেষ,—সে আবার ফোন করে নাকি?

করবে না কেন? ফোন কি শুধু কানে বাজে? মনেও তো বাজে অনেক সময়।

# সময়ের কল্পকথা

ওরা তিনজন দীর্ঘকালের বন্ধু।—নবেন্দু, বিকাশ ও পরিমল।

ছোটবেলায় একই স্কুলে পড়ত, এরপর পড়াশোনায় দিকবদল ঘটে। এখন ওদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন যদিও, একই অঞ্চলে থাকার সুবাদে বন্ধুত্বে ফাটল ধরে নি। বরং নিয়মিত যোগাযোগ, সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক থাকা এবং ধারাবাহিক সুখদুঃখের সঙ্গী হওয়ার ফলে তা মজবুত গঠন পেয়েছে।

ওদের বর্তমান অবস্থান এইরকম,—নবেন্দু ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর দু-একটা ছোটো চাকরি, তারপর সামান্য ব্যবসার চেষ্টা, অবশেষে নানা বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় প্রায় সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। একজন সফল প্রযুক্তিবিদ, তার পেশাগত সাফল্যের কারণে ঘন ঘন এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় যায়। ওকে পরিচালকরূপে পেতে অনেকে আগ্রহী, কেননা যে-কোনো রুগ্‌ণ সংস্থাকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার কৌশল তার করায়ত্তে। বিশেষজ্ঞ নবেন্দুকে শিল্পমহল এভাবেই জানে।

বিকাশ কম্প্যুটার প্রযুক্তিতে, এর মধ্যে ছটা চাকরি ছেড়ে সপ্তমটায় বছরখানেক হল যোগ দিয়েছে। প্রতিবারই বেশ ভালো পরিমাণে মাইনে বাড়ে। নতুন কাজে যোগ দেবার সময় সে উৎসাহে দীপ্ত থাকে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুদিনের মধ্যে তা নিষ্প্রভ করে পরবর্তী ধাপে যেতে প্ররোচিত করেছে। তার চোখের সামনে যেন অনন্তের হাতছানি, কতদূর পৌঁছবে বা পৌঁছতে চায়, নিজের কাছেই হদিস নেই। প্রতিবার ধাপ পেরোবার সময় ওর নিজের সময় অন্যের কাছে বেশি করে গচ্ছিত রাখতে হয়, নিজের জীবনে অবসরের ফাঁকগুলি কমে, দ্রুততর গতি ও যান্ত্রিক অনুশীলন অন্য অবকাশ থেকে দূরবর্তী করে, তার সংসারজীবন ও বন্ধুদের সাহচর্য নিজস্ব অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে চিত্রার্পিত যেন, শুধুই দৃশ্যময়।—এইরকম ক্রমশ-যান্ত্রিক জীবনযাপনই তার সাফল্যকে এখন চিহ্নিত করে।

পরিমল এদের দুজনের থেকে স্বতন্ত্র। পাস করেই পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েছিল। তারপর বিয়ে, স্ত্রী ও দুই সন্তান, —এক ছেলে এক মেয়ে। সাংসারিক দায়িত্ব, বিনোদন, ভবিষ্যতের জন্যে কিছু বন্দোবস্ত রাখা, এর বাইরে খুব বেশি কিছু ভাবে নি। গান ও কবিতাচর্চা ছিল একসময়, কিছুটা পারদর্শিতাও। বিশেষ কিছু হবার মানসিকতা একসময় ছিল, কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে করতে সে-সব একেবারে হারিয়ে যায়নি হয়তো, তবু নেহাতই অনুষঙ্গ মাত্র। ইদানিং রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছে—এক মারণ রোগের শিকার সে। পেটে ক্যান্সার, একটু বেশিই দেরিতে ধরা পড়েছে, আয়ু আর বেশি নয়, শুধু চেষ্টা, কতটা প্রসারিত করা যায়। চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে ঘরবন্দি করেছে নিজেকে, গান ও কবিতাচর্চা মনে হয় অতীতকালের, রেশটুকু শুধু মনের ভেতর এখনো। তার সঙ্গে সকলের আরো বেশি ঘনিষ্ঠ ব্যবহার যেন মৃত্যুর মুখই বেশি করে মনে পড়ায়, ওর অস্বস্তি হয়, উপেক্ষা

করতে চেষ্টা করে, বলে, সমস্ত জীবনটাই তো মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধে নেমে গেছি আমি, তোমরা আমার সরাসরি লড়াইটা দ্যাখো। এইসব কথা বলে বলে আসলে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে সে। কেন গুছোচ্ছে, কোথায় যাবার জন্যে, জানে না যদিও।

আগে পালা করে তিনজনের বাড়িতেই আড্ডা বসত। নবেন্দু ও বিকাশ তাদের কর্মক্ষেত্রে, পরিমল তার সংসারক্ষেত্রে অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই আড্ডায় ঠিক হাজির হত, সারা সপ্তাহ ধরে মনের যে ক্ষরণ, সেখানে তার পূরণ ঘটত। ইদানীং পরিমল অসুস্থ হয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় না, ওর বাড়িতেই বাকি দুজন যায়। নানারকম খাবার নিয়ে, নানা বিচিত্র মুখরোচক খবর সংগ্রহ করে আড্ডা জমায়, নিজেদের কথা বলে, পরিমলের কথা শোনে, ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে যে-যার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। ওরা যতক্ষণ থাকে, কিছুটা উজ্জ্বল, চলে গেলে আরো অনুজ্জ্বল অবস্থানে আরো ধ্বস্ত হতে থাকে।

নবেন্দুকে চাকরি করতে হয় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। সবসময় ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত, সতর্ক থাকতে হয়;চকিত সিদ্ধান্ত নেবার সময় অতীত ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি খুব দ্রুত বোঝা দরকার; সহযোগীদের ঠিকমতো ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কৃৎ-কৌশলের ঠিকঠাক প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে;ফলে তার মনের ওপর যথেষ্ট চাপ, রাতে ভালো ঘুম হয় না, ব্লাডপ্রেসার, সুগার বাড়ে, তার জন্যে ওষুধ খেতে হয়। ক্লাবে প্রায়ই যায়, নানা পার্টিতেও, সেখানে একইরকম ব্যস্ত ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত অনেকের সঙ্গে দ্যাখা হয়। ওরা এইসব প্রসঙ্গে আলোচনা করে, স্বাচ্ছন্দের উপায় খোঁজে, কিন্তু উপায়গুলি আরো গভীর অবসাদের ভেতর পৌঁছে দেয় ওদের। বুঝতে পারে, আসলে একটা চক্রব্যূহের ভেতর চলে যাচ্ছে ওরা।

ঠিক এইরকম অবস্থায় ওদের ভেতরেই একজন নতুন সন্ধান নিয়ে এল।—এক ভারতবিখ্যাত সাধু বিভিন্ন আলোকিত সভায় চমকপ্রদ সব কথা বলেন। অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, যারা মানসিকভাবে নিয়ত-নিষ্পেষণের শিকার, এইসব সভায় যোগদান করে বেশ উপকৃত। সাধারণত বড় বড় হোটেলে এই সভা বসে, এবং সে-সব সভায় যোগদান করা খরচসাপেক্ষ। তবু তারা খুশি, কেননা সাধুর বিধানগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং মানসিক স্বস্তির পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে। এইরকম একটি সভার খবর পেয়ে ওরা কয়েকজন যোগদান করে মন দিয়ে সাধুর বিধানগুলি শুনল।

এই বিধানগুলি শুনে উদ্‌বুদ্ধ নবেন্দু সেদিনের আড্ডায় বলছিল, আমি শুনে তো রীতিমতো চার্জড। এত সহজ কথা, অথচ কোনোদিন ভাবি নি! উনি সময়কে ঠিকমতো ব্যবহার করার কথা বলছিলেন— আমাদের এত টেনশন হয় মূলত দুটো কারণে—এক, ব্যর্থতা থেকে হতাশা আর ভবিষ্যতে কী হবে তাই নিয়ে আশঙ্কা। অর্থাৎ অতীতে যা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে কী হতে পারে। রহস্যটা এখানেই যে, এই অতীত বা ভবিষ্যত সময়ের কোনো ব্যবহারযোগ্যতা নেই, যা আছে শুধু বর্তমানের। অতএব বর্তমানে মনোনিবেশ কর, বর্তমানের কথাই ভাবো, বর্তমান নিয়ে ধ্যান করো। তাহলেই ব্যর্থতার হতাশা বা ভবিষ্যতের আশঙ্কা থাকবে না, মানসিক পীড়নও থাকবে না। এর জন্যে নির্দিষ্ট কিছু ধ্যানের পদ্ধতি তিনি জানিয়েছেন, সেই ধ্যানের অভ্যেস যত বাড়ানো যাবে, ব্যর্থতা ও আশঙ্কাও দূর হবে, প্রয়োজনীয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে যা একান্তভাবে জরুরি। ওর বক্তৃতা শুনে আমরা সবাই বেশ উদ্দীপ্ত বোধ করছি, এত ভালো কথা এর আগে কখনো শুনিনি। এজন্যেই ওই ভদ্রলোকের সর্বত্র এত চাহিদা।

পরিমল ম্লান হেসে বলল, তুই কি নিশ্চিত নবেন্দু, উনি সঠিক বলেছেন?

নবেন্দু অবাক। বলিস কীরে, একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। কোথায় ভুল দেখলি তুই?

বর্তমান বলে কিছু আছে নাকি? প্রতি মুহূর্তেই তো অতীত, ভবিষ্যৎ এসে দখল নিচ্ছে, তারপরই আবার অতীত। বর্তমান কোথায়?

পরিমলের কথা শুনে কিছুটা যেন বিভ্রান্ত নবেন্দু, তারপরই সামলে নিয়ে বলল, তোর যত দার্শনিক-দার্শনিক কথা, সব কিছু গুলিয়ে দেবার মতলব। আমি প্র্যাকটিকাল লোক, বাস্তব নিয়ে কাজ-কারবার করতে হয়।

আমিও তো প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করতেই বলছি।

ওটা প্র্যাকটিক্যাল! যে-সময় চলে গেছে, যা এখনো আসেনি, তার কী ব্যবহার করব! যত সব আজগুবি কথা। আর সত্যিই তো, অতীত আর ভবিষ্যতই যত মাথা ভার করে রাখে, বর্তমানকে স্বস্তি দেয় না। তার চাইতে—

কিন্তু নবেন্দু, ঠিকমতো ভেবে দ্যাখ, অতীতে শুধু তো ব্যর্থতা নয়, পাশাপাশি সাফল্যও আছে। ব্যর্থতা তোকে অভিজ্ঞতা দেয়, সাফল্য দেয় প্রেরণা। এদের ছাড়া কাজ করবি কী করে। আর এসবই স্মৃতি, তোর নিজস্ব সম্পদ, অতীত যাদের ধারণ করে রাখে।

পরিমলের এই কথার কোনো উত্তর নবেন্দু গুছিয়ে উঠতে পারে নি, তার আগেই বিকাশ বলল, পরিমলের সঙ্গে কিছুটা একমত হলেও আমার কিন্তু ধারণা, অতীত বা বর্তমান কোনোটাই নয়। ভবিষ্যৎ-ই একমাত্র ভাবনার বিষয়।

নবেন্দু হেসে বলল, তোরা দুজন মিলে যা করছিস না, বিকাশ আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ল।

তা ছাড়া আবার কী। পরিমল ঠিকই বলেছে, অভিজ্ঞতা আর সাফল্যই বর্তমানে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু সেখানে তো দাঁড়িয়ে থাকব না, আমি চাই আরো উন্নতি, আরো সাফল্য যা ভবিষ্যৎই আমাকে দিতে পারে।

আলোকিত সভায় নবেন্দু যা বুঝে এসেছিল, যা শুনে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল, বিধান অনুযায়ী এগিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছিল, সে-সবই যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থেকে, তারপর নিজেকে ফিরে পেতে বলল, এইসব আবোল-তাবোল গোলমেলে চিন্তাগুলিই যত নষ্টের মূল, কাজ না করার বাহানা। অফিসে বসে যত প্যাঁচ-পয়জারের লোকগুলোকে তো দেখছি। আমি এসবের মধ্যে নেই, সমস্ত কাজ তবে শিকেয় উঠবে। বিকাশ তো এত ওপরে উঠেছিস, আরো উঠবি, বল তো, তা কি বর্তমানে কোনো কাজ না-করেই? পরিমলের কথা না-হয় বুঝি, মনের অবস্থা ভালো নয়, তাই স্মৃতি আঁকড়ে আছে। তা হলেও পরিমলকে বলি, তুই যে লড়াই করছিস এখন, সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রটা কি বর্তমানের বাইরে?

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ায় পরিমল চুপ করে গেল। বিকাশ, নবেন্দুও সামান্য অস্বস্তিতে, সেদিন আড্ডা আর এগোল না।

পরিমল বা বিকাশ যাই বলুক, নবেন্দু নিজের ভাবনায় নিশ্চিত থেকে সেই দিশার অন্তর্বর্তী হয়েছে, যা আলোকিত সভায় সেই সাধুটির বিধানে নির্দিষ্ট ছিল। সকাল-সন্ধেয় ধ্যানযোগে

কিছুটা করে সময় কাটানো;অফিসের ফাইলে যখন চোখ, অতীতের কোনো সূত্র থাকলে তা নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামানো, আগামী ইঙ্গিতের সম্ভাবনায় উৎসারিত আবেগকে নিরস্ত করা; ভাবনায় শুধু বর্তমান, শুধুই বর্তমান, কেমন কাজ হচ্ছে, কোথায় গলদ, তার মেরামত করা; মিটিংয়ে কেউ পুরানো ক্ষতির কথা উল্লেখ করলে হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করা, ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বলতার কথায় কেউ উদ্‌বুদ্ধ হলে হেসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলা, এখন যা হচ্ছে তার কথা বলুন, কী কী দরকার সেই কথা বলুন। চীফের এই মনোভাবে সবাই অবাক হলেও অতীত-ক্ষতির দায়ভাগী যারা তারা স্বস্তি পায়, নতুন আশার আলো যারা দেখছিল তারা নিরাশ হয়।

এইভাবে চলতে চলতে নবেন্দুর মনে অতীতের গ্লানি কমছে, নতুন নতুন পরিকল্পনাজনিত আবেগ কমে গিয়ে মন নির্ভার, সংস্থায় কাজকর্মের গতি এনে সেখানে মনোনিবেশে স্বচ্ছন্দ, প্রতিদিন কাজের খতিয়ানে সন্তুষ্টি নিয়ে ঘরে ফেরে, বাড়িতে ফিরে সংসারের কাজে কিছুটা মন দেয়, রাত্রে ঘুমটা বেশ ভালোই হচ্ছে আজকাল।

বিকাশও আগের মতোই। অতীতে যেখানে যেখানে কাজ করত, তৎকালীন সহকর্মীরা কখনো যোগাযোগ করলে তাদের সতর্ক করে—ভালো আছ এটা কোনো কাজের কথা নয়, ভালো নেই, এই মনোভাব রাখা দরকার, আরো এগোও, আরো উন্নতির কথা ভাব; নিজেও বর্তমান সংস্থায় কেন ভালো নেই এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাববে। নিজস্ব যোগ্যতার পরিমাপ করে, তার সদ্‌ব্যবহার হচ্ছে না বলে আপসোস করে। সবসময় সন্ধানে আছে অন্যের সঙ্গে আলাপচারিতায়, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, এবং অন্য যে-সব সংস্থার সঙ্গে বর্তমান কর্মসূত্রে পরিচিত, তাদের পরিধির সুলুক-সন্ধানে, যেখানে তার যোগ্যতার যথার্থ ব্যবহার সম্ভব।

এইভাবে, ভালো নেই, একদম ভালো নেই, মনে মনে এই মন্ত্র জপ করতে করতে বিকাশ মানসিকভাবে সবসময় অস্থির;হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না, এই বোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; সংসারে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-র মনোভাবে বিরক্ত, তাদের আবদার-স্নেহ-মমতার মূল্য তার কাছে নেই, ওর সঙ্গে পরিবার সহযোগ করছে না এই অতৃপ্তি সবসময়, আজকাল ঘুমের ভেতরে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন ঘোরাফেরা করে, ঘুমের ব্যাঘাত হয়, একরাশ অতৃপ্তি নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, তারপর দিনের প্রবাহে ভেসে যায়।

এদিকে পরিমলের অসুখ বাড়তেই থাকছে। ছটা কেমোথেরাপি নেবার পর শরীরের এমন অবস্থা, আর নেয়া যাবে কি না ডাক্তারের মনেই সন্দেহ। শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলি ক্রমে বিধবস্ত, পরিমলের চোখে ভবিষ্যৎ এতদিন তো ছিলই না, বর্তমানও দুর্বল এখন, অতীতের অসংখ্য দৃশ্য চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ভেসে ওঠে—দাম্পত্য দৃশ্যগুলি, নিজের নানা মাঝারি অথচ অনুভবী সাফল্যগুলি, সন্তানের ভেতরে নিজের স্বপ্ন চারিয়ে দেবার চেষ্টা, তাতে সাফল্যের সম্ভাবনাগুলি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তা কালো ছায়া ফেলত মনের ওপর, তা-ও কেমন হিজিবিজি হয়ে, তার কাছে এখন অর্থবহ নয় আর।

পরিমল এখন যেন এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেছে—সামনে অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার। সেই সুড়ঙ্গের পথে চলা আর না-চলা সমান। নিয়ত এক যন্ত্রণা শরীরময়, আর কতদিন হে ঈশ্বর, এই যন্ত্রণার কি অবসান নেই? কী এমন প্রারব্ধ যা এই সুড়ঙ্গের পথে ঠেলে

দিয়েছে!—পুঙ্খানুপুঙ্খ সেসবের হিসেব করে, হদিস পায় না, নিয়তির ক্রূরতাকেই অবশেষে মেনে নেয়। দৃশ্যে ও শ্রবণে চারপাশের যে উজ্জ্বলতার কথা জানতে পারে, তার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল কমে আসছে তার।

নিয়ম করে প্রতি রোববার বিকাশ ও নবেন্দু ওর কাছে এখনো যায়। বৃথা সান্ত্বনা দেয় না আর, আজ কষ্টটা কম কিনা জিজ্ঞেস করে। এই অসুখ এখন প্রায় প্রতিটি পরিবারে, এই সংবাদ দিয়ে তার ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেবার চেষ্টা, কিন্তু পরিমলের বেদনাক্লিষ্ট মনে সাড়া জাগায় না, শুধু বলে, কী এমন করেছি আমি, যার জন্যে এমন হল? আশ্বাস চায়, পরিমলের অবর্তমানে ওর সংসারের যেন খোঁজ নেয়। ওদের সামনে এখনো অনেকটা দীর্ঘ পথ, ওরা তো কোনো দোষ করে নি?

একদিন সকালে বিকাশ ও নবেন্দুর বাড়িতে ফোন গেল, সেই ফোন চালাচালি হল তাদের অফিসে। খুবই দ্রুততায় ওরা পৌঁছে গেছে পরিমলের বাড়ি। পরিমলকে চেনা যাচ্ছে না, শরীরটা এতটুকু হয়ে চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পরিমল ওদের চিনল ঠিক, ব্যথায় দীর্ণ ওর মুখ আর কণ্ঠস্বর, হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল ওদের হাতগুলো। তিনজোড়া হাত একসঙ্গে হলে পরিমল বলল, আর সহ্য করতে পারছি না রে।—ওই স্পর্শে কী ছিল কে জানে, সম্মোহিতের মতো ওরা বসে পড়ল বিছানায়, পরিমলের পাশে। বসে বসেই দেখল, ক্রমশ আচ্ছন্নভাব পরিমলের মুখে-চোখে, তারপর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল সব-কিছু। ওদের হাত-ধরে-থাকা পরিমলের হাতও একসময় শিথিল হয়ে বিছানায় নামল। ওর শরীর যাবতীয় যন্ত্রণা ঝরিয়ে দিয়ে অপূর্ব শান্ততায় পৌঁছে যাচ্ছে, সেই শরীরে আছড়ে পড়া ওর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যপট।

নবেন্দু-র চকিতে মনে হল, এই বুঝি সেই বর্তমান, যা অতীত হয়ে যাচ্ছে না, ভবিষ্যৎ এসেও দখল নিচ্ছে না,—সেই সাধু আলোকিত সভায় যা বিশদ করছিলেন। এখন পরিমলের শরীরে কোনো অতীত স্মৃতি নেই, ভবিষ্যৎ-ভাবনাও নেই। এই মুহূর্তে ওর স্ত্রী-ছেলেমেয়েরও কোনো দিকেই কোনো প্রসারণ নেই, এখন শুধু বর্তমান আর বর্তমান। নবেন্দু-বিকাশের মনেও এই চিত্রপটটি বর্তমান সময়-কিনারে এসে এমন অনড়, যেন ব্রহ্মাণ্ড স্থির হয়ে আছে। পরিমলকে ঘিরে যাবতীয় অতীত অসম্ভব দ্রুততায় সংকুচিত হতে হতে এই অনড় চিত্রপটে এসে স্থির, সেখান থেকে আর এগোতে পারছে না। বিকাশের স্বপ্নগুলি এই স্থির সময়ের ভেতরে যেন অর্থহীন ঝুলে আছে, নবেন্দু যে বর্তমানের খোঁজে ছিল, যার জন্যে এতদিন নিবিড় অনুশীলনের ভেতরে, এই অন্য-বর্তমানে এসে তারও কোনো হদিসই নেই আর।

মুহূর্ত আর অনন্তের তফাতহীনতায় পরিমলের শরীর ঘিরে এই চিত্রপট এমন অলৌকিক, ব্রহ্মাণ্ড যেন স্থির-স্থাপত্য পেয়ে গেছে।

# কোনো বিন্যাসেরই ঠিকানা নেই

কতদূর থেকে ওর নাম ধরে ডেকেই চলেছে বিষাণ, প্রশান্ত শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে কি পাচ্ছে না একেবারেই!—বিষাণ এখন কত দূরে?—প্রায় তিরিশ বছর! শুনতে না-পাওয়া প্রশান্ত হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে আরো-আরো-বয়েসের দিকে। এত দূরে ঠিকঠাক ডাক কি শোনা যায়? যায় হয়ত, শুনতে চাইলে ঠিকই শোনা যায়, সময়ের ভেতর দিয়ে শব্দেরা তো অলৌকিক গতি পায়, এসে বাজে বুকের ভেতর। সেই যে সত্তরের উত্তাল দশকে সহসা কোথা থেকে গুলি এসে বিষাণের কপালে লেগেছিল, তারপরই থেমে গিয়ে আর এগোতে পারেনি। তখন থেকেই ওর ডাক এগিয়ে-যাওয়া প্রশান্ত-র দিকে। প্রশান্ত থামেনি, এগিয়ে গিয়েছে, পেছন ফিরে আর তাকায়নি, যেমন আজও এগিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন কর্ষণভূমির দিকে। প্রশান্ত-র বুকে-মাথায় কোথাও একটা দেয়াল তোলা আছে নাকি! যা ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই অলৌকিক ডাক? একই পৃথিবীতে এমনই দুটি সমান্তরাল স্তর বয়ে যায়!—এক পথ দুই হয়, চেনারা অচেনা।

প্রশান্ত-র চোখের সামনে পৃথিবীতে আজ অন্য কথা। সেই অতীত নেই, অরণ্যের কোথাও পাতায় ঢেকে রাখা আছে; এখন এই বর্তমান, যেখানে পদপাতে তার ভর রেখেছে; সামনে চলমান ভবিষ্যৎ, কুসুমাস্তীর্ণ নয় তা, একথা জানে, তবুও কর্ষণভূমি আছে অনেক, ফসল তোলার অপেক্ষা করতেই পারে। কবেকার সেই বিষাণ, তার কথা মনে রাখার অবকাশ কোথায়? আর তার ডাক? সময়ের স্তর ভেদ করে কিভাবে পৌঁছবে সেই ডাক? অথচ বিষাণের নিনাদকণ্ঠ মন্দ্রস্বরে অনাহত আসে, আছড়ে পড়ে প্রশান্ত-র অন্তর-দেয়ালে।

তবুও কোথাও যেন কখনো কখনো বাজে, উদাসীন প্রশান্ত-র মনে স্মৃতি উঁকি দেয়। ভাবে, সময় কি ফিরে আসে? আসে কখনো? সামনে এগিয়ে যাওয়া, তা কি থামাতে পারে কেউ! তবে কেন বিষাণের ডাক আজও তোলপাড় করে দেয় সব, প্রশান্তকে পীড়িত করে, দীর্ঘশ্বাসে ভরে বুক, সমস্ত রঙিন স্বপ্নে বিবর্ণের দাগ লেগে যায়।

সেদিন বিষাণকে প্রশান্তই ডেকে নিয়েছিল তাদের খেলায়। খেলার নিয়মগুলো বিষাণ জানতো না, জেনেছে যখন, ফেরার পথ হারিয়ে গিয়ে, ফিরতে পারেনি আর। খেলা শুধু এগোনো নয়, পিছনোও শিখতে হয়, এ নিয়ম প্রশান্ত জানে অথচ বিষাণ জানতো না—বিস্ময়ের এই বোধে যখন অবাক, সহসাই সময়ের সেই স্তব্ধতায় সে-বিস্ময়মূর্তি স্থায়ী হয়ে গেছে। প্রশান্ত ফিরে দ্যাখেনি সেই মূর্তি, শুধু বোধের ভেতরে থেমে যাওয়া সেই সময়। তার সময় টেনে নিয়ে গেছে অন্য সময়ের দিকে, সমান্তরাল সেই সময় থামতে দেয়নি আর, তাকে এগোতে হয়েছে।

আজ তার নতুন সময়ে প্রশান্ত আর শুনতে চায় না সেই কথা, তবু তার ভেতরের দেয়ালে আহত-আর্তনাদ বাজে, আর ভয় হয়, সেই বিস্ময়মূর্তি নড়বে না জেনেও ভয়, শব্দেরা প্রতীক হয়ে যদি প্রশ্ন করে,— কেন? কেন এই ভিন্ন নিয়মের কথা জেনেও তুমি বললে না আমায়?

তুমি ছিলে আগে, কোন সে-নিয়মে তুমি পেছনে চলে গেলে? আজও এর উত্তর পাইনি আমি, উত্তর না পেয়ে দিশাহারা হয়ে গেছি দ্যাখ। বল, তোমার সেই নিয়মের কথা বল, আমাকে শান্তি দাও।

প্রশান্ত-র কাছে এর উত্তর নেই। সে নিজেও জানে না, কেন!

পার্টি থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল সেদিন। মদ্যপান হয়ত একটু বেশিই হয়েছে। গরমের জন্য অথবা আর একটু হাওয়া এসে গায়ে লাগুক, টাইয়ের নটটা আলগা করে, ওপরের দিকে দুটো জামার বোতাম খুলে দিয়েছিল। সামান্য মুক্তির স্বাদ,—হাওয়া আসার জন্যে, নাকি টাইয়ের নটটা আলগা করে দেয়ায়, ঠিক বুঝতে পারছে না। এছাড়া স্থির হয়ে ভাবতেও পারছিল না, স্টিয়ারিং তার হাতে, বৃষ্টি পড়ছিল, ওয়াইপার চলছিল, সামনে থেকে চড়া আলো ছড়িয়ে গাড়িগুলোও এলোমেলো আসছিল।

যাহোক শেষ পর্যন্ত বাড়ি এসে পৌঁছেছে। অনেক কসরৎ করে, জায়গাটা ছোট হওয়ায় বার কয়েক সামনে-পেছনে করে গ্যারেজে ঢোকাতে হল। গাড়ি গ্যারেজে রেখে, গেটে চাবি লাগিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, মনে হল, কাউকে কি পেছনে রেখে এসেছে? নাঃ কেউ তো সঙ্গে ছিল না। বাড়ির দরজা বন্ধ করার পরও যেন ঐরকম কিছু একটা আবার মনে হল! দরজা খুলল, সামনের বারান্দায় গিয়ে চারদিক ভাল করে দেখে, কেউ নেই তো! তাহলে এমন মনে হচ্ছে কেন? আর ভাবতে পারছে না, ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, জুতো মোজা খুলে সোফায় বসার আগে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে, টাই গলা থেকে নামিয়ে জামার সবকটা বোতাম খুলে দিল। সোফায় হেলান দিতে যাচ্ছে, আবার সেইরকম মনে হল!

এমন সময় নন্দিতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এত দেরি হল, পার্টি ছিল বুঝি?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে বলল, দ্যাখ তো, বাইরে কাউকে কি রেখে এলাম?

বাইরে! সঙ্গে কে এসেছিল?

কেউ আসেনি, কিন্তু মনে হচ্ছে বাইরে কাউকে রেখে এলাম।

আজ কি একটু বেশি খেয়েছ নাকি?

না, তেমন বেশি না। যা বলছি, দ্যাখ না বাইরে গিয়ে।

আমার ভয় করছে, তুমিও সঙ্গে চল।

ভয়ের কী আছে? কেউ নেই, তবু মনে হল যেন—

দরজা খুলে দুজনেই বাইরে এল। তাড়াতাড়ি বারান্দার এপাশে ওপাশে দেখে নিয়ে নন্দিতা বলল, কেউ নেই তো? চল, ভেতরে চল। প্রশান্ত কিন্তু গ্যারেজের সামনে কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল, একটা চেনা পুরনো গন্ধ।

নন্দিতা অপেক্ষা করল না। আমি ভেতরে যাচ্ছি। খাবে তো, নাকি? রাত হয়েছে, খাবার বাড়ছি, তাড়াতাড়ি জামাপ্যান্ট ছেড়ে এসো।

নন্দিতা চলে গেছে, প্রশান্ত তবু নড়তে পারছে না। কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে তাকাল, তারপর মাথায় ভারী বোঝা নিয়ে ফিরেছে।

জামা-প্যান্ট ছাড়তে পারছে না, সোফায় বসে আছে। কেন এমন মনে হচ্ছে আজ! যা বাইরে রেখে এসেছে তা কেউ না হলেও কিছু একটা নিশ্চই। একটু পরেই নন্দিতা

খাওয়ার জন্য তাগাদা করতে এলে বলল, খাওয়ার কথা এখন আর মাথায় আসছে না, তুমি খেয়ে নাও।

নন্দিতা লঘু হবার চেষ্টা করল, খাওয়ার কথা মাথা তো নয়, পেট বলবে।

মাথাই পেটকে দিয়ে বলায়। এখন যাও দেখি। প্রশান্ত-র এসব কথাবার্তা ভাল লাগছে না। একটা ঘোর এসে ঘিরে ফেলছে ওকে। জামাপ্যান্ট ছাড়তে ইচ্ছে করল না, নন্দিতা এরপর কী করল খেয়ালও করছে না, শুধু ওর বোধের ভেতরে ক্রমাগত যেতে যেতে, যেতে যেতে—

সময়ের ধূসরতা কেটে গিয়ে স্বচ্ছ আকাশের মুখোমুখি। সেখানে অস্পষ্ট একটা মুখ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে—বিষাণের মতো যেন,—বিষাণই তো!—হ্যাঁ, বিষাণ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অবিরাম রক্ত ঝরছে ওর কপালের পাশ থেকে, চোখদুটো লাল, কী বলতে গিয়ে স্বর স্পষ্ট হচ্ছে না।

প্রশান্ত কি ভয় পেল? বিষাণের স্বর স্পষ্ট হোক, ও কি চায় না? শোনার কেন আগ্রহ নেই ওর?

ইচ্ছে থাক, অনিচ্ছা থাক, স্বর ক্রমে স্পষ্ট হতে শুনল সে,— কেমন আছ প্রশান্ত? আমি ভাল নেই, দেখছ তো। তবু দ্যাখ, যুদ্ধ ছেড়ে পালাইনি একবারও। যুদ্ধের শেষ হয় না, কেউ ভাল থাকে না, থাকতে পারে না। তুমি পালিয়ে গিয়ে আর এক যুদ্ধের ভেতরে, সেখানে কি ভাল আছ?

প্রশান্ত শুধু দেখছে বিষাণকে, কিছু বলতে পারছে না। এক সময় বিষাণ পেছন ফিরল, এগিয়ে গেল আরো স্বচ্ছতার দিকে। যেন সম্মোহিত প্রশান্ত, চলেছে ওর পেছনে পেছনে। ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় বিষাণ!

একটা ঘরের ভেতরে পৌঁছেছে ওরা। সেখানে আরো কয়েকজন,—চেনা-অচেনা, তার ভেতরে প্রশান্তকেও দ্যাখা গেল। সবাইকে সম্মোহনে রেখে প্রশান্ত কী কথা বলে যাচ্ছে, এত সময়-দূরত্বে ঠিকঠাক স্পষ্ট নয়। জন্ম নিচ্ছে ধূসর ছবিগুলি, গম্ভীর মুখের বৃত্ত, দৃঢ়-নিবদ্ধ চোখ, কঠিন চোয়াল, মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলি।

এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে বিষাণ ওকে নিয়ে গেছে নদীর পাড়ে। নদীটা কি চেনা যায়? স্বপ্নে দ্যাখা যেন, স্মৃতি দিয়ে নতুন নির্মাণ? ওখানে পৌঁছেই বিষাণ শান্ত হয়ে গেছে, তার পাশে প্রশান্ত আবার! অশান্ত ওর শরীর, মুখ-চোখ, বিষাণের চারপাশে ঘুরছে আর ঘুরছে, কত কী বলে যাচ্ছে, নীরব বিষাণ শুনছে মন দিয়ে।

সহসা ছবি থেকে সেই প্রশান্ত মুছে যেতে বিষাণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আবার এই প্রশান্ত-র মুখোমুখি।—দেখছ এসব? মনে পড়ছে তোমার?

এখন এসব আর কেন বিষাণ? সময় পেরিয়ে অনেকদূরে আমরা। তুমিও তো থেমে গিয়েছিলে।

থেমেই তো গিয়েছিলাম। এখনো থেমে আছি, তবু হারিয়ে যাইনি। তুমি আর পেছন ফিরে দ্যাখ নি বলে জানতে পারলে না।

থেমে গিয়ে কী লাভ হয়েছে তোমার? সে তো হারিয়েই যাওয়া, পেছন ফিরলে নতুন করে শুরু করা যেত।

যেমন শুরু করেছ তুমি?—বিষাণের মুখ-চোখ ভেঙেচুরে যাচ্ছে।—সেই দৃশ্যটা দেখবে না?

সেই দৃশ্যে নতুন কী দেখব বলতো? ভুল বৃত্তান্ত শুধু।

অথচ সেই ভুল তুমিই তৈরি করেছিলে।

হয়ত, তবু ভুল থেকেই শিক্ষা নিতে হয়, ইতিহাস থেমে থাকে না।

এখন যেভাবে তুমি নতুন ইতিহাস গড়ছ? বিস্ময়ে, ঘৃণায়, জিঘাংসায় বিকৃত হতে হতে বিষাণের শরীর, মুখ-চোখ ভেঙে-ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, দেখতে-দেখতে প্রশান্ত-র সমস্ত শরীর আমূল কেঁপে উঠল। স্বচ্ছ আকাশের ভেতরে একা প্রশান্ত, আর চারদিকে নিনাদিত হাহাকার, ক্রমাগত প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তার এই কেঁপে-ওঠার মধ্য দিয়ে নদী, নদীর পাড়, তার ওপরে নির্মল আকাশ কেমন কাঁপনের ভেতর চলে গিয়ে ধূসর, ধূসরতর ক্রমে, তারপর ফেটে চুরমার হয়ে—

কোথায় প্রশান্ত!—ধড়ফড় করে উঠে দেখল, সোফার ওপরে আধশোয়া হয়ে আছে। নন্দিতার কথা তখনই মনে হতে, কোথায় গেল! ওকে না ডেকেই চলে গেছে? প্রশান্ত উঠল, রীতিমত অবিন্যস্ত পোশাক, টাইটা চোখে পড়েছে, বিশ্রী ঝুলে আছে, দুলছে। ওটা সোজা করে, তারপর গলা থেকে খুলে নিয়ে শোবার ঘরে গেল। দিব্যি শুয়ে আছে নন্দিতা, মুখে অনাবিল প্রশান্তি! এইভাবে ওকে একা রেখে দিব্যি শান্তির ভেতরে!

ডাকল না, ওভাবেই শুয়ে থাক। চোখে-মুখে জল দিয়ে নিজেকে বরং গুছিয়ে নিতে হবে। বাথরুমে গিয়ে বেসিনের কল খুলতে সামনে আয়নায় মুখ। নিজের মুখ!—কেমন যেন, এই প্রশান্তই কি সেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে,—সে তো অনেক বছর আগের কথা, উসকো খুসকো চুলে পরিপাটি ছিল না তখন। সেই প্রত্যয় কোথায়?—সামনে যুদ্ধ ক্ষেত্র—জীবন তো একটাই, সময় এত কম অথচ কত কাজ, থামার উপায় নেই। সেই যুদ্ধ ছেড়ে এসে এখন নতুন যুদ্ধের ভেতরে প্রশান্ত-র শরীর কেমন যেন,—শরীরে মেদ জমে ভারী, মুখে-চোখে বয়েসের ভার। বড় বেশি অপমানের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে, তবু এখনো জীবন একটাই, সময় কম, উন্নতির শিখরে পৌঁছতে বড় দ্রুত আরো বেশি অপমানের ভেতরে নিজেকে নিয়ে গিয়ে—আজ সন্ধের পার্টিতে বায়বীয় কথার ভেতরে সবাই পাশাপাশি, তবু কে কত বেশি পরিপাটি হতে পারে, কে কত বেশি গুছিয়ে বলতে পারে, এসবই তো ঘটল আজ সন্ধেয়। এই নতুন যুদ্ধের ভেতরে অনেক সময় পার করে এসেছে সে, পুরনো প্রশান্তকে ছেড়ে নতুন প্রশান্ত হয়ে উঠতে কী কী করতে হল তাকে, আজ এসব আর মনে পড়ে না।

সহসা এক ভয় এসে সন্তর্পণে ঢুকে গেল ওর মনের ভেতরে।—এই আয়নায় নতুন প্রশান্ত-র পেছনে যদি আবার দ্যাখা যায় বিষাণের মুখ, কপালের রগের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে, ঝরছেই। যদি আরো প্রশ্ন করে সে,—কী উত্তর দেবে তার? উত্তর দেবার কী-ই বা আছে। এই প্রশান্ত বিষাণকে চেনে না, সময়ের ভেতরে অনেক স্তরভেদ ঘটে গেছে এতদিনে, উত্তর দিতে হলে পুরনো প্রশান্তকেই খুঁজতে হবে। এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই থেমে থাকে না; সময় থামতে দেবে না তোমাকে। বিষাণ সরে গেছে পৃথিবী থেকে, যতটুকু করার তা শেষ করে, সে কেন ফিরে আসবে? যার কাছে যাবার কথা ছিল সেই প্রশান্ত হারিয়ে গেছে সময়ের পলিতে, উঠে এসেছে নতুন প্রশান্ত, যে চলে গেছে অন্য যুদ্ধের ভেতরে। সেখানে কিভাবে আসতে পারে বিষাণ? নাঃ, এভাবে ভয় পেলে চলবে না। এখন যা করতে হবে, নিজেকে ঠিক বিন্যাসে নিয়ে এসে যা অতীত, যা ফিরে আসবে না, তাকে মুছে ফেলা।

আয়না থেকে মুখ সরিয়ে ঠিক বিন্যাসে যাবার আগে, তখনই শোনা গেল বিষাণের অলৌকিক কণ্ঠস্বর! ভয়ে আয়নার কাছে ফিরে যেতে পারছে না, আর মুখোমুখি হতে চায় না সে, কোনো কিছুই বলার নেই তার।

বিষাণ বলছে, ভয় পেলে? প্রশান্তকেও সঙ্গে করে এনেছি, চিনতে পার?

সময়ের পলি ভেদ করে নিজের ভেতর থেকেই প্রশান্ত যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, পাশে বিষাণ। ওদের কোনো দৃশ্য নেই, শুধু বোধের ভেতরে।

একটা আর্ত চিৎকারে মন্দ্রিত ওর অন্তঃস্থল,—কেন ফিরে এলে প্রশান্ত? অতীত কি ফিরে আসে?

অতীত ফিরে আসে না, হারিয়েও তো যায় না। হারিয়েই যদি যাবে, আমাকে চিনলে কিভাবে? আমি না হয় ভয় পেয়েছিলাম, সে-ভয় আজও বিষাণ মেনে নেয়নি, সে ভুলের সংশোধনও নেই, ক্ষমাও নেই। কিন্তু তুমি কেন ভয় পাচ্ছ?

তুমি ফিরে এসেছ বলেই। ফিরে আসা তোমার উচিত হয়নি।

আমার ফেরা উচিত ছিল, ফিরতেই তো চেয়েছিলাম আমি। কারণ একটাই জীবন, তাকে নষ্ট করার মানে হয় না। কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে তুমি এগিয়ে গেলে।

ঠিকই বলেছ, একটাই জীবন, আর সেজন্যেই তো পেছনে ফিরতে পারিনি।

ফিরতে পারনি বলেই আমার থমকে-যাওয়া দ্যাখনি। তবুও আমি আছি, বিষাণও আছে। তুমি ভয় পাও আর না-ই পাও, আমরা থাকবও।

প্রশান্ত এবার সত্যিই ভয় পেল। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই? ঐ তো নন্দিতা ওখানে শুয়ে আছে, যে ওকে আগের প্রশান্ত থেকে ছাড়িয়ে এনে অন্য যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, গড়ে তুলেছে এই নতুন প্রশান্তকে।—নন্দিতার কাছেই ওকে এখন যেতে হবে।

জামাপ্যান্ট ছেড়ে ঠিক বিন্যাসে যাওয়া হয়নি প্রশান্ত-র, বিছানায় নন্দিতার কাছে চলে গেছে। শান্ত-মুখের নন্দিতাকে কয়েকবার ডাকল, ধাক্কাও দিল। নন্দিতা জাগল না, উত্তরও দিল না, পাশ ফিরে শুয়েছে।

# স্বপ্ন দ্যাখার বৃত্তান্ত

একদা ওরা তিনজন মিলে নতুন স্বপ্ন তৈরী করেছিল। বাড়িটার একতলা ছিল না, শুধুই ফাঁকা জমি। তখন যে স্বপ্ন বুনেছিল ওরা, সেই স্বপ্নে লৌকিক সময় যুক্ত হয়ে বর্তমানে এই একতলা। সেই পুরনো স্বপ্ন আর নেই, বাস্তবের গলিঘুঁজিতে কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন এই একতলা মানে দরজা খুললেই রাস্তা, রাস্তায় লোকজনের চলাচল, হকারদের ডাকাডাকি, গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা, তুমুল বৃষ্টি হলে জল জমে বাড়িতে উঠে আসার ভয়, প্রবল গ্রীষ্মে সীলিং থেকে গরম হাওয়ার চলাচল। স্বপ্ন নেই কোথাও, চারদিকেই বাড়ি, দোতলা, তিনতলা, কোনো অবকাশ নেই। অতএব নতুন করে স্বপ্ন দেখতেই হল। ওরা তিনজন তাই নতুন করে স্বপ্ন রচনা করেছে।

স্বপ্ন নিয়ে পুরনো স্থপতির কাছেই। লোকটি আমায় চিনতে পেরে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। আপনার স্বপ্নটা খুলে বলুন তো। মন দিয়ে স্বপ্নটা শুনলো, তারপর একটু হেসে, ভালই তো, গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন? ছেলের সঙ্গে? ওদের মাথায় তো নানা স্বপ্ন ঘোরে।

তিনজন মিলেই আমরা স্বপ্নটা তৈরী করেছি।

তা করেছেন, কিন্তু সমস্যা এই, মেয়েরা স্বপ্ন দ্যাখে বারবার, একবারে গুছিয়ে উঠতে পারে না। আসলে কি চায় ওরা নিজেরাই ঠিকঠাক জানে না। আর ছেলের তো সবটাই আবেগ, অভিজ্ঞতা কম। আপনার স্বপ্ন ঠিকই আছে। আমি তার সঙ্গে মানানসই যোগ করব। সেটা নিয়ে ওদের দ্যাখাবেন। ওরা কী বলে দেখুন। তারপর চূড়ান্ত করব।

স্থপতির পরিকল্পনায় নতুন স্বপ্ন নিয়ে তিনজন বসল। তাতে আরো কিছু যোগ হল, কিছু বিয়োগ হল, এইভাবে বেশ কয়েকবার যোগবিয়োগের পর চূড়ান্ত স্বপ্নটি তৈরী হয়েছে।

এই স্বপ্নকে রূপ দিতে এরপর কারিগরের সন্ধান। যে কারিগর একতলার রূপ দিয়েছিল তার সন্ধান করতে গিয়ে যখন খোঁজ পেয়েছে, সে প্রায় বুড়ো, আগের যৌবনদীপ্ত চেহারা নেই, সেকি রূপকার হতে পারবে? তবু কথা বলতে বলতে ওর চোখে পুরনো হাসি, মুখের কাঠিন্য দেখে ভরসা হল। শরীরে বার্দ্ধক্য দ্যাখা দিয়েছে ঠিকই, মনের শক্তি নষ্ট হয় নি। যখন স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে বলল, স্বপ্নটা সুন্দব সাজিয়েছেন, ভাববেন না, এই স্বপ্ন যখন রূপ পাবে আপনাদের মনে আরো নতুন নতুন স্বপ্ন জেগে উঠবে, ভরসা রাখুন আমার ওপর,— তিনজনই উদ্দীপ্ত হয়ে ভাবল, ওর ওপর নির্ভর করে যথার্থ লোককেই নির্বাচন করা গেছে। অতঃপর কিছুদিন ওরা নিশ্চিন্তে ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে সকাল শুরু করল, সারাদিন স্বপ্নের ভেতরে চলাচল করে স্বপ্নকে বুকের ভেতরে গচ্ছিত রেখে ঘুমোতে গেল।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর ওরা লক্ষ্য করল, বাড়ির চারপাশে নানা জিনিসপত্রের স্তূপ গড়ে উঠছে। বাড়ির সীমানার ভেতরেও নানা লোকজন কঠিন সব বস্তু এনে জমা করতে থাকল, এমনকি বাড়ির ভেতরে ঢুকেও ওরা চলাচল সুরু করে দিয়েছে। ক্রমশ বিচিত্র সব

লোকজনের হৈ হুল্লোড় চিৎকার চেঁচামিচিতে ব্যস্ত ওরা, বাড়ির ভেতর থেকেও বেরোতে যেন ভয়। একসময় পুরনো স্বপ্নগুলোও যখন চুরমার হতে দেখল, নতুন স্বপ্নের জন্য ওদের মনে কোনো অবকাশই আর থাকল না।

কারিগরকে ডেকে এই বিপর্যয়ের কথা তুললে ওর মুখে রহস্যময় হাসি। কিছু গড়তে গেলে কিছু ভাঙ্গতে তো হবেই। চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের থেকে আরো ভালো হয়ে উঠবে সব।

অতএব ওরা আর চিন্তা করলো না। নতুন স্বপ্নও একসময় বিদায় নিল। এরপর আরো বিপর্যয়ের ভেতরে যেতে যেতে, আরো বিপর্যয়ের আশংকা করতে করতে নিজেদের দিনযাপনের অস্তিত্ব নিয়েই শুধু চিন্তিত হল।

একদিন দেখল, অদ্ভুতদর্শন অনেক লোক অদ্ভুত এক যন্ত্র নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছে। সমস্ত বাড়ি তোলপাড়। ছাদের ওপর বিচিত্র নানা শব্দ। ঘরের ভেতরে এক কোনে আশ্রয় নিয়ে ওরা প্রহর গুনতে লাগল কখন এই তোলপাড় থামবে, কখন আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সারাদিন এইভাবে কেটে যাবার পর সন্ধের দিকে সব শব্দ থেমে গেল। অদ্ভুতদর্শন লোকেরা তাদের অদ্ভুত যন্ত্রটা নিয়ে চলে গেল। এক আশ্চর্য নীরবতার ভেতরে লন্ডভন্ড চারদিক। কারিগর এসে আশ্বাস দিল, যাক, সবকিছু আজ ভালোয় ভালোয় কাটল। এখন কিছুদিন বিশ্রাম। আপনারাও স্বস্তিতে থাকুন। ওপরে চলুন, দেখবেন, আপনাদের স্বপ্ন রূপ পেতে সুরু করেছে।

ওরা ওপরে গেল, দেখল সবকিছু। কোথাও স্বপ্নের কোনো চিহ্ন নেই। বরং অনেকটাই চুরমার হয়ে অসংখ্য বাঁশের ওপর চাপানো এক ভঙ্গুর আচ্ছাদন। চারপাশে আকাশ দৃশ্যমান, উন্মুক্ত, সেখানে আবরণ না থাকায় বরং শংকা গ্রাস করছে।

কারিগর বলল, স্বপ্নকে এভাবেই রূপ দিতে হয়। এরপর দেখবেন, আস্তে আস্তে কেমন গড়ে উঠছে। ছাদ এখন কিছুদিন জল খাবে, স্বপ্ন ধারণ করার জন্যে শক্তির জোগান দেবে। সময়টা ভাল, বর্ষাকাল, জল নিয়ে সমস্যা নেই। আপনারা চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

কারিগরের কথায় ওরা আশ্বস্ত হয়েছে। স্বপ্নের বীজ রোপন হল, এর পরে অঙ্কুরোদগম, এই প্রত্যাশায় দিন গুনতে লাগল। অথচ চিন্তারা মুক্ত না হয়ে আরো যুক্ত হচ্ছে। গভীর বর্ষাকাল, দিনে রাতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। প্রয়োজনের অনেক বেশী জল খাচ্ছে ছাদ, একই সঙ্গে ওরাও। আগে তবু ঘরের এক কোনে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিল, এখন সর্বত্র জল ঢুকে সেই আশ্রয় থাকছে না। এমনি সময়ে কারিগর একদিন এসে, তেমনি হাসিমুখ তার, সবকিছু দেখে শুনে, দাঁড়ান, সব ব্যবস্থা করছি।

ব্যবস্থা হল, ব্যবস্থা চুরমার হল, আবার ব্যবস্থা হল। নতুন স্বপ্নের দ্যাখা নেই, পুরনো স্বপ্নটাই ওরা আবার আঁকড়ে ধরতে চায়। তাও অনিশ্চয়তার ভেতরে। এইভাবে ঘোর বর্ষা কেটে গেল।

কিছুদিন পর সেই কারিগর আবার কাজ শুরু করেছে। মূল কাঠামোয় পলেস্তারা পড়ল, নোংরা হল সবকিছু। পরিষ্কার হল, নোংরা হল, পরিষ্কার হল। এইভাবে চলতে চলতে একদিন

কারিগর এসে, আপনাদের স্বপ্ন কাঠামো পেয়েছে। এটুকু আমার কাজ। এবার তাতে অলঙ্কার দিতে হবে। অন্য কারিগরদের ডাকুন। আমার হিসেব তৈরী, মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করুন।

হিসেব মেটাতে গিয়ে লোকটি গলদঘর্ম। এত খরচ! আরো কত পড়বে মনে হয়?

অলঙ্কারেই তো আসল খরচ। যত বেশী স্বপ্ন তত খরচ। সব শুনে লোকটির মন থেকে স্বপ্ন হারিয়ে গেল। স্ত্রীকে বলল, ছেলেকে বলল, ওরাও শুনে অবাক। তাহলে আমাদের স্বপ্নের কী হবে? মেঝে এইরকম চাই, বিদ্যুতের এই চেহারা দরকার, বাথরুমটা শখের, এইসব না হলে চলবে না, কাঠের সজ্জা মানানসই করতে হবে। স্বপ্নকে রঙিন না করলে তো চলবে না। তুমি কেন আগে থেকে এসবের হদিস কর নি? স্বপ্নের এমন বিকৃত চেহারা নিয়ে আমরা থাকব কিভাবে?

খোঁজ করে করে অন্য কারিগরদের ডাকা হল। তারা দেখে শুনে যা হিসেব দিয়েছে, তার পর আর স্বপ্ন নেই, শুধু উৎকণ্ঠা, শুধুই হতাশা।

লোকটির স্ত্রী বলল, উপায় না থাকলে আমার গয়না বন্ধক রাখ, কিন্তু ফেরৎ দিতে হবে। কবে ফেরৎ দেবে আগে বল। ছেলে বলল, আজকাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করতে পারি, মাসে মাসে কিস্তিটা তুমি দিয়ে দেবে তো?

লোকটি বলল, আমার নামে বাড়ি, তোকে কে ধার দেবে?

তাহলে আমার নামে লিখে দাও।

সে অনেক ঝামেলা। আমিই বরং ব্যাঙ্কে চেষ্টা করে দেখি।

এর আগে কোনোদিন কারো কাছ থেকে ঋণ নেয় নি লোকটি, এখন আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত। বাঁকানো পিঠ, ঘোলাটে চোখ, শরীরের ওপর, এমন কি কাজের ওপরও মনের নিয়ন্ত্রণ নেই। বিদ্যুতের কারিগর কাজ করে যাচ্ছে, বাথরুম অলঙ্কৃত হচ্ছে, মেঝে পাথর-শোভিত। স্ত্রী, ছেলে নির্দেশ দিচ্ছে কিভাবে কী কী করতে হবে, টাকার হিসেব রাখা ছাড়া লোকটির অন্য কোনোদিকে মন নেই। কবে শেষ হবে এই ভাবনায় শুধু তাড়িত হয়ে আছে।

স্ত্রী এসে কখনো বলছে, পাথরের রঙটা কেমন সুন্দর দেখেছ!

তোমার পছন্দ!

হ্যাঁ। কিন্তু আয়নার মত চকচকে করে দিতে হবে, সুপ্রিয়ার বাড়িতে যেমন, কারিগরকে বল।

বলেছি, পয়সা বেশী দিতে হবে বলল।

আবার কখনো,— লাইটের ফিটিংস আমি নিজে পছন্দ করে কিনব। তুমি সঙ্গে যাবে।

আমার সময় নেই। ছেলেকে নিয়ে যাও।

বাথরুমের সবকিছু সুন্দর হয়েছে না?

তুমি পছন্দ করে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

ছেলে এসে গজগজ করতে লাগল। বাবা তুমি কিছু দেখছ না। মা-র পছন্দ একেবারে সেকেলে। এ বাড়ির-টা, ও-বাড়ির-টা দেখে ঠিক করছে। একবারই তো এসব হবে, আরো মডার্ণ করা দরকার।

মা-র সঙ্গে কথা বল।

মা ছেলের মধ্যে প্রায়ই তর্ক, মাঝে মাঝে কথা বন্ধ। লোকটি এসবের ভেতরে নেই, শুধু কারিগররা এলে কথা বলে। ওদের হিসেব দ্যাখে, তারপর ব্যাঙ্কের পাশবই দ্যাখে। কখনো সম্মতি দেয়, কখনো সম্মতি দেয় না।

এইভাবে অনেক দিনের পর কারিগররা তাদের পাওনা হিসেব করতে এলে বুঝল, কাজ শেষ হয়েছে। টাকার চিন্তায় জেরবার মনটা, চারপাশ ফাঁকা হয়ে আছে, তার যেন অনেক বয়েস, হাঁটতে হাঁটতে লোকটি একদিন বাড়ি ফিরছিল। হয়ত অন্যমনস্কই ছিল, চারপাশে অনেক বাড়ির দোতলা তিনতলা উঠেছে, কোনো কোনোটায় রঙও চড়েছে। এপাশে ওপাশে দেখতে দেখতে কখনো আকাশের দিকে, কখনো দুপাশে, একসময় একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ সুন্দর লাগছে তো, নক্সাগুলো দারুণ খুলেছে।

হঠাৎ-ই একটা শ্লেষপূর্ণ কথায় চমকে দেখল, সে-বাড়িরই একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী, এটি তারই কণ্ঠস্বর,—থাক, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ির শোভা দেখতে হবে না।

আরে! নিজের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সে! বাইরে থেকে মন্দ দ্যাখাচ্ছে না তো!

স্বপ্নটা যেন মনের ভেতরে আবার। কিছুটা হলেও ভারহীন বোধ করে লোকটি। বাড়ির ভেতর ঢুকে, তারপর যাবে সিঁড়ি বেয়ে নতুন দোতলায়। ওটা নিশ্চ ই আরো সুন্দর হয়েছে—

জিনিসপত্র সারাদিন ওপর-নীচ করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছি, তোমার এখন শোভা দ্যাখার সময় হল! ওপরে এসে দেখে যাও, তোমার মিস্ত্রিরা কী করে রেখে গেছে।

কর্কশ কণ্ঠস্বরে সহসাই স্বপ্ন অদৃশ্য। মনের পুরনো ভার শরীরে চেপে গিয়ে পা যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে চাইছে না। তবু ঢুকতে হল। তারপর দোতলায়। স্ত্রী ওকে দ্যাখাচ্ছে, এখানের এই দেয়ালটা চটিয়েছে, এরকম অনেক দেয়ালেই। একটা বাথরুমেরও ফ্লাশ ঠিকমত কাজ করছে না। বড় বাথরুমে জল সরছে না, এই আয়নাটা বাঁকা বসিয়েছে....।

লোকটির মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু বলল, একটু আধটু ওরকম হতেই পারে। থাকতে থাকতে সব ঠিক হবে, নয়ত ঠিক করে নেওয়া যাবে।

রাত্রে অফিস থেকে ফিরে ছেলে গজগজ করে চলেছে। আমার কথা কেউ তোমরা কানে তুললে না। ঠিক আছে, আমার মাইনের টাকা থেকেই একে একে সব ফিটিংস পাল্টে ফেলব। কারো কথা শুনব না আমি।

এসব কথাও লোকটার মনে আতংক উৎপাদন করছে না। স্ত্রী ঘর গোছানোর কাজ করেই চলেছে। এটা কর ওটা কর, আদেশ করলে লোকটি শুধু পালন করছে। মাঝে মাঝে স্ত্রী বলে উঠছে, ছেলেটাও হয়েছে এমন, খালি বড় বড় কথা! ওকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়।

এমনিভাবে সমস্ত দিনের ঘর্ষণ-শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর ইজিচেয়ারটা বারান্দায় নিয়ে এই প্রথমবার লোকটি একটু আরাম করে বসতে চাইল। সেখানেও স্ত্রী-র ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। তোমার আর কি। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকবে। আর বাড়িতে এসে এই বারান্দায় বসে থাকবে। আমার যে কিভাবে দিন কাটছে, ওপর-নিচ করে কোমর ব্যথা হয়ে গেল, বাতে ধরতে আর বাকি নেই। এখনই ধরছে।

নাঃ, স্বপ্ন কোথাও নেই। স্বপ্ন কি ছিল কোনোদিন! থাকলেও, তাকে কিভাবে রূপ দিতে হয়, লোকটি কি জানে? যতটা বেশী সম্ভব অফিস থেকে ধার নিয়েছে। মাত্র পাঁচ বছর চাকরি বাকি। সেই ধার শোধ করে সংসার-খরচ কিভাবে চলবে, ভাবনায় মাথা ঝিম হয়ে আছে। অবসর নেবার পর যে টাকা পাওয়া যাবে, স্ত্রী-র গয়না ফেরৎ নিয়ে ব্যাঙ্কের ধার কিভাবে শোধ হবে সেই ভাবনায় কোনো ভরবেগ নেই। তারপর সংসার-খরচ, ছেলের বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বারান্দায় বসেও কি একা হওয়া যাচ্ছে! চারপাশ থেকে নানারকমের থাবা ঢেকে দিয়েছে আকাশ।

লোকটি ভাবে, স্বপ্ন কি সত্যিই কেউ দ্যাখে? নাকি দেখতেই চায় শুধু। অথবা নিজেকে আড়াল করার জন্যে স্বপ্ন দ্যাখার ভান করে যায়।

# স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী

অনীশের বিয়ের দিন ঠিক হবার পরও প্রায় দুমাস যাবৎ মনের ভেতরে গুরুভার চেপে থেকে, সোজা হয়ে তাকাবার মতো অবস্থা ছিল না। এরপর সমস্ত কর্মকান্ড শেষ হয়ে এখন অনেকটাই ভারহীন, নিশ্চিন্ততার নিটোল স্বাদ তার মনে। বিকাশ এখন সোজা হয়ে হাঁটে, অন্যদের মুখের দিকে সরাসরি তাকায়, দিব্যি ঘুম হয় রাত্রে, এমনকি দিনে-দুপুরেও।

বিকাশের ছেলে অনীশ, বিয়ের পর পালটে গেছে অনেকটাই। আগে অফিস যেত, এখনও যায়, যাওয়ার ভঙ্গি অন্যরকম। —পোশাকে রঙ এসেছে, দীপ্ত মুখ। বোঝা যায়, একটা গাঢ় স্বপ্ন ওর মনের আকাশে। সেখানে বাস্তবের সময়-ঘর্ষণ নেই, যত খুশি প্রসারিত হয়। একেবারেই অন্য পরিবেশ থেকে মেয়েটি এসে সঙ্গী হয়েছে। তনিমা, নামটা সুন্দর। ছিপছিপে, গায়ের রঙে মানানসই। অজানা, তাই রহস্য মেখে আছে। মনের আকাশে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ায়, অফিসে যাবার সময় মুখে স্মিত হাসি, অফিস থেকে ফিরে গাঢ় আহ্বানে ক্লান্তি মুছে যায়। কিছুদিন পর পাহাড়ে-সমুদ্রে নিয়ে যাবে, বিস্তারের পটভূমিতে একেবারে একা দেখবে ওকে। মেয়েটি একান্তই তার নিজের, মনের সমস্ত কথা উজাড় করে বলতে পারবে। বেশি কথা বলে না সে, শুধু শোনে গভীর আগ্রহে। সমস্ত জীবন ওকে নিয়ে এমন গাঢ়তায় এ এক অভিজ্ঞতা, এতদিনের একা-একা জীবন থেকে কতটা আলাদা! না হলে এই জীবনের কী-ই অর্থ থাকত। তনিমা সিনেমা দেখতে ভালোবাসে, সিনেমা হলের অন্ধকারে ওকে পাশে নিয়ে—এর আগে সিনেমা দেখতে গিয়ে এমন স্বাদ পায়নি সে। তারপর কোনো রেস্তোরাঁয়, চিকেন আর আইসক্রিম সবচেয়ে বেশি পছন্দ, বেশ লাগে ওর খাওয়া দেখতে। চাকরি করার ইচ্ছে মনে মনে খুব, অনীশের খুব আপত্তি তা নয়, সরাসরি না করেনি। এখনই দুজনে চাকরি করলে কেমন যন্ত্র হয়ে যাবে তা কি বোঝে না? মাঝে মাঝে দু-একটা রান্না করে, খুব যে স্বাদের হয় তা না, তবু ওর রান্না করা, তাই মজা পায়। সুযোগ পেলেই চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে, অনীশ চায়ের খুব ভক্ত নয়, তবু রাজি হয়ে যায়। তনিমা চা ভালোবাসে, ভালোবাসার সঙ্গী হতে ভালোই লাগে। অনীশ ভাবে, একটি মেয়ে, সর্বক্ষণের সঙ্গী, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে। জীবনে এর চেয়ে ভালো স্বাদ আর কী হতে পারত?

অনীশের মা মাধুরীও স্বপ্ন দ্যাখে। দেখছে বিয়ের পর থেকেই। একজন অন্তত থাকবে সারাক্ষণের সঙ্গী, কথা বলার, কথা শোনার। আস্তে আস্তে সব দায়িত্ব ওকেই দিয়ে দেবে, নিজে ঝাড়া গা-হাত-পা হয়ে, কতকিছু করা হয়নি জীবনে, এবার ধীরে ধীরে করবে সব। বিকাশের অফিসের তাড়া, খবরদারি মেনে নিতে নিতে নিজের অস্তিত্বটাই ভুলে গেছে এতদিনে। অনীশটাও শেষের দিকে ওর বাবার মতো, বদমেজাজী হয়েছিল, এখন বৌ-য়ের ওপর যত পার চোখ রাঙাও, দেখবে কত ধানে কত চাল। আজকালকার মেয়ে ওসব সহ্য করবে না, তখন মায়ের কদর বুঝবে। ওদের হাতে সংসারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে কোথাও বেড়িয়ে আসবে। সেই যে বিয়ের পর পরই দু-একজায়গায় গিয়েছিল, কিছুই মনে নেই, সিনেমা-

থিয়েটার দেখা ভুলেই গেছে। সময় নেই, অসময় নেই, চা চাই। জামা-প্যান্ট ইস্তিরি হয়নি, ঠিকমতো ধোয়া হয় নি, কাজের মেয়েটা আসছে না, এসব ঝক্কি থেকে রেহাই নিয়ে নিশ্চিন্তে টিভি-র সিরিয়ালগুলি, পছন্দসই গান-বাজনা, বইপড়া, এসবের মধ্যে জীবনের অন্য স্বাদ। প্রথম থেকেই বৌ-কে সেভাবে তৈরি করে নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নয়। মাধুরী বোঝে, আজকালকার মেয়ে, যদি মেনে না নেয়? আস্তে আস্তে ভালোবেসে, স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলবে; ওর যেন কষ্ট না হয়, আনন্দে থাকে, সেদিকটাও দেখতে হবে। একটু আধটু আব্দার তো মানতেই হবে, নিজে এত কষ্টের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে, ঠিকই সামলে নেবে। এতদিন মনে যে স্বাচ্ছন্দ ছিল না, এখন তা আবিষ্কার করছে মাধুরী।

বিয়ের দিন ঠিক হবার পর থেকে তনিমাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। অনীশ যেদিন দেখতে এল, সেদিনই ভালো লেগে গেছে। বেশ লম্বা, স্মার্ট, দেখতেও ভালো। শুনেছে, ভালো ক্রিকেট-প্লেয়ার, চাকরি শুরু করার পর এখন খেলে না, তবু খেলত তো ক্রিকেট, ওর পছন্দসই খেলা, খেলা থাকলে সারাদিন টিভি-র সামনে, তখন আর সিনেমা, সিরিয়াল কিছু ভাল লাগে না। আশীর্বাদের অনুষ্ঠান হবার পর মা-বাবার মত নিয়ে ওরা একদিন রেস্টুরেণ্টে বসে অনেক সময় কাটিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে। দাদা অবশ্য ছিল দূরের টেবিলে, মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছিল, তবু কোনো অসুবিধে হয়নি। চাকরি করতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিল, করবে বলেছে। অনীশ জানিয়েছে, ওর আপত্তি নেই। বরং অফিসের পর কোথাও গিয়ে, ভাবতেই তনিমার ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অনুভূতি। শ্বশুর-শাশুড়ি খুব একটা বুড়ো নয়। অনীশ বলেছে, ওর মা একা অনেক কিছু সামলাতে পারে, খুব ভালো রান্না করে, কতরকম, সব দিকে খেয়াল আছে, শুধু একটু খুশি রাখতে হবে। ওর বাবা সাতে-পাঁচে থাকে না। মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়। শুনলেই খুশি। তনিমা ভাবে, নিজের মা-বাবা ওকে নিয়ে কত খুশি, ওরাও নিশ্চই সুখী থাকবে। নতুন বাড়ি, নতুন পরিবেশ, নতুন জীবন, শুধু মা-বাবার কাছ থেকে দূরে, তবু খুব দূরে না, মন খারাপ করলে যখন তখনই চলে যেতে পারবে। ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতরে আলোড়িত হয়ে ওঠে তনিমা।

কিন্তু বিকাশ কোনো স্বপ্ন দ্যাখে না। তিরিশ বছর আগের বিকাশ, তার স্বপ্নধূসর চোখ নিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে। সেইসব আশ্চর্য স্মৃতিরা, অপার্থিব মনে হয় যেন। স্পষ্ট নয়, আবছা-আবছা কিছু স্মৃতি।—কোনো কোনো রাত কথার মুগ্ধতায় কেটে যেত পুরোটাই। শুধুই কথা। কী কথা বলত তখন! কিছুই মনে পড়ে না, গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই নয়, তাহলে মনে থাকত। যেটুকু আভাস, নিজের কথা বলত বেশি, মাধুরীর কাছেও হয়ত জানতে চাইত ওর জীবনের কথা, ভালো-লাগার কথা। সেসব কথা হারিয়ে গেছে সময়ের পলিতে। একদিন বৌদি মুচকি হেসে বিকাশকে বলেছিল, কী এত কথা বল তোমরা? সারারাত। এত কথা বলে নাকি, এসব কথা পরে আর থাকে না। হারিয়ে যায়। কথার এত অপচয় করতে নেই। সঞ্চয় করো, নাহলে কথা খুঁজে পাবে না আর। লজ্জা পেয়েছিল বিকাশ। তবু বিছানায় শুয়ে মাধুরীকে পেলেই কথার স্রোত বয়ে যেত। কথার ভেতর দিয়ে হয়ত স্বপ্নই প্রসারিত হত।

বৌদি ঠিকই বলেছিল। সেসব রাতের নিঃশব্দ পৃথিবীতে বৌদির কানে যে কথাগুলি

পৌঁছে গিয়েছিল, সত্যিই তো, এসব কথা পরে আর কোনোদিন খুঁজে পায় নি। সেই স্বপ্ন কীভাবে এরপর, কবে আছড়ে পড়ে বাস্তবের রুক্ষভূমিতে নিশ্চিহ্ন হল, মনে পড়ে না। অপচয়ের গ্লানি আজও তার বুকে ভার হয়ে আছে।

এখনো অম্লান আরো এক দুঃসহ স্মৃতি। একদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলায় মা-কে দেখতে পেল না। মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে বলল, তোমার মা কোথায় গেছে, আমি কী করে বলব? আমায় বলে যায়নি, যাবার সময় অনেক বাজে কথা বলে গেছেন, আমারও সহ্যের সীমা আছে।

পরদিন খোঁজ করে কাকার বাড়িতে পাওয়া গেল। ওবাড়ির সবাই বিকাশের ওপর অসন্তুষ্ট। মা বললেন, বৌ-কে নিয়ে তুই থাক, আমার শখ মিটেছে। অনেক রাগারাগি হল, কথা-কাটাকাটি, চোখের জল। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে বিকাশ বলেছিল, নিজের ঘরের বৌ-কে নিজে শাসন করতে পার না, আমার ওপর দোষ চাপাও কেন? আমি সারাদিন বাড়িতে থাকি?

মেয়ের যা মুখ আমি সহ্য করতে পারব না। এখানেই ভালো আছি, সম্মান আছে আমার।

জোর করেই মা-কে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল বিকাশ, তবু মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। এরপরও তার সঙ্গে মাধুরীর সম্পর্ক স্বাভাবিক হল না কেন, বিকাশ এ নিয়ে অনেক ভেবেছে, কোনো উত্তর পায় নি।

বিকাশ তাই আর স্বপ্ন দ্যাখে না। সংসারের গন্ডির বাইরেই তার মানসিক অবস্থান। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে, স্বপ্ন অবধারিত স্বপ্নভঙ্গের কাছে পৌঁছে যায়, অবশেষে এরা যৌথভাবে কোনো রসায়নক্রিয়ায় নতুন কোনো স্বপ্ন অথবা স্বপ্নমালার জন্ম দেয় কিনা বিকাশ মনে করতে পারছে না। দেয় হয়ত, না হলে সংসার অন্য বিন্যাসে গিয়েও টিকে থাকে কীভাবে!

অনীশের স্বপ্নও কি একই পথে যাচ্ছে! বৌদির মতো কেউ ওকে বারণ করলে শুনবে? মনে হয় না। কোথায় কোথায় বৌ-কে নিয়ে বেড়াতে যাবে, শুনেছে বিকাশ। ঘরের ভেতর স্বপ্ন হয়ত ছড়াচ্ছে না, পাহাড়ে বা সমুদ্রে গিয়ে প্রসারণ ঘটাতে চায়। একজন নতুন মানুষের সঙ্গে যুক্ত হলে, সে যদি খুবই ঘনিষ্ঠ, স্বপ্নের উৎসারণ হতে পারে, তা কি মানুষ ধারণ করতে পারে? নাকি নিজেই প্রবাহে মিশে যায়, মিশে গিয়ে—

তবু যদি স্বপ্ন দেখে অনীশ, দেখুক, যদি অন্য বিন্যাসে যেতে পারে। একজন নতুন মানুষকে পেয়ে তার মনের ভেতর পৌঁছে যাবার জন্যে, —গভীর, আরো গভীরে, কত গভীরে যাওয়া যায়! কতটুকুই বা আবিষ্কার হয়, তবু উপায় নেই, মনের রহস্যের ভেতরে যেতেই হয় তাকে, একসময় হারিয়ে গিয়ে আবিষ্কারের কথাই ভুলে যেতে হয়। অনীশ তবু স্বপ্ন দেখুক, সেই স্বপ্ন যতদুর নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যাক।

যে মেয়েটি এ বাড়িতে এল, সে-ও নিশ্চয়ই অনেক স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অনীশের বিয়ের আগে সংসার যে বিন্যাসে ছিল, ভালো-মন্দ যাই হোক, নতুন মেয়েটি অর্থাৎ তনিমা আসার পর নতুন বিন্যাসে যাবে, তাতে অন্য ভালো-মন্দ, এটা স্বাভাবিক। বিকাশ সেটা জানে। নিজে স্বপ্ন না দেখলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, সংসার-স্থাপত্যের সেই নতুন বিন্যাসে হুড়মুড় করে অনেক স্বপ্নই এসে পড়ছে; কিন্তু বুঝতে পারছে না, স্বপ্নেরা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থেকেও কীভাবে পারস্পরিকতা বজায় রাখবে, অথবা কোন্ রসায়নক্রিয়া সেখানে কাজ করবে।

এ বড় জটিল অঙ্ক, জটিল বিন্যাস। বিকাশের সে অর্থে খুব বেশি কৌতূহল নেই, কিন্তু আশঙ্কা আছে। কিন্তু এদের মুখোমুখি দর্শক হয়েই সে থাকতে চায়। দেখতে চায়, কীভাবে সেই পুরনো বিন্যাস তার মাত্রা বদল করছে।

আশঙ্কা এই জন্যে যে, চারপাশের নানা ঘটনা ইতিমধ্যেই তাকে উদ্বিগ্ন করেছে। কোনো কোনো বন্ধু, যারা সংসারে নতুন স্থাপত্যের জন্যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, বাস্তবের ঘর্ষণে তা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্বপ্নভঙ্গ শুধু নয়, স্বপ্নের সঙ্গে রসায়ন ঘটাতে গিয়ে কোথাও কোথাও বিস্ফোরণও ঘটেছে। পুরনো স্থাপত্যে পড়ে আছে শুধুই ধবংসাবশেষ। কীভাবে তা পুনরুদ্ধার হবে, এই ভাবনায় হয়রান হয়ে যাচ্ছে তারা।

কিছু কৌতূহলও আছে যেমন, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রসায়নে মাধুরীর যে অভিজ্ঞতা, বিস্মৃতির পাহাড় ভেদ করে এখন সেখানে পৌঁছেছে কিনা। যদি পৌঁছে থাকে, এরপরও কোন্ স্বপ্নে সে মশগুল, জানতে ইচ্ছে করে। দৃশ্যত যদিও মাধুরী নিজেকে স্বপ্নের ভেতরে নিয়ে গেছে অবলীলায়, উদ্দীপ্তই মনে হচ্ছে ওকে, চোখে-মুখে নেতৃত্বের গভীর বাসনা, কিন্তু রসায়নের পর নতুন কোন্ স্বপ্ন বা স্বপ্নমালায় নিজেকে জাগিয়ে রাখবে, জানার জন্যে গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে বিকাশ।

মাধুরী মাঝে মাঝে সংসারের খবর নিয়ে বিকাশের কাছে আসে। কে কেমন আছে, কে কতটা পালটে যাচ্ছে। হিসেব মেলাবার জন্য বিকাশ নতুন নতুন অঙ্ক কষে। কোনো প্রতিফলন না পেয়ে মাধুরী উঠে চলে যায়।

অনীশকে দূর থেকেই দ্যাখে বিকাশ। খুব প্রয়োজন না হলে অনীশও ওর কাছে আসে না। এলে প্রয়োজনের কথা বলে শুধু, এটা করতে হবে, ওটা অনেকদিন করা হয় না। আমার তো দেখছ, একদম সময় নেই। তুমি না করে দিলে—বিকাশ উৎসাহ দেখায় না, সম্ভব হলে করে, না হলে করে না।

তনিমাও এসেছে দু-একবার। হাসিমুখে চা নিয়ে হয়ত এল, কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে, বিকাশকে বলতেই হয়, কেমন আছ মা? তৎক্ষণাৎ তনিমা বলে, আমরা তো ঠিকই আছি। তুমি কেমন আছ? বাড়ি থেকে একদম বেরোও না, এটা ঠিক না। একা-একা থাক, বন্ধুদের তো বলতে পার, এসে তোমার সঙ্গে গল্প করবে।

মেয়েটি কি এখনো স্বপ্ন দ্যাখে? বিকাশকেও দেখাতে চায় নাকি? কেমন ধাঁধার ভেতরে বিকাশকে ঠেলে দিচ্ছে। সেদিকে না গিয়ে বলল, আমার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ো হয়েছি, আর কদিন। তোমাদের জন্যে সামনেটা পড়ে আছে, সাবধানে থেকো, আনন্দে থেকো।

চা খাওয়া শেষ হলে কাপটা নিয়ে যাবার সময় বলে, ওপরে চলে এসো, টিভি-তে কত মজার মজার প্রোগ্রাম হয়। গানও শুনতে পার, অনেক ভালো ভালো রেকর্ড কিনেছি।

বিকাশ হাসে কিন্তু ফাঁদে পা দেয় না। বলে, তোমরা ভালো থাকলেই আমার আনন্দ। আমার জন্য ভেবো না। তনিমা আর কিছু বলে না, চায়ের কাপ নিয়ে চলে যায়।

নিজের পৃথিবীতে বসে বিকাশ ওদের পৃথিবীকে ঠিক বুঝতে পারে না। কেমন আছে ওদের সুখ-দুঃখ, কেমন ওদের পারস্পরিক। সবাই খুব ব্যস্ত, আসে যায়, কখনো বসে টিভি দেখে, গান শোনে, তাতে তো অভ্যন্তর বোঝা যায় না। প্রত্যেকের স্বপ্নগুলো শুড়মুড় করে

এসে বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে স্বপ্নভঙ্গ কিনা অথবা নতুন নতুন স্বপ্নের ভেতর চলে যাচ্ছে কিনা; অথবা অনীশই যখন চালক, সংসারের উড়োজাহাজটা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা, ঠিকমতো কায়দায় বাস্তবের মাটিতে নামাতে পেরেছে কিনা, এসব তথ্য জানার কৌতূহল থাকলেও বিকাশের কাছে সরাসরি আসে না। এদিকে, বিকাশ বা মাধুরীর তো নিয়ন্ত্রণকক্ষে থাকার কথা, যেখান থেকে সংকেত পাঠিয়ে অনীশকে প্রয়োজনমতো হদিস দিতে পারে শুধু, কিন্তু অনীশ সেই হদিস নিচ্ছে কিনা, নিয়ন্ত্রণ গ্রাহ্য করছে কিনা, এ-সবও বিকাশ ঠিকমতো জানতে পারছে না। যদিও এটা বুঝেছে, বিকাশের কাছে অনীশ কোনো হদিস চায় না, কিন্তু মাধুরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রাহ্য করছে কিনা সে সংবাদও তার কাছে নেই। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় অর্থাৎ অনীশ আদৌ বাস্তবে ওর উড়োজাহাজ নামিয়েছে কিনা, নাকি এখনো আকাশেই উড়ছে, এ জরুরি তথ্যও বিকাশের জানা নেই। আকাশ অনন্ত হতে পারে, উড়ানও, জ্বালানি তো অনন্ত নয়, মাটিতে নেমে মাঝে মাঝে জ্বালানি ভরে নিতে হয় নতুন করে স্বপ্নের উড়ানের জন্য, অবশ্য বাস্তবে যদি জ্বালানি আদৌ মজুত থাকে, স্বপ্নের উড়োজাহাজ মাটিতে নামাতে গিয়ে, যথেষ্ট মুন্সিয়ানা না থাকলে জাহাজ ভেঙ্গে যেতে পারে, এমনকী বিস্ফোরণও ঘটে যেতে পারে। অনীশ এসব ঠিকঠাক জানে কিনা, ভাবতে ভাবতে বিকাশের উদ্বেগ বেড়ে যায়।

একদিন রীতিমতো ক্ষোভ সঙ্গে নিয়ে মাধুরী এল। একটানা বলে যাচ্ছে—বৌ চাকরি করবে এমন তো কথা ছিল না। দুজনেই সকালে বেরিয়ে যায়, তারপর সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে রাত করে ফেরে। সকালে রান্না করে খাবার সাজিয়ে দেব, বিকেলে খাবার নিয়ে বসে থাকব, দয়া করে খাবে, উদ্ধার করবে আমায়। সারাজীবন আমাকেই হাঁড়ি ঠেলতে হবে? এজন্যে ছেলের বিয়ে দিলাম!

বিকাশ বুঝল, মাধুরী আর নিয়ন্ত্রণকক্ষে নেই। বলল, তনিমা চাকরি করবে এমন কথা হয়ত ছিল না, চাকরি করবে না, এমন কথাও কি ছিল? তোমার কথা ওরা শুনছে না? ওদের সঙ্গে কথা বলো।

অনীশকে বলেছি, ওর উত্তর শুনলে গা জ্বালা করে। বলে কিনা, করুক না চাকরি, সারাদিন বাড়িতে বসে সময় নষ্ট করবে, দুজনে মিলে ঝগড়া করবে শুধু।—এত কষ্ট করে মানুষ করে এই তার ফল? বৌ-য়ের কথায় উঠছে বসছে, আমার কষ্ট বুঝবে না?

বিকাশের কিছু বলার নেই। মাধুরীকে পরামর্শ দিল, ওরা নিয়ন্ত্রণ চায় না বুঝতে পারছ, নিজের কথা নিজেকেই ভাবতে হবে। বরং রান্নার লোক দ্যাখ, কাজের লোক তো আছেই। ওরা ওদেরটা বুঝে নিক।

মাধুরী খুশি হল না। বোঝা গেল, ওর স্বপ্নভঙ্গের সুরাহা হয় নি।

দিন কয় পর তনিমা একটা সুন্দর হাসি নিয়ে বিকাশকে প্রণাম করল, হাতে দুটো প্যাকেট। বলল, আজ প্রথম মাইনে পেলাম। তোমার জন্য কাজ-করা পাঞ্জাবি আর পাজামা কিনেছি, আর কেড্‌স জুতো। বুঝতেই পারছ, রোজ সকালে হাঁটতে বেরোবে, বিকেলে পাজামা পাঞ্জাবি পরে বন্ধুদের বাড়ি গল্প করতে যাবে।

বিকাশ ওকে আশীর্বাদ করে বলল, মা-র জন্য কিছু এনেছ তো?

তনিমা আরো গাঢ় হেসে, এনেছি। মা খুশি হয়েছে।

বিকাশ বুঝল, উড়ানের ভেতরেই আছে। মাটিতে নামার দরকার হয়নি এখনো।

এরও কয়েক মাস পরে মাধুরী খবর দিল, তনিমার বাচ্চা হবে।

এতো ভালো খবর, ওদের অভিনন্দন জানিয়েছ?

অভিনন্দন! দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াও, টের পাও না। বাচ্চা হওয়া, বাচ্চা মানুষ করা চাট্টিখানি কথা? এবার যদি চাকরিটা ছাড়ে।

তনিমা এখনো অফিসে যায় শুনে মাধুরীর উদ্বেগে বিকাশকে সাড়া দিতে হল। অফিস থেকে অনীশ ফিরলে নিজের ঘরে ডাকল। — এই অবস্থায় তনিমা অফিসে না গেলেই পারে।

অনীশ বলল, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। চার্টার্ড বাসে যাওয়া-আসা করছে। বাসের অন্যরা ওকে খুব হেল্প করে। কদিন বাদে অফিস থেকে ম্যাটার্নিটি লীভ পাবে, তখন ও বাপের বাড়ি চলে যাবে। বাচ্চা বড় হবার পর এ বাড়িতে নিয়ে আসব।

বিকাশ তবু উপদেশ দিয়েছে।—সাবধানে থাকে যেন। জানিস তো বাচ্চা মানুষ করা অনেক ঝামেলা। নানারকম ভ্যাকসিন চালু হয়েছে আজকাল। ঠিকঠাক খবর রেখে যা করার সময়মতো করবি। কত রকমের সমস্যা হয়, বড় না হওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

অনীশ নির্বিকার হেসে বলল, জানি বাবা। আমি অত দুশ্চিন্তা করি না। তোমরা তো আছ, আমার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ।

মাধুরী বলল, শুনলে ছেলের কথা!

বিকাশ সবই শুনেছে। মনে মনে তারিফ করল ছেলের—নিপুণ পাইলট, উড়োজাহাজ কী করে মাটিতে নামাতে হয়, কৌশলটা ভালোই রপ্ত করেছে। কন্ট্রোল টাওয়ারের করণীয়গুলিও ঠিকঠাক জানে। সময়মতো জ্বালানি ভরে নিয়ে নতুন উড়ানে যেতে চাইছে।

নিজের অতীত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হদিস পায় না বিকাশ, কীভাবে তারই প্রসৃতি শিখে গেল, কেমন করে স্বপ্ন অটুট রাখতে হয়, বাস্তবের মাটিতে এসে কোনো ঘর্ষণ ছাড়াই নতুন নতুন স্বপ্নের দিকে আবার উড়ে যেতে হয়, কিভাবে যে স্বপ্নেরা ক্রমাগত আরো আরো স্বপ্নের জন্ম দিয়ে যায়, —এমন রহস্যের মুখোমুখি বিকাশ, ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

# পিকনিক

পুরনো বন্ধুরা অনেকবছর পর একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। উদ্যোগটা সমরেশের। সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছে, দ্যাখ, কদিন আর বাঁচব! সংসার ছেলে-বৌ নিয়ে অনেক হল। এবার থেকে মাঝে মাঝে পুরনো স্মৃতি নিয়ে আড্ডা মারব আমরা। —আমাদের ছেলেবেলা, যৌবনকাল। শুরু করা যাক এখুনি। কোলাঘাটে একটা বাংলো জোগাড় করেছি, সবাই মিলে একদিন পিকনিক করি আয়। ট্রেনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে, স্মৃতিচারণ সেখান থেকেই শুরু। ওখানে পৌঁছে, বাংলোর সামনেই নদী। ক্যাটারার জোগাড় করে নেব, রান্নাবান্নার ঝামেলা থাকবে না। সারাদিন নদীর ধারে আড্ডা, তারপর ট্রেনে ফেরার সময়ও আড্ডা। এভাবেই হারিয়ে যাওয়া নিজেদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

সবাই উৎসাহিত, এক কথায় রাজি। পিকনিকের দিন ঠিক হল। বন্ধুরা দশজন, স্ত্রীদের নিয়ে কুড়ি। ছেলেমেয়েরা যে যার নিজের নিজের সংসার নিয়ে, এর মধ্যে ওদের টানা হবে না। আমরা, শুধুই আমরা, আর আমাদের অতীত স্মৃতি।

হাওড়া স্টেশনে শেষ পর্যন্ত আটজন এল, সঙ্গে ছ-জনের স্ত্রী। বাকিরা কোনো কারণে আটকে পড়েছে।

সমরেশ, সমরেশের স্ত্রী অনিমা, অমল-জ্যোৎস্না, সুবীর-অতসী, প্রবীর-মাধুরী, সুব্রত-মনীষা, পরিমল-চন্দনা, বিকাশ ও অরিন্দম। পাঁশকুড়া লোকাল দাঁড়িয়েছিল, দেড় ঘণ্টার যাত্রাপথ। ছুটির দিন, ভিড় নেই, এক কামরাতেই জায়গা পেয়েছে সবাই।

ট্রেন ছাড়তে সবাই নড়ে গেল, কথা শুরু হয়েছে ওদের।

অমল সুবীরকে বলল, তিরিশ বছর পর তোকে দেখছি, তাই না! ধরনটা একই, তাই চেনা যাচ্ছে। বুড়ো হয়েছিস, এটাই তফাৎ।

সুবীর হাসল! তোর কাঠামো কিন্তু অনেক বদলেছে। ছিলি খচ্চর, হয়েছিস ঘোড়া। তোর হাসিই তোকে চেনাল।

দু'জনে কামরা কাঁপিয়ে কিছুক্ষণ হাসল।

বিকাশ হঠাৎ উঠে এসে সমরেশের হাতে হাত মেলাল। তোকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! তোর উদ্যোগেই আমরা পুরনো দিনগুলো ফিরে পাচ্ছি।

তা পাচ্ছিস, কিন্তু গিন্নিকে বঞ্চিত করলি কেন?

আর বলিস না, একেবারে গেঁতো, বেরোতে চায় না একদম। কত করে বললাম। ছেলে-অন্ত প্রাণ, ছেলে একা থাকবে, তাই আসবে না।

ছেলেকেও নিয়ে আসা যেত।

ও বাবা, এই জেনারেশন সেরকম না কী। আমাদের সবকিছু ওরা এড়িয়ে চলে। বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কিছু জানে না।

অরিন্দম একা কেন?

গিন্নির ছোট বোন এসেছে, ওকে একা ফেলে—

ওকেও নিয়ে এলে হত।

বলেছিলাম। বলল, চিনি না জানি না, গিয়ে বোকা বনব শুধু শুধু।

এদিকে মাধুরী মনীষাকে নিয়ে পড়েছে। তোমার কথা অনেক শুনেছি। সবাই বলাবলি করত, ডাকসাইটে সুন্দরী, সুব্রতবাবু তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।

সুন্দরী কেমন দেখতেই পাচ্ছ। চুল অর্ধেক উঠে গেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠি। তোমার কথাও বলাবলি করত সবাই। দারুণ কবিতা লেখ, কত জায়গায় ছাপা হয়েছে তোমার কবিতা।

মাধুরী হাসল। তা যা বলেছ। প্রবীরকে জিজ্ঞেস কর, উনুনের আঁচে সব কবিতা আকাশে এখন মেঘ। এই মেঘ কোনোদিন বৃষ্টি নামায়নি। প্রবীর যদিও কবিতার কিছুই বোঝে না।

যারা শুনল, ওর কথায় হাততালি দিয়ে, —এই তো মেঘ বৃষ্টি নামিয়েছে।

মাধুরী বলল, যদি তাই হয়, সব কৃতিত্ব সমরেশবাবুর।

প্রবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তোমরা যা বোঝার বোঝ, আমি তো চল্লিশ বছর ধরে ওর কবিতা কিছুই বুঝলাম না। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—। সুব্রত হয়তো মনীষাকে নিয়ে কিছু কবিতা লিখে থাকবে।

মনীষাকে নিয়ে কবিতা! আমি বাবা হিসেবপত্তর বুঝি, অ্যাকাউন্টসের লোক। সংসারের অডিট করতে গিয়ে দেখি আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। হিসেব করতে করতেই গলদঘর্ম আমি।

মনীষা চলকে উঠে, হিসেব মেলানোর দরকার কী? একটাই জীবন, সাজগোজ, খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ করেই কাটাব, ব্যস। কী বল মাধুরী?

একদম ঠিক। আমার কর্তার সঙ্গে বেশ মিল আছে তোমার।

প্রবীর হেসে বলল, হিসেব টিসেব আমি বুঝি না বাবা। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কাজ বুঝি। ঐ হিসেবী লোকদের সঙ্গে আমাদের আড়াআড়ি লেগেই আছে।

ওদিকে জ্যোৎস্না আর অতসী নিজেরা নিজেরা। জ্যোৎস্না জিজ্ঞেস করছে, তোমার তো এক মেয়ে। কী করছে?

বিয়ে হয়ে গেছে সাত বছর হল। ছেলে বড়, এবছর ওর বিয়ে দেব ভাবছি।

ওমা, খবরও পেলুম না!

পাবে কী করে, কেউ কি কারো খবর রাখি?

দ্যাখ অতসী, আগে থেকে বলে রাখি। ছেলের বিয়ে দিয়ে প্রথমেই আলাদা করে দেবে, পারলে অন্য ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর ওরা পর হয়ে যায়। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। তুমিই ভাল করেছ, এক ছেলে হলে অনেক যন্ত্রণা। মেয়েরা অনেক ভাল।

অতসী হাসছে। তোমার ছেলে কী করে এখন?

কম্প্যুটর নিয়ে কী সব করে। বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবি, চলে গেলেই মঙ্গল।

সে কী কথা! একা-একা তুমি থাকবে কী করে? আমার ছেলে অধ্যাপক, ও একটু অন্যরকম।

অন্যরকম কিছু না, রকম সব এক। বিয়ের পর টের পাবে, সাবধান করে দিলাম।

মাধুরী, মনীষাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মনীষা বলল, না জ্যোৎস্না, আমার তো মনে হয় এক-এক জনের এক-এক রকম। আমার মেয়ে দ্যাখ নিজে পছন্দ করে বিয়ে করল। ওমা, তারপরই প্রেম উধাও। কী সব করে আজকাল নিজেদের মধ্যে!

মাধুরী হেসে বলল, কী করে গো?

চুলোচুলি করে বোধহয়। মেয়েটা ভাল চাকরি করে তাই সাহস বেশি, আমার কাছে প্রায়ই এসে থাকে। বলে, এখানেই শান্তিতে থাকি।

মাধুরীর কণ্ঠে প্রায় স্বগতোক্তি, — আমার কেসটা বোধহয় তোমাদের থেকে ভাল। ছেলের বাঙ্গালোরে চাকরি, বৌয়ের কলকাতা। বৌ আমার কাছেই থাকে। ছুটিতে ছেলে আসে, দুজনে একসঙ্গে কোথায় কোথায় যায়। এখনও পর্যন্ত সম্পর্ক ভালই মনে হয়।

সমরেশ লক্ষ্য করল, একটা পরিষ্কার আকাশ ধীরে ধীরে মেঘলা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই দমকা হাওয়া তুলে, কে কে ঝালমুড়ি খাবে বল। এই ঝালমুড়িঅলা, সবাইকে এক ঠোঙা করে দাও। কেউ পয়সা দেবে না কিন্তু, এক হাতেই খরচ হোক, পরে হিসেব করে চাঁদা নেওয়া যাবে। আরে, পরিমল তো চন্দনা পাখিকে নিয়ে কপোত-কপোতীর মতো, এদিকে আমরাও তো আছি হে, আমাদের দিকে তোমরা একটু তাকাও।

নানা ভঙ্গির হাসিতে কামরার ভেতরে আকাশটা ঝকঝকে হয়ে উঠল।

পরিমল মৃদু মৃদু হাসছে। আমি সব দেখছি শুনছি, এনজয় করছি। একজন তো শ্রোতা থাকা দরকার।

মাধুরী গম্ভীর হওয়ার ভান করল। এই ধরনের লোক কিন্তু সাংঘাতিক। চন্দনা এদিকে চলে এসো, সুব্রতবাবু আপনি একটু সরে বসুন তো। চন্দনা হাসতে হাসতে মনীষার পাশে এসে, এবার সমরেশবাবুর খবর নিই আমরা। আপনার যা মুড দেখছি, মনে হয় দারুণ জমিয়ে সংসার করেন।

অণিমা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, মনীষার কথা শুনে মুখিয়ে উঠল। ওর আবার সংসার! কে বলেছিল ওকে বেশি বয়েসে বিয়ে করতে? তোমাদের দেখছি ঝাড়া গা-হাত-পা, আমার ছেলে সবে নাইনে পড়ছে। ওর আর কী। সারাদিন এসব নিয়েই আছে। ছেলেকে দ্যাখে? ওকে বোনের বাড়িতে রেখে তবে আসতে হল।

সমরেশের চেষ্টা সফল হচ্ছে না। এরা সবাই, এমন কি অণিমাও, নিজের নিজের সংসার সঙ্গে নিয়ে এসে এর-ওর সঙ্গে জুড়ে, যে-যার মতো তালগোল পাকাচ্ছে।

অণিমার কথায় সমরেশ দমল না। আমি ভেবে আর কী করব? ছেলেকে ঈশ্বরই দেখবেন। তিনি আছেন কী করতে? বরং চা খাওয়া যাক, এই চা-অলা, এক কাপ করে চা লাগাও। গরম আছে তো?

সবাই উৎসাহিত, এমনকী অণিমাও হাসবার চেষ্টা করল।

সবাই গল্পে এমন মজে আছে, কেউ খেয়াল করেনি। চা খেতে খেতে হঠাৎ বাইরে তাকিয়েই পরিমল চমকে উঠল। আরে কোলাঘাট এসে গেছে। চটপট উঠে পড়, নামতে হবে। হুড়মুড় করে সবাই অগোছালা অবস্থাতেই ট্রেন থেকে নামল।

সমরেল খেয়াল করেনি, তাই একটু বিব্রত। বলল, এজন্যই পরিমলের মতো লোক থাকা দরকার। বেশি কথা না বলে চুপচাপ সবকিছু দেখবে শুনবে।

মাধুরী হেসে, ঠিক বলেছেন। আমাদের মধ্যে পরিমলবাবুই একমাত্র দর্শক, আমরা শুধু দৃশ্য।

বাংলো সবার পছন্দ হল, সবাই উচ্ছ্বসিত। সামান্য দূরে শান্ত রূপনারায়ণের চওড়া বুক, তাই দেখে ওরা হৈ চৈ করে উঠল। তারপরই একে একে বাংলোর ভেতরে। ক্যাটারারের লোক আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছে। সমরেশকে দেখে ওদের একজন বলল, আর আধঘণ্টার মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে। আপনারা হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসুন, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।

রান্নাঘর, খাওয়ার টেবিল, চেয়ার, বাথরুম ইত্যাদি সরেজমিনে দেখে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় গেল সমরেশ। সবাইকে ইতিমধ্যে চা দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ বসে চা খেতে খেতেই সমরেশ বুঝে গেল, ট্রেনের কামরায় বসে যে সংসারগুলি জোড়বার চেষ্টা হচ্ছিল, এখানে সেই সংসারগুলি জমাট বেঁধে প্রায় একটা মহাসংসারে পরিণত হয়েছে।

পাশাপাশি চেয়ারে গোল হয়ে বসেছে জ্যোৎস্না, অতসী, মাধুরী, মনীষা, চন্দনা ও অণিমা। অরিন্দম, বিকাশ একধারে, পরিমল প্রায় একা। অমল, সুবীর, প্রবীর, সুব্রত ছড়িয়ে ছিটিয়ে কখনো হাঁটছে কখনো বসছে।

মাধুরী অতসীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার অধ্যাপক ছেলে কী বিষয় পড়ায় গো?

ইতিহাস।

তবু ভাল, দর্শন নয়। দর্শনের লোকগুলো বড় গোমড়ামুখো। ছেলের জন্য সুন্দরী বৌ এনো কিন্তু, ইতিহাসে সুন্দরীদের কথাই থাকে। দেখবে ওদের জমবে ভাল। নিজের কিছু পছন্দ আছে নাকি?

হতে পারে। কিন্তু বিয়েতে মন নেই, বলে, সে তোমাদের ভাবতে হবে না।

তাহলে তো নির্ঘাত ও নিজেই ভাবছে।

মনীষা বলল, ওসব প্রেমট্রেমের ব্যাপার একদম মানবে না। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

মাধুরী বাধা দিল, তা কেন? প্রেমের মর্ম কেউই বোঝে না, এমন ভাবছ কেন? আমরা তো মাঝে মাঝেই ছেলের কাছে বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকি, বেশ সুখী সুখী ভাব ওদের। হয়তো আলাদা থাকে বলেই—

অমল দূর থেকে কথাগুলো শুনছিল। চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বলল, আসল কথা হল, মেয়েদের আঁচল বড় ছোট। ছেলেরা কতদিন তাতে আটকে থাকবে বল। ওদের মতো ওদের থাকতে দিলে গোলমাল হয় না।

মাধুরী বলল, আঁচলটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না বলল, অমলের ঐ এক কথা! কে আঁচলে আটকে রেখেছে! বিদেশ যাক না, কে বারণ করবে? আসলে আর একটা আঁচল পেলেই পাল্টে যায় ওরা।

মনীষা হাসতে হাসতে বলল, জ্যোৎস্নার শাড়ির আঁচলটা তো বেশ সুন্দর, বৌ-য়ের আঁচলটা তার চেয়েও সুন্দর নাকি?

মাধুরী অণিমাকে বলল, তোমার তো অভিজ্ঞতা কম, এখন থেকে শিখে নাও।

অনিমা মানতে চাইল না। বাবারাই সব গোলমাল করে। আদর দিয়ে ও-ই তো মাথা খাচ্ছে।

জ্যোৎস্না হঠাৎ বলল, বিকাশবাবু ছেলের বিয়ে দেবেন না?

দেওয়ার তো সময় হল।

মনীষা চটপট বলে উঠল, এখনই আঁচলটা ছড়াতে বলুন, নইলে—

কথাগুলো একপেশে হয়ে যাচ্ছে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টাল মাধুরী। অরিন্দমবাবু স্ত্রীকে আনতে পারলেন না, জোর করে শালীকে আনতে পারলে দেখতেন ঠিক আসত। আপনাকে একা ছাড়তে ভরসা পেত না।

অরিন্দম হাসল, না না, সে ভরসা আছে।

চায়ের কাপটা একপাশে রেখে সমরেশ এবার উঠে দাঁড়াল। না, এরা কেউ সংসারের বাইরে যেতে পারছে না।—চল, নদীর পাড়ে কে কে যাবে? এখনও এক ঘণ্টা সময় হাতে, রান্না হতে দেরি আছে।

কেউ চেয়ার ছেড়ে নড়ল না। পরিমল উঠে দাঁড়াল, চল আমি যাব।

বাঃ এই তো। আর কেউ? মাধুরী চলুন না, ওখানে দু'একটা কবিতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এখানে তো সবকিছুই কবিতা, ওখানে আর নতুন কী পাব? অগত্যা সমরেশ আর পরিমল নদীর ধারে গেল।

পরিমল এখানে এসে আরো একা। নদীর চওড়া বুক, সেই বুকে ভেসে যাওয়া নৌকাগুলি দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে আছে। সমরেশ বলল, পরিমল কি কবিতা লেখ নাকি? একেবারে কবির মত দ্যাখাচ্ছে তোমাকে।

না না, ওসব কিছু না। এই বেশ ভাল লাগে।

ওদিকে দ্যাখ, এত পবিশ্রম করে টেনেটুনে সবাইকে নিয়ে এলাম। দেখবে, শুনবে। তা না, সেই একই গপ্পো চলছে।

পরিমল তবু গম্ভীর। এসবের ভেতরে থাকতেই লোকেরা ভালবাসে। মন্দ কী, ওরা ওদের মতো।

আমার তো মনে হয়, ঐ আঁচলটাই ওদের সমস্যা।

পরিমল হাসল। মন্দ বলনি তুমি।

খাবার সাজানো হয়েছে টেবিলে। সবাই একে একে হাতমুখ ধুয়ে চেয়ারগুলি দখল করছে। আসতে আসতে, বসতে বসতে এবং খেতে খেতেও একই গল্প, একই কথা। সংসারের অন্দরমহলগুলি আরো কিছুটা উন্মুক্ত হচ্ছে এইমাত্র।

খাওয়ার পর যে যেখানে পারল বসে, কাৎ হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রাম নিতে নিতেও কথার পর কথা। সমরেশ আর শুনতে চাইছে না, বারান্দায় চলে এল। কিছুটা দূরে আগে থেকেই পরিমল বসে আছে। সমরেশকে দেখে পরিমল বলল, বাংলোটা ভাল জোগাড় করেছ তো। মাঝে মাঝে দু-একদিন থাকা যায়, দারুণ লোকেশন।

থাকা নিশ্চয়ই যায়, ব্যবস্থাও করা যায়। তবে একা-একা, দল এলে সেই লোকেশন আর থাকবে না।

তা কেন, ভিড়ের ভেতরেও তো একা থাকা যায়।

সমরেশ এরকম ভাবেনি কখনো। আর কথা না বলে চুপ করে বসে থাকল অনেকক্ষণ।

কত সময় পার হয়েছে জানে না। একসময় পেছনে ভিড় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভেতর থেকে মাধুরীই বলে উঠল, কী ব্যাপার বলুন তো, দুজনে মন খারাপ করে বসে আছেন। বাড়ি ফিরব না আমরা?

পরিমলের ভাবান্তর হয়নি, সামান্য হাসল। মন খারাপ শব্দটা শুনে সমরেশ বিভ্রান্ত। ওর মন এই মুহূর্তে ভাল না খারাপ ঠাহর করতে না পেরে বলল, হ্যাঁ চলুন, আর দেরি করে কী হবে। চা খেয়েছেন তো?

হ্যাঁ দিচ্ছে, আমরাও গুছিয়ে নিচ্ছি।

হৈ হৈ করে আবার স্টেশনে আসা, ট্রেনের একই কামরায় সবার উঠে পড়া, মেয়েরা পাশাপাশি, ছেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে, এবং সেই পুরনো গল্পের প্রত্যাবর্তন।

গল্পের ভেতর মনীষা হঠাৎ বলে উঠল, আমরা সবাই সমরেশবাবুকে অভিনন্দন জানাই, কী বল তোমরা?

সমরেশ বিস্মিত হয়ে, কেন?

এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে।

মাধুরী বলল, এরকম আর একটা পিকনিক আমরা চাই কিন্তু। এবার আরো দূরে, এরকম নদীর পাড়ে, এরকম বাংলো। একদিন থাকতে হলেও আপত্তি নেই। দারুণ এনজয় করেছি আমরা।

আঁচলের গল্প মনে পড়ল সমরেশের। আঁচলটা নিয়ে যত সমস্যা, তবু আঁচলই হয়তো আশ্রয়। পরিমলের মতে, মন্দ কী। দূর থেকে আরো দূরে যেতে হবে, আঁচল ছড়িয়ে নয়, সঙ্গে করে নিয়ে।

তবু জেগে উঠতে হল সমরেশকে। হ্যাঁ, অবশ্যই চেষ্টা করব আমি। মাঝে মাঝে এমন বেরিয়ে পড়া খুবই দরকার আমাদের। তার চেয়ে বেশী দরকার এখন এক কাপ করে চা। এই চা-অলা—

# দ্যাখা না-দ্যাখার জগৎ

চোখদুটো ভালোভাবে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, দু' চোখেই ছানি। ডানদিকেরটা বেশি, কী করবেন?

অপারেশন করতে হবে? তার মানে বেশ কিছুদিন ঘরবন্দী? এত কাজের চাপ, তার মধ্যে—

ঘরবন্দী হবেন কেন? ফেকো করিয়ে নিন। পরদিন থেকেই নর্মাল লাইফ। খরচ একটু বেশি পড়বে। আপনার মেডিকেল ইনস্যুরেন্স করা আছে?

তা আছে।

তবে আর দেরি করবেন না।

ডাক্তারবাবুর আশ্বাসে অনল রাজি হল।

নার্সিংহোমের রিসেপশনে কাগজপত্র দেখে, ওরা অনলকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। নির্দিষ্ট বেডে পৌঁছে অন্য পোশাক পরতে হল। বেডে শুয়েছে, নার্স এসে কানে তুলো গুঁজে ডান চোখে একফোঁটা ওষুধ, জল দিয়ে একটা ট্যাবলেট।

অনলের ঘুম ঘুম পাচ্ছে, নার্সকে ডেকে বলল, একটু ঘুমোতে পারি?

হ্যাঁ ঘুমোন, সেজন্যেই তো ওষুধ দেয়া। ঠিক সময়ে ডেকে নেব আপনাকে।

একসময় ঘুম ভাঙিয়ে অনলকে অপারেশন-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। শুইয়ে দিয়ে ওর ডান চোখের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে যন্ত্রপাতি এনে, ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, টেরই পাবেন না।

প্রস্তুতি-পর্বের পর অপারেশন। ভেসে উঠছে নানা দৃশ্য, নানারকম রঙ, কেমন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছিল অনল। একসময় ওকে টেবিল থেকে তুলে নার্স ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বেডে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু এসে বললেন, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে বাড়ি চলে যান। গাড়ি আছে তো? আজ বাড়িতে বিশ্রাম, কাল থেকে নর্মাল লাইফ। মনে রাখবেন, আপনার ডানচোখে এখন বিদেশি লেন্স। শুনে অনল হাসল।

অনলের সঙ্গে একজন এসেছিলেন। ইতিমধ্যে টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে অনলকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

প্রথম দুদিন কিছু বোঝা গেল না। চোখের দৃষ্টি আগের মতোই ঝাপসা। ভয় পেয়ে ডাক্তারবাবুকে মোবাইলে ধরতে, অনলের নাম শুনে নিজেই বললেন, ঝাপসা দেখছেন তো? আস্তে আস্তে দেখবেন সব পরিষ্কার হবে, চিন্তা করবেন না। ব্যথা হলে বা ভিশন কমতে থাকলে যোগাযোগ করবেন।

ঘটলও তাই। পরদিন থেকে ঝাপসা কেটে ধীরে ধীরে সবকিছু ফুটে উঠছে আরো স্পষ্ট।— সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম বোঝা গেল। আলো এত তীব্র, রোদচশমা পরতে হয়েছে। খাট

থেকে নেমে সামনের দেয়ালে একটি ছবি যা অনেকদিন ধরে সাঁটা আছে। রোজ দ্যাখে ছবিটা অন্ধকার-অন্ধকার, এর খুঁটিনাটি চোখে পড়েনি কোনোদিন। তেমন আগ্রহও ছিল না। আজ বিছানা থেকে নেমে ছবিতে চোখ পড়তে অবাক, কেমন উজ্জ্বল স্পষ্ট ছবিটা তার খুঁটিনাটি-সমেত। তার ভেতরে গভীর অরণ্যপথ স্পষ্ট দ্যাখা গেল, দুপাশে লম্বা লম্বা গাছের সারি, পাতাগুলি পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। পথের শেষে নীল আকাশ, দুপাশে পাহাড়ের আভাস।

উচ্ছ্বসিত অনল, এরপর প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ছবিতে চোখ রেখে, যা ক্রমশ আরো উজ্জ্বল, আরো স্পষ্ট, তার আরো খুঁটিনাটি। একদিন ছবিটার নীচে একটা লেখা যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। কোনোদিন যে লেখা চোখেই পড়েনি, এখন স্পষ্ট তার অক্ষরগুলি। লেখা আছে—Great achievement is usually born of great sacrifice.

এরপর থেকে অনলের চারপাশে ক্রমশ স্বচ্ছ, ক্রমশ স্পষ্ট পৃথিবীটা। ঘরের চেহারাটাই পালটে গেছে। দেয়ালের সাদা থেকে তীব্র নীল ফুটে বেরচ্ছে, তার কোণগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে, বিজ্ঞাপনে ছবির মতো নিখুঁত। কাঠের আলমারিতে সাঁটা সাইমাইকা এত ঝকঝকে পরিষ্কার আগে ছিল না, তার অন্তর্গত নকশাগুলি এত স্পষ্ট, আলমারিটাই নতুন হয়ে গেছে। মেঝের দিকে চোখ পড়তে মোজেইক দানাগুলি, তার রং এত উজ্জ্বল যেন এক্ষুনি পালিশ করা হয়েছে। বিছানার উপর পাতা চাদরটা এত ধবধবে পরিষ্কার, বিজ্ঞাপনদাতারা খবর পেলে ছবি তুলতে ছুটে আসবে। ফ্রিজ, টিভিতে ছবি এত নিখুঁত, ডাইনিং টেবিল, আলনা, আয়না সব বদলে গিয়ে, মনে হচ্ছে বিদেশের কোনো গৃহসজ্জার ছবি দেখছে। মনে পড়ল, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, বিদেশি লেন্স লাগিয়ে দিলাম,—তার জন্যই কি সমস্ত স্বদেশ এখন বিদেশ হয়ে গেল!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনের বাগানে গিয়েছে। সেখানে গাছে-গাছে পাতাগুলি তীব্র সবুজ, এত সবুজ আগে কখনো দ্যাখেনি। রংবেরঙের ফুলগুলি বাহারি হয়ে, বাগানটার অন্য মাত্রা। মূল ফটকের কাছে গিয়ে সামনের বাড়িটা চোখে পড়ল। কিছুদিন আগে রং করানো হয়েছে, তার এমন উজ্জ্বল গোলাপি রং! চিনতেই পারছে না। বাড়ির খাঁজে খাঁজে রকমারি নকশা অনলকে মুগ্ধ করে দিল। তার চোখে যেন বাল্যকালের পৃথিবী, অকলুষ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে অনল।

সহসাই ফিরতে গিয়ে, বাঁদিকে চোখ পড়ল। দূরের ওই বাড়িটাও তো রং করা হয়েছিল, কিন্তু তার মেটে রং! আরো একটু ঘুরে যেতে, আশ্চর্য, সেটি এবার সুন্দর চকলেট রঙের বাড়ি। সামান্য থমকে গেছে অনল, কেন এমন হল? কী খেয়ালে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ডানচোখ হাত দিয়ে ঢাকতে—মেটে রং;বাঁচোখ ঢাকতে উজ্জ্বল চকলেট রঙের বাড়ি! আরো পরীক্ষা করতে মূল ফটকের সামনে এগিয়ে গেল সে। ডানচোখ ঢাকতে বিবর্ণ বাড়িটা, বাঁচোখ ঢাকতে তার উজ্জ্বল গোলাপি রং।

রহস্যটা ধরতে পেরে মনে মনে হেসে উঠল। ওর এখন দারুণ মজা, বাঁচোখে স্বদেশি, ডানচোখে বিদেশি। যখন যেমন ইচ্ছে দেখতে পারে। বাড়িতে ঢুকে বিছানার পাশে যে অরণ্যপথ, দুচোখ দুভাবে দ্যাখাল তাকে। সমস্ত ঘর, আসবাব ও সজ্জা কখনো স্বদেশে থাকছে, কখনো বিদেশে। এই মজার খেলায় রীতিমতো মেতে উঠল অনল। ইচ্ছে হলে স্বদেশে থাকবে, ইচ্ছে

হলে বিদেশে যাবে। এইভাবে দুটো চোখ নিয়ে খেলতে খেলতে একসময় দেখল, দুচোখ খোলা থাকলে সব ভাঙাচোরা দৃশ্য, উজ্জ্বল ও বিবর্ণের অসম মিশ্রণে বর্ণকোলাহল। বুঝতে পারল, দুচোখে সমন্বয় নেই, হয়তো সমন্বয় আকাঙিক্ষত হলেও প্রকৃতই ঘটে না। স্বামী বিবেকানন্দ তো এমন সমন্বয় চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘটল কোথায়? বরং হয় স্বদেশে থাকো, নয় বিদেশে যাও, এটাই তো ঘটনা এখন এবং তা সম্ভব যদি একচোখো হওয়া যায়। কিন্তু সারাজীবন কীভাবে একচোখে কাটাবে? মন সায় দিল না, অনল ডাক্তারবাবুর সন্ধানে গেল।

দ্যাখা গেল, ডাক্তারবাবু মোটেও উদ্‌বিগ্ন নন। বললেন, চিন্তার কিছু নেই, যা ঘটছে এটাই স্বাভাবিক। এখন কিছুদিন এরও হেরফের হবে, নতুন চশমায় আবার দুচোখে একটা সমন্বয় আসবে।

দিনকয় পর চোখ আবার পরীক্ষা করে উপযুক্ত চশমা সাব্যস্ত করে দিলেন। কিছুদিন সেই চশমা ব্যবহার করে কাজ চালানোর মতো একটা সমন্বয়ে পৌঁছনো গেল। এবার চোখের শুধু গ্রহণক্রিয়া নয়, অভিনিবেশ নিয়ে প্রকৃত দ্যাখা, তথ্যসন্ধান শুরু হয়েছে। আলো রং ও বিষয়ের গূঢ় বিন্যাস চোখে পড়তে লাগল। অনল লক্ষ্য করছে, ডানচোখেরই বেশি ব্যবহার। দক্ষিণদারি চোখ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছে। যা-কিছু গূঢ়, যা-কিছু এতকাল অনাবিষ্কৃত তা আবিষ্কারের জন্যে উন্মুখ।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল আয়নার সামনে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ অবয়বটা—একদা উন্নত গ্রীবার এ কী হাল! এটুকু ধারণা ছিল বয়েসের ভারে শরীর কিছুটা ঝুঁকেছে, কিন্তু ডানকাঁধ ঝুঁকে রীতিমতো ভারসাম্যহীন, যেন মাথা থেকে ঝুলছে। হাতদুটো শীর্ণ, রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই, কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে, অথচ যে জামাটা গায়ে, তার অতি-উজ্জ্বল নীল রং সমস্ত শরীর যেন গ্রাস করছে। এতদিনের আলো-আঁধারি রহস্য দূর হয়ে, শরীর ও পোশাকের বর্ণবৈষম্য তীব্র হয়ে দ্যাখা দিল এই নতুন চোখে। মুখমণ্ডল দ্যাখা গেল আরো ভয়ংকর। চোখের কোণে গভীর কালো ছোপ, কোটরগত চোখের মণিদুটো তাতে বীভৎস দ্যাখাচ্ছে। দুপাশের গাল বসে গিয়ে চোয়ালের দুদিকে সাম্য নেই, দাঁতের নীচের পাটিতে এমন গাঢ় কালো ছোপ কবে থেকে! চিবুকটাও বেয়াড়াভাবে ঝুলে গেছে। হয়তো জামাপ্যান্টের রং উজ্জ্বল হওয়াতে এমন, ভেবে জামাটা খুলল অনল। তাতে আরো ভয়ংকর পরিস্থিতি। বুকের পাঁজরগুলো স্পষ্ট, কণ্ঠার হাড়গুলি ভেসে উঠে, এই শরীর নিয়ে এতদিন চলাফেরা করেছে। সব মিলিয়ে, প্রায় কঙ্কালের মতো দেখতে এই মুখমণ্ডল আর অবসন্ন শরীর কি অনলের!

ভয়ে, আয়নার সামনে থেকে সরে গেল, বসল এসে ডাইনিং টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপরে সানমাইকার চাদরটা অনেক খুঁজে পছন্দ করেছিল একদিন, কোথাও কোথাও উজ্জ্বলতা থাকলেও অধিকাংশ অঞ্চলের বিবর্ণতা এখন ব্যঙ্গ করছে। গিন্নি চায়ের কাপ সামনে রেখে গেল। তার তীব্র সাদা রং, কাপ প্লেট যেন টেবিলের ওপর নেই, ভেসে আছে। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে চোখে পড়ল, একপাশে একটা চোরা দাগ, ফাটল নাকি? যতবার চুমুক দিচ্ছে, দাগটা আরো স্পষ্ট। এতদিন এই কাপে চা খাচ্ছে, দাগটা কখনো চোখে পড়েনি তো!

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসেও বিভ্রান্তিকর অবস্থা। প্লেটে ভাত ঢালবার আগেই প্লেটের

অন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখাগুলি, কোনায় কোনায় কালো কালো ছোপ চোখে পড়ে গেল। উঠে বেসিনে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়েও গেল না। গিন্নি বলল, কী ব্যাপার? ভালো করেই তো ধুয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্লেটটা দেখিয়ে অনল বলল, এগুলো কী?

কী ওগুলো? বেশি দেখছ নাকি? আমি তো কিছু দেখছি না। বাতিক হয়েছে তোমার। খাও তো।

অগত্যা খাওয়া শুরু করলেও ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি গেল না অনলের।

গিন্নি তা লক্ষ্য করে ছেলেকে বলল, চোখের ছানি কাটিয়ে মুশকিল হল দেখছি। যা নয় তাই দেখছে আজকাল। অমন পিটপিট করে খেলে খাওয়া হজম হবে নাকি?

অনল কিছু বলল না। গিন্নির মুখের দিকে ভালো করে দেখতেই কেমন দমে গেল। ওর মুখশ্রী সুন্দর বলেই এতকাল ধারণা ছিল, এখন দেখছে সুডৌল নয় মোটেই। গাল ঝুলে পড়েছে দুদিকে, চিবুকটা নেমেছে একটু বেশিই। সুন্দর চোখদুটোর তলায় কালির ছোপ। মুখে হাসি থাকলেও বিরক্তিতে তা কুঁচকে আছে, দেখতে ভালো লাগছে না মোটেও।

গিন্নি বলল, কী দেখছ অমন করে? অনলের ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেও হাসছে।

ছেলের দিকে দৃষ্টি পড়তে, ওর মুখটাও কেমন চোয়াড়ে! গালের দাগগুলি স্পষ্ট হয়ে, ওর চেহারায় সেই সুকুমার ভাব আর নেই। চুল আঁচড়েছে কিন্তু রুক্ষ।

ছেলে ও গিন্নি পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে, ওদের থেকে চোখ সরিয়ে খাওয়ায় মন দিল।

এইসব বিভ্রান্তি অনলকে আরো একপেশে করে তুলেছে। খাওয়ার পর দরজা জানালাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিছুদিন আগে নতুন রং করা হয়েছিল, তাদের যে উজ্জ্বল রং এতদিন বিভ্রান্ত করেছে, তার ভেতরে এমন উঁচুনিচু অসম তলগুলি, মিস্ত্রির দক্ষতার অভাবে সমান হয়নি, রং দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। দেয়ালে লাগানো হয়েছিল পছন্দ করা দামি এশিয়ান পেন্টসের রং যা এতদিন বেশ স্বস্তি দিয়েছে, সেখানেও বলিরেখার মতো অসংখ্য দাগ, প্লাস্টার করার সময় মেলানো যায়নি, এতদিন রং ঢেকে রেখেছিল। একইভাবে পড়ার টেবিল, আলমারি, বুক শেল্‌ফ, পালিশ করা সুদৃশ্য চেয়ারগুলি, যার যার ক্ষত ও বিবর্ণতা একযোগে উঠে এসে অনলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যেন। এইসব অসমঞ্জস এতদিনের স্বস্তি থেকে ক্রমশ অবসাদের দিকে ঠেলে দিল অনলকে।

তবু নিজের কিছুটা পুনরুদ্ধারের আশায়, বিকেলের দিকে বাগানে গেল। পড়ন্ত আলোর আভা বাগানময়, গাছগুলোর ওপর মায়াময় লাবণ্য ছড়িয়েছে। একটা স্বস্তির ভাব মনে আসছে, তখনই চোখে পড়ল, ফুলগাছের, আমগাছের কাণ্ডগুলি, ডালপালাগুলি তাদের নানা শিরাসমেত ফুল-পাতার ভেতরে ভেতরে, তাদের কালো রং এত স্পষ্ট, ফুল ও পাতার সঙ্গে এমন বেমানান, মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। বাগান থেকে ফিরতে ফিরতে মনে মনে ভাবল, এমন সৌন্দর্যের সমারোহ অথচ যারা তাদের পুষ্টি দেয়, ধারণ করে, তারা এমন নিপীড়িত কেন! তবে কি জগতে যাবতীয় সমারোহের ভেতরে এমনই প্রচ্ছন্ন থাকে ধারক-বাহকের দল? এমনই অকৃতজ্ঞ নাকি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈভবরাশি? তার মনের ছন্দটাই নষ্ট হয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির মূল ফটকের দিকে এগিয়ে গেছে। সামনের বাড়িটা, যা রঙিন হয়েছে কিছুদিন আগে, এবং ঠিক পাশের বাড়িটা, যার কাজ শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে, যাতে রং পড়েনি এখনো, মনে মনে এ দুয়ের তফাত খুঁজতে লাগল। পাশের বাড়িটায় ইটের স্তূপের ওপর সিমেন্ট বালির পলেস্তারা ছন্নছাড়া ইটগুলিকে সমতায় আনার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ, উপরন্তু নিজেই বিবর্ণ, রোঁয়া-ওঠা আস্তরণ মাত্র। সামনের বাড়ির মতো তার ওপরও রং চড়ানো হবে কোনো একদিন, এই রোয়া-ওঠা বিবর্ণ চেহারাটা তখন দ্যাখা যাবে না, তবু তার নিজ অস্তিত্বের বদল তো ঘটবে না, যেমন সামনের বাড়িটার রঙের প্রলেপ একটা বিভ্রম সৃষ্টি করছে এখন। পৃথিবীর যা-কিছু অসুন্দর এভাবেই তো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা হচ্ছে। অনলের সামনে পৃথিবীর, সভ্যতার এই গোপন ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়ে, দার্শনিক ভাবনায় আচ্ছন্ন অনল একসময় ঘরে ফিরে এসেছে।

ঘরে বসে এই ভাবনার গাঢ়তায়, অনলের মনের চোখে ক্রমাগত ভেসে উঠছে এই বাড়ির, তার সজ্জার, বাড়ির লোকজনের, পরিবেশের এ যাবৎ যত কিছু স্বস্তির অন্তরাল থেকে, এদের গভীর, গভীরতর ও গভীরতম স্তর থেকে উন্মোচিত যাবতীয় কর্কশতা। অথচ গভীর থেকে আরো গভীর উৎসে যারা, তারাই তো সবকিছুর ধারক, অথচ তাদের অস্বীকার করে ঘটানো হচ্ছে সৌন্দর্যের যাবতীয় উৎসার। সৌন্দর্যের এই নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতা!— অনলের মনটা বিস্বাদে ভরে যাচ্ছে।

কিন্তু এই যদি ঘটনা, বাঁচবে কী নিয়ে। অনলকে দৃষ্টির স্বচ্ছতা দিয়ে ডাক্তারবাবু এ কী কাণ্ড ঘটালেন? মানুষের, তার প্রিয়বস্তুর খুব কাছাকাছি যাওয়া যদি এমন অবসন্ন করে, স্পষ্টতায় যদি উৎসমূল বিপর্যস্ত, পাশাপাশি অস্পষ্টতা যদি বিভ্রান্তির রহস্য ছড়ায়, এই দ্বন্দ্বে উত্তরণ কোথায়!

এর সূত্র অনলের জানা নেই। ডাক্তারবাবু যখন এই দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন, এর সমাধানসূত্রও নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আছে। অতএব নতুন দিশার জন্যে ডাক্তারবাবুর কাছেই যেতে হবে। ভাবল অনল।

# লোকসানের জীবন

অনেক বাজার করা হল আজ, ফিরে এসে হিসেব মেলাতে বসেছি। এটা বরাবরের অভ্যেস। দেনা-পাওনার বিনিময় ঠিক ঠিক মিলে গেলে মনে স্বস্তি আসে। প্রতিদিন মিলেও যায়, কিন্তু আজ হিসেব শেষ করে ব্যাগ খুলে টাকা মেলাতে গিয়ে দেখি, কুড়ি টাকা বেশী! ভাবনায় পড়ে গেছি, এমন তো কখনো হয় না। এটা খুবই অস্বাভাবিক যে হিসেবের পর টাকা উদ্বৃত্ত হবে। টাকা কম পড়তে পারে, পকেট থেকে টাকা রাস্তায় পড়ে যায় অনেক সময়, পকেটমার হওয়াও সম্ভব, কাউকে দাম দিতে গিয়ে বেশী দিয়ে ফেললাম, দোকানী কিছু বলল না, এরকম আরো অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু বেশী কী করে সম্ভব!

মনের ভেতর একটা অস্বস্তির কাঁটাগাছ ক্রমাগত বড় হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। —কাউকে কী ঠকিয়েছি আমি? এটা আমার স্বভাব নয়, তবু অজান্তে এমন ঘটে গেল নাকি? কাঁটাগাছটা মনের গায়ে বিঁধতে থাকছে।

ভাবনা সুরু হয়ে গেল। বাজারে কেনাকাটার দৃশ্যগুলি মনে জাগিয়ে তুলছি। কোথায় কোথায় বেশী টাকার জিনিস কিনলাম?—মাছ, মাংস, সব্জি, ফল। মাংসের দোকানে দাম বলেছিল, ষাট টাকা। ছবিটা স্পষ্ট, একটা একশ টাকার নোট আর একটা দশ টাকা ওকে দিলাম, দোকানী পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ফেরৎ দিল। এরপর মাছের দোকানে। দর বলেছিল, জ্যান্ত মাছ আশি টাকা। শব্দটা এখনো কানে বাজছে। এক কিলো ছ'শ টানটান ওজন মাছটার, জোর করে দেড় কিলোতে রাজি করিয়েছিলাম, এ লড়াইটাও চোখে ভাসছে। দেড় কিলোর দাম একশ কুড়ি টাকা। কুড়ি টাকা! মন যেন হঠাৎ চনমন করে উঠল। ছবিটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।—একশো টাকার একটা নোট আর কুড়ি টাকার একটা দিয়েছি বলেই মনে হচ্ছে। একশ টাকার নোটটা স্পষ্ট ছবিতে কিন্তু কুড়ি টাকার নোট তত স্পষ্ট নয় যেন। তবে কি ওখানেই!

অস্পষ্ট হলেও কুড়ি টাকার একটা ছবি তবু ফুটে উঠতে চাইছে। যাই হোক, অন্য জায়গায় কি হয়েছে দ্যাখা যাক। সব্জির দোকানে অনেকক্ষণ সময়, অনেক কিছু ওজন করে, দরদাম করে, সনাতনের উচ্চারণটা কানে স্পষ্ট এখনো, বিরাশি হল বাবু। ছবিতে স্পষ্ট নয়, তবু একশ টাকা নিশ্চয়ই দিয়েছিলাম, কেননা এ ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—কুড়ি টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল, খুচরো থাকলে দু'টাকা দিন, নাহলে পরে দেবেন। অতএব এখানে নয়, বাকি রইল ফলের দোকান। মোট বাহান্ন টাকা বলেছিল, দু'টাকা দেবনা আমি বলেছি, এই চাপান-উতোর স্পষ্ট দৃশ্যে। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিয়েছিলাম, গোলমাল যদি হয়, কুড়ি টাকা বেশী হওয়ার মধ্যে এর কোনো সূত্র নেই। অতএব কিছু ঘটে থাকলে মাছের দোকানেই। অস্বস্তির কাঁটাগাছটা কিছুটা সহনীয় হচ্ছে।

পরের দিন দুধ আনতে যাবার পথে বাজারে ঢুকে মাছের দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল বিক্রির হিসেব করতে গিয়ে কুড়ি টাকা কি কম হয়েছে?

পাল্লায় মাছ ওজন করছিল, একটু ঘুরে বিস্ময়ের চোখে বলল, কেন বাবু?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

লোকটি যেন মজা পেয়েছে। হেসে বলল, হিসেব করে আর কী হবে, তাতে কি কোনোদিন বেশী পাই বাবু? আমরা সবসময় কমেতেই থাকি। কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

আসলে কাল বাজার করে বাড়িতে হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখি, কুড়ি টাকা বেশী রয়েছে, ভাবলাম, ভুল করে কম দিয়েছি কিনা!

দোকানী এবার সামান্য কুঁকড়ে গিয়ে, মনে নেই বাবু, হলেও হতে পারে।

লোকটি নিশ্চিত নয় দেখে টাকাটা দিলাম না। অন্য কোথাও যদি সূত্র পাওয়া যায়।

বাড়ি ফিরেও অস্বস্তি গেল না। জীবনে কোনোদিন অনায়াস অর্থ গ্রহণ করিনি, প্রকৃতই যা আমার সম্পদ, রীতিমত অর্জন করা। এজন্যে তৃপ্তি ছিল মনে। অথচ অর্জনহীন এই কুড়ি টাকা ব্যাগে রয়ে গেছে, মন কিছুতেই মানতে পারছে না। বাজারে যাবার আগে ব্যাগে টাকা নেয়া থেকে শুরু করে বাজারের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ আবার বিচার করেও হদিস মিলল না। সম্ভাব্য অন্য সূত্রগুলিও তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, তবুও। অবশেষে ঐ কুড়ি টাকা একটা খামে ভরে, ভবিষ্যতে যদি তা লৌকিক হয়, এই সম্ভাবনায় আলমারীর এক কোণে রেখে দিলাম। এই ভেবে যে, এটা আপাতত আমার অধিকারে বটে, যা অলৌকিক সূত্রে আমার হয়েছে, বস্তুত এটি অন্য কারো সম্পদ, যা আমার কাছে গচ্ছিত রাখা আছে মাত্র।

আরো একদিন অন্যরকম ঘটল। ব্যাগে হিসেব করে টাকা নিয়েছি। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোনের বিল জমা দিতে হবে, কিছু স্টেশনারী বাজার, বাস ভাড়া, এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরো ষাট টাকা, যদি কোথাও হঠাৎ দরকার হয়। সমস্ত কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে হিসেব করতে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা কম পড়ল। তা কি করে হয়! টেলিফোন বিল ন'শ ষাট টাকা, দুটো পাঁচশ টাকা আর দশ টাকা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ নিলাম। ছবির মতই স্পষ্ট। ইলেকট্রিক বিল এক হাজার এগার টাকা, সেখানেও দুটো পাঁচশ, একটা দশ ও এক টাকা। গোলমাল হওয়ার কথা নয়। স্টেশনারী স্লিপটা এই তো, পঞ্চাশটাকার কোনো সম্পর্ক নেই, যা হয়েছে খুচরো মিলিয়ে পুরোপুরি দিয়েছি। তবে কি টেলিফোন বিল দিতে গিয়েই! কিন্তু পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দেবার ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি অন্য কোনো পকেটে? সমস্ত পকেট খুঁজেও পাওয়া গেল না। হঠাৎ মনে হল, পকেটে রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়নি তো! অর্জন-করা টাকা এভাবে হারিয়ে যাবে, মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। আবার ছবির মত সব দেখে, বারবার হিসেব করে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটাই প্রতিপন্ন হল।

কেন এমন হচ্ছে বারবার? কেন এমন হয়! ভাবতে ভাবতে মনের ভেতরে অশান্তি ঘন হচ্ছে। এটা কি বয়েসের দোষ? এরকম চলতে থাকলে সংসারধর্ম নির্বাহ করব কিভাবে! নিজের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে, কোন উপায়ে এর থেকে উদ্ধার পাব, ভেবেই পাচ্ছি না।

এরপর থেকে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে খুবই নড়বড়ে হয়ে পড়েছি আমি। টাকা দিতে গিয়ে, টাকা নিতে গিয়ে বারবার করে গোনা, পকেটে রেখে দিয়েও আবার বার করে পরখ করা, যাদের সঙ্গে লেনদেন হয়, তাদের ভ্রূ কোঁচকানো লক্ষ্য করি, নিজের কাছেও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকছে, তবু কিছু করার নেই। কুড়ি টাকার হদিস নেই, টাকা হারানোর যন্ত্রণাও

স্পষ্ট, তবে কি সংসারে আমার যোগ্যতা কমে যাচ্ছে! আমার এই অস্থিরতা স্ত্রী-র চোখে পড়ে গেলে বারবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? উত্তর দিতে পারি না, নিজের অযোগ্যতার কথা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারি না।

এইভাবে চলতে চলতে, নিজের অস্থিরতা, অস্বস্তির কথা কাউকে বলতে না পেরে মনের গোলমাল আরো বেড়ে গেল। নিজের ওপর আস্থা নেই, স্মৃতি ভুলপথে চালিত করে, বাসের নম্বর ঠিকঠাক মনে পড়ে না, পরিচিত কারো মুখ চিনতে পারলেও নাম কিছুতেই মনে করতে পারি না।

আমার এই গোলমালে স্ত্রী রাগারাগি করে কিন্তু মেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একদিন বলল, তোমার বয়েস হয়েছে, দোকান-বাজারে আর যাওয়ার দরকার নেই। এবার থেকে আমিই সব করব।

তুই মেয়ে হয়ে এসব পারবি?

খুব পারব। আজকাল মেয়েরা সব পারে।

তারপর থেকে ঘরেই বন্দী। মেয়ে আর তার মা সবকিছু সামলায়। ঘোর অস্বস্তি আমার, সংসারের কোনো প্রয়োজনে আমাকে দরকার হয় না। এ কেমন জীবনযাপন করছি আমি!

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, এমন জীবনযাপনে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে, কোনোরকম আদান-প্রদানের ভেতরে যেতে হচ্ছে না। হয়ত এ কারণেই নিজের ওপর আস্থা ফিরে পাচ্ছি। এখন নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ি, দেশের দুর্দশার নানা খবর পাই, বিচলিত বোধ করি, নিজের কিছু ভূমিকা সেখানে থাকা কর্তব্য কিনা এ বিবেচনাও করি। শুধু এটুকুই, এর বেশি কোনো কিছু হদিস করতে পারি না।

যে কোনো বস্তু প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত হয়। সেই চালনা স্থিতিকে পরিবর্তিত করে, কিন্তু আদান-প্রদান ভিন্ন এই পরিবর্তন সম্ভব হয় না। প্রকৃতির যাবতীয় কিছু এই বিনিময়ের মাধ্যমেই সচল রয়েছে, এমন কি স্থির-স্থাণুরও বিলম্বিত লয়ে আদানপ্রদান ঘটে। এইরকম যে বাস্তব পরিস্থিতি, সেখানে আমার অবস্থান কোথায়! সাংসারিক বা সামাজিক কোনো আদান-প্রদানে না থেকে আমি কিভাবে বেঁচে আছি। এই সূত্রে সহসা সেই কুড়ি টাকা আর পঞ্চাশ টাকার কথা মনে পড়ল। পঞ্চাশ টাকার খোঁজ কোনোদিনই পাব না, এটা জানি। বিনিময় হল না বলে আর্থিক অস্তিত্ব থেকে এই টাকা চিরকালের জন্য ক্ষয়িত হয়ে গেছে, কোনোদিনই তা পূরণ করা যাবে না। কিন্তু সেই কুড়ি টাকার খোঁজ তো এতদিনে পাওয়া উচিৎ ছিল, অলৌকিক অর্জন হলেও আর্থিক অস্তিত্বে তার কোনো একদিন যুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে, বিনিময় চাইনি বলেই তা অলক্ষ্যে এখনো।

আলমারীর কোণ থেকে টাকাটা পাওয়া গেল। আর তখনই মনের স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে পুরনো অস্বস্তির ভেতরে। সবকিছু আবার গোলমাল হয়ে যাওয়ার আশংকায় টাকাটা পুরনো জায়গায় রেখে দিলাম। আশ্চর্য এক অসহনীয় অবস্থার ভেতরে, যদিও এই সমাজে, সংসারে বিনিময়ের ক্ষেত্রটি আমার কোনোদিনই সামঞ্জস্যে ছিল না, তবু ভারসাম্য না থাকলেও এগোনো তো ছিল। কিন্তু এখন এই দ্বন্দ্বের ভেতরে, একদিকে বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থির থেকে একপ্রকার জীবন, অন্যদিকে বিনিময় না থাকলে স্থির-স্থবির জীবনহীন, এই দুয়ের সমন্বিত চেহারা কী হতে পারে, এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছি আমি।

এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের জন্য খোঁজখবর করতে করতে পাত্র স্থির হয়ে গেল। কোনো ঘটনায় জড়ায়নি আমাকে, তবু পাকা কথার সময় থাকতেই হল। পাত্রপক্ষ দেনাপাওনার ব্যাপারে একটা সাব্যস্ত করতে চাইলে এবং পাত্রের বাবা কোনো এক সওদাগরী অফিসে হিসেব-নিকেশের কাজ করেন শুনে একটা হদিস যেন পেয়ে গেলাম।

পাত্রের বাবাকে বললাম, দেনাপাওনার ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন? এরকম কিছু আছে বলে আমার তো মনে হয় না।

ভদ্রলোক প্রথমে কিছুটা হতভম্ব, তারপর সামলে নিয়ে সামান্য হেসে, না মানে, নির্দিষ্ট অর্থে তেমন কিছু দাবী হয়ত আমাদের নেই, তবু সবকিছু স্পষ্ট হওয়া দরকার।

দাবীর কথা উঠছে কি করে? যতদূর শুনেছি, মেয়ে আপনাদের পছন্দ হয়েছে, এরপর আপনাদের বাড়ির একজন হয়ে যাবে। আমাদের মেয়ের তাতে সামান্য অবস্থানবদল হবে এইমাত্র। এটা তো আপনারাও মেনে নিয়েছেন। যদি মেনে নিয়ে থাকেন, আপনাদের অর্জন বলতে এটুকুই। এছাড়া আর কী পাওনা থাকতে পারে?

আপনি সহজভাবে সবকিছু ঠিকই বললেন। কিন্তু মেয়েকে তো সাজিয়ে গুছিয়ে দেবেন আপনারা। সে ব্যাপারেই বলছিলাম।

দেখুন, আমার তো মনে হয় অর্জন না করলে পাওনা হয় না। মেয়ের যদি আমার কাছে দাবী থাকে, আমাকে বলবে। আর একটা শব্দ বললেন, দেনা। আমার কি কোনো দেনা আছে বলে আপনি মনে করেন?

না না, তা থাকবে কেন, ওটা কথার কথা।

আলোচনা জটিলতার ভেতরে যাবার উপক্রম দেখে সবাই বিব্রত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পাত্রের বাবাকে বললাম, আপনাকে অভিজ্ঞ লোক হিসেবে যখন পেয়েছি, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবেন না। ধরুন আমার কাছে কুড়ি টাকা চলে এসেছে, কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছি না। আবার ধরুন পঞ্চাশ টাকা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। এ ব্যাপারটা হিসেবের খাতায় কিভাবে দ্যাখাব?

আমার এই কথায় ভদ্রলোক কিছু একটা সন্দেহ করছেন মনে হল, তবু ম্লান হেসে বললেন, কুড়ি টাকা এমনি এমনি তো আসতে পারে না, একটা সোর্স থাকতে হবে, নাহলে হিসেবের খাতায় তোলা মুশকিল। হারিয়ে যাওয়া ঘটনাটা পিলফারেজ হতে পারে কিন্তু তাতে হিসেবরক্ষকের দায়িত্ববোধের অভাব প্রমাণিত হবে। এ হিসেব সত্যিই বড় গোলমেলে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ!

আর বলবেন না, এমনই এক জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছি। আপনার কাছেও এর সমাধান নেই দেখছি। যাই হোক, আর কি আলোচনা আছে বলুন।

পরিস্থিতি বুঝে স্ত্রী-কে এগিয়ে আসতে হয়েছে। বলল, থাক, তোমার সঙ্গে তো কথা হয়ে গেছে, এবার আমরা বাকীটা সেরে নিই। আমার আর প্রয়োজন নেই দেখে উঠে এলাম। ওরা আরো কিছুক্ষণ নানা কথাবার্তা সেরে চলে গেছে। ওদের যাওয়ার ভঙ্গি দেখে বেশ খুশীই মনে হল।

ওরা চলে গেলে স্ত্রী এসে বলল, তোমাকে নিয়ে বিপদ দেখছি। আবোল-তাবোল কথায়

সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছিলে। এমন ভাল পাত্র হাতছাড়া হলে আর পাবে? আমি কিছুটা সামলেছি, দ্যাখা যাক কি হয়। তোমাকে আর এর মধ্যে থাকতে হবে না।

অবশেষে পাত্র হাতছাড়া হয়নি, দিনক্ষণ দেখে নির্দিষ্ট দিনেই বিয়ে হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী, অর্থাৎ আমার মেয়ে, কোনোদিনই আমার কাছে কোনো দাবী রাখে নি, এবারও করেনি। মা-র কাছে করেছিল কিনা জানিনা, দেখলাম, রীতিমত সালংকারা হয়েই শ্বশুরবাড়ি গেল। যাবার সময় স্ত্রী, মেয়ের বান্ধবীরা, আত্মীয়-স্বজনরা, ইন্দ্রাণী নিজেও অনেক কাঁদল। এই অবস্থান-বদল ভারসাম্যে এমন বিচলন ঘটাতে পারে ভাবা যায়নি। সবকিছু কেমন ভারী হয়ে উঠল। বুঝতে পারছি, চলবে আরো কিছুকাল, নতুন বিন্যাসে পৌঁছনো পর্যন্ত।

ইন্দ্রাণী আমার বুকেও মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদল। আমি কাঁদতে পারিনি, কেননা হিসেব কিছুতেই মিলছিল না। সেই কবে শিশু ইন্দ্রাণী জন্ম নিল, কেমন যেন অলৌকিক সেই পাওয়া। তারপর কত যত্নে ওকে মানুষ করেছি, আমার দুর্দৈব দেখে ও দায়িত্ব নিয়েছে, তাতে কিছু সঞ্চয় হয়েছিল নিশ্চয়ই। তারপর সহসা লোকসান ঘটিয়ে চলে গেল। সব মিলিয়ে জীবনের এই হিসেবটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। পারব কি কোনোদিন?

# সুন্দরের জন্মদিন

সুন্দর আসবে। আজ ওর জন্মদিন।

সুব্রত-রিনার তীব্র ইচ্ছের কাছে হার মেনে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যেখানেই থাক, এই দিনে সুন্দরকে আসতেই হবে। আসতে হয় ওদের মনের কাছে রসদ পৌঁছে দিতে। সমস্ত বছর ধরে, তার প্রতিটি দিন গুনতে গুনতে ওরা এই বিশেষ দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে। গত পাঁচ বছর যাবৎ ওদের জীবনে এই একইরকম ঘটে চলেছে।

ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই সুব্রত-র মনে পড়ল। পাশে ঘুমিয়ে থাকা রিনাকে দেখে আবেগে জড়িয়ে ধরেছে। আড়মোড়া ভেঙ্গে রিনা যখন শুনল এই দিনটির কথা, সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতকে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে, তারপরই দুজনে প্রায় সমস্বরে বলল, চল উঠে পড়ি। আজ অনেক কাজ।

রিনি ঘরসংসার গুছোনোর কাজে লেগে পড়েছে। সুব্রত গেল বাজারে।

বাড়িতে ঢুকেই সুন্দর একগ্লাস জল খেতে চাইবে।—বোতলটা পরিষ্কার করে এ্যাকুয়া-গার্ড থেকে জল ভরল, গ্লাসটা ভিম দিয়ে মাজল, তারপর মুছে ঝকঝকে করে বোতলের পাশে রেখেছে। এরপর বিশ্রাম নিয়ে স্নানে যাবে।—আলমারী থেকে সোনালী-হলুদ রঙের তোয়ালেটা, ইস্ত্রী করে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবী, পাজামার দড়ি ঠিক আছে কিনা, পাঞ্জাবীর বোতামগুলো সব অক্ষত কিনা দেখে নিয়ে বাথরুমে রেখে এল। সাওয়ার খুলে ঝাঁঝরির সবকটা ফুটো থেকে জল-পড়া দেখে, তারপর ওয়াইপার দিয়ে পরিষ্কার করল বাথরুমের মেঝে। বালতি মগ ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা আছে, এবার কাগজ জলে ভিজিয়ে আয়নাটা ঝকঝকে করে তুলছে। প্যাকেট থেকে নতুন সুগন্ধি সাবান নতুন সোপকেসে ভরে সেখানে রাখল। টুথব্রাশ টুথপেস্ট কালই সব নতুন কেনা, সেসব ঠিক ঠিক জায়গায়, হারপিকের বোতল থেকে নীল তরল ঢালল বেসিনে, প্যানে। ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে সবই উজ্জ্বল হয়েছে, বাথরুমের সর্বত্র আবার চোখ বুলিয়ে স্বস্তি নিয়ে ফিরে এল। সোফায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, মনে শান্তির ভাব,—বাথরুমে ঢুকে নিশ্চ ই খুশী হবে সুন্দর।

এদিকে বাজারে পৌঁছে সুব্রত বেশ বিভ্রান্তিতে। সব মনে পড়ে না, তবু তলিয়ে ভাবতে থাকল, সুন্দর কী কী খেতে ভালবাসে।—পালং শাক বেগুন আর বড়ি দিয়ে, তপসে মাছ ভাজা, চিংড়ি হলে ভাল, নাহলে ইলিশ মাছ, মুগের ডাল পোস্তর বড়া, পাঁঠার মাংস শুকনো কষা করে অতএব পেয়াজ রসুন, আনারসের চাটনি। ফলের মধ্যে কলা, এখন আমের সময় অতএব আম। বাজারের একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ এইসব ভেবে মনে মনেই একটা ফর্দ তৈরী হল, তারপর ঢুকে গেল বাজারে। দেখেশুনে ভালভাবে পরখ করে একে-একে সমস্ত জিনিস কিনেছে। কেনা শেষ হলে ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে একটা রিক্সায় বাড়ি ফিরল।

রিনা তখন বেজায় ব্যস্ত। সুন্দরের পড়ার ঘরটা গুছোচ্ছে। টেবিল-আলমারী খুলে বই, খাতা, ডায়েরী, ডিক্সনারী সব নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে তারপর র‍্যাকে তোলা। কোথাও কোথাও ধুলো বসে গেছে, রগড়ে রগড়ে—একবছর বাদে বাদে পরিষ্কার করলে হয়? এবার থেকে মাঝেমাঝেই করতে হবে। সুন্দর এসে এই হাল দেখে নিশ্চই ভাববে, ওর কথা সারাবছর কারো মনে থাকে না। সুব্রত-ও তো মাঝে মাঝে হাত লাগাতে পারে, তা না খালি আলসেমী—বলতে বলতে সুব্রতকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, বাজার আনলে? মোচা এনেছ?

সুব্রত-র বিস্ফারিত চোখ দেখে রিনা বলল, আনো নি তো? এই ভুলটা তোমার হয় কি করে? সুন্দরের ভাবনাটা তো অন্যায় নয় যে, এই এক বছর ওর না-থাকার সময় আমরা ওর কথা মনে রাখি না। যাই হোক, আবার তোমায় যেতে হবে, মোচার ঘণ্ট না দেখে মুখে হয়ত কিছু বলবে না, শুধু একটু গম্ভীর হয়ে যাবে। আর যাচ্ছই যখন ঘি, গরমমশলা আনবে, ঘরে কিচ্ছু নেই, খেয়াল ছিল না। মুগের ডাল, পোস্ত, আর যা যা সব তুমি তো জানোই, মনে করে সব নিয়ে আসবে। বেশী দেরী কোরো না, একটার মধ্যে ও এসে পড়ার আগে রান্না শেষ করতে হবে।

সুব্রত কোনো কথা না বলে আর একটা বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোচার সন্ধানে দু-তিনটে বাজার ঘুরতে ঘুরতে, তারপর ঘি, গরমমশলা, পোস্ত, মুগের ডাল, আনুষঙ্গিক আর যা যা কিছু, যা আপাতত মনে পড়েছে, না হলে আবার হয়ত যেতে হবে। সব নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল, রিনা এদিকে পড়ার ঘর গুছিয়ে, শোবার ঘর প্রায় গুছিয়ে এনেছে। ওরা মুখোমুখি হল, ঘড়িতে তখন বারোটা বাজে।

সুব্রতকে দেখেই, এত দেরী করলে, সব ঠিকঠাক এনেছ তো? কখন যে রান্না শেষ করি, ঠিকমত সুরুই হল না এখনো।

সুব্রত-র মনোভাব রিনি জানে। চটপট এক কাপ চা করে এনে ওর সামনে রেখে বলল, চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও, আমি রান্নায় যাই। একটার মধ্যে স্নান সেরে তৈরী থেকো। সুন্দর এলে আমায় ডাকবে, যত ব্যস্তই থাকি সুন্দরকে তো রিসিভ করতে হবে।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে সুব্রত দেখল, চমৎকার সাজানো, নিখুঁত পরিষ্কার। তাই তো, সুন্দর এটা ব্যবহার করবে। ঢুকল না, পুরনো বাথরুমে গেল। শাওয়ার খুলে দিতে ধারাস্নানের ভেতরে, ঝাপসা চোখের সামনে সুন্দর এসে দাঁড়িয়েছে। শরীর, নাক-চোখ স্পষ্ট নয়, তার উপস্থিতি শুধু সুব্রত-র অনুভবে। একবছর পর ওকে দেখে, বদল তো কিছু হয়-ই, তবু যেন চোখে পড়ে না। বছরের পর বছর একইরকম, সন্তান হলেও যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, আলাদা ব্যক্তিত্ব। সুব্রত ভাবছে, কতবছরই বা বাঁচবে—পাঁচ, বড়জোর দশ। তার মানে আর পাঁচ কি দশবার ওকে দেখবে। সারাবছর ধবস্ত থাকতে থাকতে মাত্র একদিনের উজ্জ্বলতা, এসবের কী মানে! কেন এমন অসহনীয় আর অর্থহীন অপেক্ষা তার জন্য!

সুব্রত শাওয়ার বন্ধ করল, ধারাবর্ষণ আর নেই। চোখের সামনে থেকে সুন্দর সরে গেছে।

গা-হাত-পা মুছে বাথরুমের বাইরে এল। সোফায় গা এলিয়ে দিতে শরীরে ও মনে একটা শান্তভাব আচ্ছন্ন করছে।

দিল্লীতে নতুন চাকরি পেয়ে পুরনো চাকরিটা সুন্দর ছেড়ে দিল। রিনার আপত্তি। সুব্রত-র কাছে সম্মতি নিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে।—সেই দিনটা স্পষ্ট আজও। রিনার অভিযোগ, ছেলেকে তুমি কাছে রাখতে চাও না, আমি বুঝি।

সুব্রত গম্ভীর, তোমার বোঝাবুঝির ওপর আমার হাত নেই। কিন্তু আমি বুঝি, ও বড় হয়েছে, নিজের জীবন নিজেই গড়ে তুলবে। বাধা দেবার অধিকার আমাদের নেই। আমরা শুধু ওর বিস্তৃতি দেখব, আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে পরামর্শ চাইলে দিতে পারি, এর বেশি কিছু নয়। তোমার আঁচলের তলায় ও বাড়বে কী করে?

রিনা এসব কথা মানে নি। সারাদিন শুধু কাঁদল, সুন্দর চলে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত, তারপরও সারারাত ধরে। সে কান্না আর থামানো যায়নি। সুব্রত-র সাহস ছিল না, অধিকারও ছিল না। এখনো সারাবছর ধরে রিনা কাঁদে। সুব্রত শুধু দ্যাখে আর অপরাধবোধে গ্রস্ত হয়। শুধু এই একটা দিন, কান্না থামিয়ে রিনা নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। সুব্রত কিছুটা স্বস্তি পায়, নিজেও যথাসম্ভব ব্যস্ত হয়।

সেই সুন্দরের জন্যে আজ অপেক্ষা। পাঁচ বছর ধরে এই বিশেষ দিনটিতে প্রতীক্ষা করতে করতে একরকম অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়,—এই অপেক্ষা, সারাবছর স্মৃতি আঁকড়ে থাকা, এই বিশেষ দিনে স্মৃতিকে ঘনীভূত করার চেষ্টা, এই পুনরাবর্তন, এই ঘেরাটোপে নিজেকে বন্দী করা। অথচ প্রকৃত কোনো সারাংশ নেই তার।—একটা কল্পলোক নির্মাণ করা শুধু, তাতে অভিনয়, একটা আরোপ, —এই অধ্যাসের ভেতরেই জীবনটাকে বইয়ে দিতে হবে—এর কোথায় শেষ, দেখতে পাচ্ছে না সুব্রত।

সুন্দরের জন্য প্রিয় খাবারগুলি তৈরী করছে রিনি আর ভাবছে, মনের ভেতরে সংশয়, যদি না আসে? এর জন্যে সুব্রত দায়ী। একমাত্র ছেলে মা-বাবার কাছে থাকবে না? মাইনে সামান্য বেশী বলে দূরে পাঠিয়ে দিতে হবে? কি এমন বয়েস হয়েছিল? কি-ই বা অভিজ্ঞতা। যাবার পথে নিশ্চ ই অভিমান হয়েছে এজন্যে আর আসে না। মাত্র এই একটা দিন, তা-ও কি ওর মতো করে পাওয়া যায়? অনেক দুশ্চি ন্তার পর যদিও আসে, কতক্ষণই বা—একটা স্বপ্ন শুধু, তারপর ভেঙ্গে চলে যায়। এক বছরব্যাপী মরুভূমির ভেতরে ওকে একা ফেলে চলে যায় কেমন নিষ্ঠুরভাবে। এই দুঃসহ প্রতীক্ষা, তার ভার আর বইতে পারছে না। এবার এলে বলবে, আর বাইরে বাইরে নয়, এবার চলে আয় আমাদের কাছে। কবছরই বা বাঁচব আমরা. এই দুঃসহের ভেতরে মানুষ কখনো বাঁচে বেশীদিন? আমরা মরে গেলে যা ইচ্ছে করিস, নিজের মত থাকিস।

দেরী হয়ে গেছে অনেক, রান্না করতে করতেই রিনা চলে এলো সুব্রত-র কাছে। বেশ উদ্বিগ্ন ওর মুখ, কী ব্যাপার, একটা বাজে, সুন্দর এলো না তো?

এত চিন্তা করছ কেন? রাস্তাঘাটে কত কিছু ঘটতে পারে। দেরী হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর একটু অপেক্ষা কর।

রিনার ভ্রূ-যুগলে সংশয় ও বিরক্তি। এসব কথা একদম বলবে না। কী ঘটবে? কেন ঘটবে? আমাদের স্নেহ-ভালবাসার জোর নেই? এসব তোমার ভুলের জন্যেই, তোমারই জেদ—

সুব্রত কথা বাড়াতে চায় না। ঠিক এইসময় কলিং বেল বাজল।

দুজনেই প্রথমে চমকে গিয়ে, তারপর চলকে উঠে, দুজোড়া চোখ একাগ্র দরজার দিকে। পোষাকে যথাসম্ভব বিন্যাস এনে কিছুক্ষণ স্থির। তারপর সুব্রত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলতে, —বাঁ-হাতে গুচ্ছ রজনীগন্ধা, ডানহাতে মিষ্টির বাক্স, যুবকের মুখমন্ডলে হাসির লাবণ্য।

সুব্রত-র মুখও উজ্জ্বল। সুন্দর এসেছ? দেরী হল আসতে, কোথাও আটকে পড়েছিলে?

পেছন পেছন রিনাও এসেছে। দেরী করলি কেন? আমাদের চিন্তা হয় না? একটু আগেও তো আসতে পারিস।

যুবকটি হেসে, খুব বেশী দেরী হয়নি, মাত্র পনের মিনিট। কেমন আছেন মাসীমা? মেসোমশাই-র শরীর ভাল তো?

মাসীমা! মেসোমশাই! ভ্রূ কুঁচকে দুজনেই বিরক্তি প্রকাশ করল।

ওঃ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। দুঃখিত। এক বছরে কত যে ঝড় গেল। এত কাজের চাপ, ভাবনায় ছিলাম, এ বছর আসতে পারব কিনা। যাকগে, কেমন আছ তোমরা?

রিনার গলায় উৎকণ্ঠা আর আবেগ। ওসব কাজের চাপ-টাপ বুঝি না। বছরে একটা দিন, আসতেই হবে। দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসবি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত? যুবকটি মজা করতে চাইল।

রিনাও হাসছে। ঠিক তাই।

সুব্রত তবু গম্ভীর। তোমার ওপর চাপ দিচ্ছি আমরা। কী করব বল, বয়েস হয়েছে। একা-একা সারাবছর তোমার জন্য পথ চেয়ে থাকি। এটুকু কষ্ট মেনে নাও।

রিনা ব্যস্ত হয়ে, ওসব ছাড়ো তো। এতদূর থেকে এসেছে ঘরে ঢুকতে দাও আগে। বিশ্রাম করুক, চা-টা খাক, তারপর কথা হবে। আয়, ঘরে আয় সুন্দর।

যুবকটি, অর্থাৎ যার নাম সুন্দর, ঘরে ঢুকে ওদের দিকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ আর মিষ্টির বাক্স এগিয়ে দিল। তারপর প্রণাম করে সোফায় বসল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

রিনা জিজ্ঞেস করল, কী খুঁজছিস?

ফটোটা ঐ দেয়ালে টাঙানো ছিল না?

ফটো দিয়ে কী হবে? তুই এসেছিস, আর কিছু-র দরকার তো নেই।

সুব্রত কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ উল্টোদিকের সোফায় গিয়ে বসল। রিনা চায়ের জোগাড় করতে চলে গেছে।

যুবক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, রিনা চলে যাবার পর বলল, ফটোটা কি সরিয়ে রেখেছেন? কেন? ফুল নিয়ে এলাম সাজাব বলে।

হয়ত রিনাই সরিয়েছে, খেয়াল করি নি। আমারও এইমাত্র চোখে পড়ল।

কেন? পাঁচ বছর হয়ে গেল, এখনো একইরকম? এবার ছবিটাও নেই! আপনি একটু বোঝান।

আমি কি বোঝাবো বল? আমিও তো ঘোরের মধ্যে আছি।

কেন মেসোমশাই? ঘোর তো কাটাতে হবে। পাঁচ বছর কম সময় নয়। সময়ও কি হার

মেনে যাচ্ছে? এবার আসতে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হল। এত কাজের চাপ, ছুটিই দিতে চায় নি। জোর করে এলাম।

তোমাকে অনেক বেশী চাপ নিতে হচ্ছে, কিন্তু কী যে করব মাথায় আসছে না। এবার তুমিই একটা বিহিত করে যাও।

রিনা ট্রে-তে করে চা নিয়ে এসেছে। দুজনের সামনে চায়ের কাপপ্লেট রেখে, নিজেরটা হাতে নিয়ে যুবকের পাশে বসল।—তোর কি ট্রেন লেট করল?

রিনার চোখ-মুখের উল্লাস দেখে যুবক হতাশ হয়ে পড়ছে। তবু জোর করে বলল, ফটোটা কোথায়। নিয়ে আসুন, ফুল দিয়ে সাজাই আগে।

জোরে হেসে উঠল রিনা, ফুল নিয়ে এসেছিস? কেন, নিজেকে সাজাবি বলে। এত শখ?

যুবক এবারও প্রতিহত হল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সুব্রত-র দিকে তাকাতে চোখ সরিয়ে নিল।

নিরুপায় হাসল একটু। তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে। শেষ হলে টেবিলে রেখে বলল, জানেন, এবার ছুটি পেতে খুব অসুবিধে হয়েছে। আফটার অল পরের গোলামী। আমি জানি না, পরের বার ঠিক এই সময়ে আসতে পারব কিনা।

রিনা উদ্বিগ্ন হল না। —বললাম তো, চাকরি ছেড়ে দিয়েই আসবি। কোলকাতায় কি চাকরি নেই? যাকগে, অনেক বেলা হল। বাথরুমে সব রাখা আছে, চটপট স্নান সেরে আয়। আমার রান্না প্রায় শেষ, খাবার বাড়ছি। কাপ-প্লেটগুলো ট্রে-তে সাজিয়ে রিনা চলে গেল।

সুব্রত-র দিকে একবার তাকিয়ে, সেখানেও কোনো আশ্বাস না পেয়ে হতাশ যুবকটি সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

সুব্রত এবার হেসে বলল, আমার কথাটাও ভাবো তুমি। তুমি তো এই একদিন, আর আমি সারাবছর ধরে অভিনয় করে যাচ্ছি। বাকি জীবনটাও এভাবে অভিনয় করে যেতে হবে, উপায় কি বল?

রিনা আবার এসেছে তাগাদা দিতে। কি হল, স্নানে গেলি না?

আমি সকালেই স্নান সেরে এসেছি।

কেমন স্থির হয়ে গোলগোল চোখে তাকাচ্ছে রিনা।—তোর কী হয়েছে বলতো? অনেক পরিবর্তন—তখন থেকে মাসীমা, মেসোমশাই, আবার বলছিস স্নান করে এসেছিস। কোথায় করলি স্নান? ট্রেনে? যাকগে খেতে চলে আয়, খাবার বেড়েছি।

রিনা আর দাঁড়াল না, চলে গেছে। হাল-ছেড়ে-দেয়া যুবকের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, আর কী হবে। চল আগে খেয়ে তো নিই, তারপর দ্যাখা যাবে। বড্ড খিদে পেয়েছে।

টেবিলে সুন্দরের জন্য খাবার সাজানো হয়েছে। মাঝখানের প্লেটে ভাত, চারপাশে গোল করে সাজানো বাটিগুলো—মুগের ডাল, পোস্ত-র বড়া সঙ্গে দুটো কাঁচালঙ্কা। লেবুর সিকিভাগ, পালংশাকের চচ্চড়ি, ভাজা তপসে মাছ, মোচার ঘণ্ট, চিংড়ির মালাইকারী, কষা মাংস, আনারসের চাটনি, দই, দুটো কড়াপাকের সন্দেশ, কয়েকটা আমের টুকরো, খোসা-ছাড়ানো মর্তমান কলা। উল্টোদিকে সুব্রত-র প্লেট, সুন্দরের মত অত কিছু না থাকলেও কিছু কিছু আছে।

টেবিলে পৌঁছে যুবকের বিস্ফারিত চোখ, এ্যাতো? আমি এতো খাই নাকি? এ যে এক সপ্তাহের খাবার!

রিনা ক্ষুব্ধ—কত পরিবর্তন দেখছি, এবছর যেন বেশীরকম? সবই তো পছন্দের জিনিস। নাকি, মা পুরনো হয়ে যাচ্ছে। এবার তবে কোলকাতায় বদলী হয়ে এসে বিয়ে কর। নতুন মুখ খুঁজে নে।

যুবক যেন দিশা খুঁজে পেয়েছে। হেসে বলল, সেই নতুন মুখ কখনো মায়ের মত হয়? বরং পুরনো মা-কে নতুন হতে হবে। বদলে যাওয়া পরিস্থিতি বুঝতে হবে তাকে।

মনে মনে প্রশংসা করে সুব্রত বলল, সুন্দর ঠিকই বলেছে? মাকেই বুঝতে হবে বর্তমান কোথায় আছে।

রিনা রেগে গিয়ে বলল, তোমাকে ফোড়ন কাটতে হবে না। মা কখনো নতুন হয় না, ছেলেও মা-র কাছে পুরনোই থাকে।

গোটা তিনেক বাটি থাকল, বাকিগুলো সরিয়ে দিয়েছে। এরপর যুবকটি ভাত ভাঙ্গছে দেখে রিনা দৃঢ় হয়ে বলল, কোনোটাই সরানো চলবে না। সব খাবি, হজমের গুলি আছে, দুটো খেয়ে শুয়ে পড়। বিকেলে চা খেতে খেতে দেখবি সব হজম হয়ে গেছে।

অবশেষে একটা রফাসূত্রে এসে যুবকটি খাওয়া শেষ করল। সোফায় বসতে হজমের গুলি ওর হাতে দিয়ে রিনা বলল, তোর ঘরে বিছানা করা আছে, শুয়ে পড়। আমি খেতে বসছি।

যুবক কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সুব্রত-র দিকে তাকিয়ে দেখল, মিটিমিটি হাসছে। বুঝল, ওখান থেকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো নেই। অতএব নিজেই মরীয়া হয়ে উঠে পড়ল। প্রথমে রিনার নির্দেশিত ঘরে গিয়ে চারপাশের দেয়ালে খুঁজল, না পেয়ে আলমারীর ডালা খুলে, তারপর টেবিলের র‍্যাক খুলে, আরো যেসব সম্ভাব্য জায়গা আছে তন্ন তন্ন করে দেখে পাশের ঘরে গেল। সম্ভবত সেটা রিনা-সুব্রত-র শোবার ঘর। সেখানেও একইভাবে খুঁজে না পেয়ে তার পাশের ঘরে যাবে, এমন সময় রিনা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী খুঁজছিস সুন্দর?

ফটোটা—টাই-পরা সুন্দরের হাসিমুখের যে ফটোটা ছিল। দেয়ালে টাঙানো দেখেছিলাম আগে।

ফটোর আজ ছুটি।

তার মানে?

তার মানে সুন্দর যখন নিজেই উপস্থিত, ফটো আজ বিশ্রাম নেবে।

কিন্তু আমি তো সুন্দর নই, আমি অনিমেষ।

বলেই রিনার দিকে তাকিয়ে অবাক—অপরূপ এক ভাস্কর্য যেন। স্থির, অচঞ্চল, আবেগমথিত, যে-কোনো সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে, —এমনই আশ্চর্য এক স্থির-স্থাপত্য! মনে মনে কেমন এক অপরাধবোধে গ্রস্ত হচ্ছে, এমন সময় স্থাপত্যটি নড়ে গেল।

আমি জানি, তুমি সুন্দর নও, তুমি অনিমেষ।

অনিমেষ অবাক হয়ে, জানেন যদি, তবে কেন এই ভুল বৃত্তান্ত!

রিনা বলেই চলেছে। আমি আরো জানি, তুমি আর সুন্দর একসঙ্গে দিল্লী যাচ্ছিলে। ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে ওর মৃত্যু হয়। সুব্রত দেখতে গিয়েছিল, মৃতদেহ সনাক্ত করেছে। আমি যাই নি। তোমাকে নিয়ে ও ফিরল। তুমিই বল, আমি কী করে বিশ্বাস করব, আমাদের পৃথিবী থেকে সুন্দর চলে গেছে?— তুমি আর সুন্দর একসঙ্গে ছিলে শেষ পর্যন্ত, সুব্রত-র সঙ্গে যখন ফিরলে, সুন্দর ছাড়া কার কথা মনে করব আমি? তাই সেদিন তোমার ভেতরে সুন্দরকেই খুঁজেছিলাম। তাতে সায় ছিল তোমার, সুব্রত-রও। সেই খোঁজা কিভাবে শেষ করব, তুমিই আজ বলে দাও।

রিনা এরপর অনিমেষের হাত ধরে টানতে টানতে বসার ঘিরে নিয়ে এল, যেখানে সুব্রত কাত হয়ে বসে আছে তখনো। ওর দিকে আঙুল তুলে বলল, ও-ই তো এসব ঘটাল, দোষ যদি দিতে হয়, ওকে দাও।

সুব্রত নিঃশব্দে রিনার দিকে চেয়ে আছে, কোনো কথা বলছে না।

অনিমেষের আবেগ অনেক স্তীমিত এখন। ধীরগলায় বলল, যা হবার তা-তো হয়ে গেছে। সুন্দরের জায়গায় আমিও তো মরতে পারতাম অথবা একসঙ্গেই। ভাগ্যের চক্রান্ত, আমাদের কিছু করার নেই। মিছিমিছি স্বপ্ন রচনা করে কী লাভ?

রিনার চোখ বিস্ফারিত। বল কী? স্বপ্ন ছাড়া পৃথিবীতে কী আছে আর? বাস্তব তো মরুভূমি, সেখানে মানুষ বাঁচে মরুদ্যান ছাড়া? তোমার ভবিষ্যৎ তোমার স্বপ্নে নেই? সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তো এগোচ্ছ। স্বপ্ন পূরণ হয় না আমিও জানি, তবুও স্বপ্ন তো দেখতেই হয়। সুব্রত আমার স্বপ্ন ভেঙ্গেছিল, আজ তুমি তা চুরমার করলে। এবার আমি কী নিয়ে বাঁচব বল তো?

অনিমেষ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। এসব কথার কোনো উত্তর নেই তার কাছে। অপরাধীর মত বলল, আমি দুঃখিত মাসীমা, এতটা আমি ভাবি নি কখনো।

তোমার দোষ নেই অনিমেষ। এটা আমার ভাগ্য, যা সুব্রত গড়ে দিয়েছে। তবু তো তুমি এই পাঁচ বছর ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছ। কতদিন আর বাঁচব বল, বড়জোর দুবছর বা তিন বছর, এভাবে কেউ বাঁচতে পারে না। তুমি আর একটু অপেক্ষা করতে পারতে।

নিজেকে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না, সেখান থেকে সহসাই দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল রিনা।

সুব্রত, যে এই ভাঙ্গনের কারিগর, নির্বাক বসে আছে। এতদিন মেরামতির চেষ্টা করে করে আজ আর অনিমেষের মুখে-চোখে সুন্দরের মুখ কিছুতেই বসাতে পারছে না। সমস্ত ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে ফেরাতে চেয়েও পারল না, বর্তমানের দেয়ালে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এখন কী করবে অনিমেষ?—পাঁচ বছর আগে দুর্ঘটনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সুন্দর— সেই থেকে তাকে ঘিরে চলচ্চিত্রের মত দৃশ্যগুলি হুড়মুড়িয়ে এসে অনিমেষের বর্তমানে জমা

হচ্ছে—সেই বর্তমানে সুন্দর আর অনিমেষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—কল্পনা ও বাস্তবে সামান্যই ভেদরেখা—তা যদি মুছে দেয়া যেতো—। ভাবতে ভাবতে সামান্য স্বস্তির আশায় সুব্রত-র দিকে তাকাল অনিমেষ।

সুব্রত বুঝতে পেরেছে। হেসে বলল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তা আর জোড়া দেয়া যায় না। সে বড় কুৎসিত।

দ্বিতীয় বর্গ

# আমি এবং সময়সূত্রে আমরা

প্রতিদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, ভাবনাচিন্তারা কাছে ঘেঁষতে পারে না। কাজেব স্রোতে ভাসতে ভাসতে সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধের পর রাত্রি, গভীর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু আজ অন্যরকম। সকাল থেকে কোনো কাজ নেই, চা খেতে খেতে খবরের কাগজের হেডলাইন, সামান্য ঝিমুনি। দুপুরে খাওয়ার পর একঘণ্টা নিরুপদ্রব ঘুম। তারপরই শরীর বেশ ঝরঝরে। জানালা খুলে দিয়ে, চেয়ার টেনে, বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে বসেছি, আর তখনই ভাবনারা এসে ভিড় করল। চিন্তারা মাছির মত এ বিষয়ে, ও বিষয়ে বসছে। আমার চারপাশে যেন ভিড় বসে গেল। সবে ভাবতে সুরু করেছিলাম, এই যে জীবনের এতটা পথ হেঁটে এসেছি, কী লাভ হল! কী চেয়েছিলাম, কী-ই বা হতে চেয়েছিলাম! অথবা কী পেয়েছি, ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু? এমন ভাবনাও ছিল, আর এগোনোর প্রয়োজন আছে কিনা। পড়ন্ত বেলায় নতুন কী-ই বা সম্ভাবনা! তবে কী থেমে যাওয়া ভাল?—এইরকম নানা ভাবনাচিন্তার ভেতরেই হঠাৎ দেখি, ভবিষ্যৎ আমার সামনে দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যাবতীয় অতীত হুড়মুড় করে বর্তমানের উপর উপচে পড়ছে। আমার বাছাবাছির প্রশ্নই যেন নেই এমনিভাবে ওরা, কাকে কোথায় বসাব, কোথায় জায়গা করে দেব বুঝতে পারছি না। ওরা এব পরোয়াও করছে না। যে যার মত আসছে, থাকছে, চলে যাচ্ছে। আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, নেহাতই দর্শকের ভূমিকায়। এদের ভেতর থেকেই সহসা বাল্যকাল উঁকি দিল।

একটা আবেশ আমাকে ছুঁয়েছে, ওর দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছি। বললাম, আমায় তুমি চিনতে পারছ? কিছুক্ষণ থমকে থেকে সে বলে উঠল, তুমি তো বুড়ো এখন।

বুড়ো! কই না তো।

না তো কি? থেমে গেছ, তাই আমায় দেখতে পেলে। আমার ভয় করছে, তোমাকে চিনতেও চাই না আমি।

ভয় কিসের! তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ, ভাবছি, নতুন করে আবার সুরু করা যায় কিনা।

ত্রস্ত বালকটি দ্রুত সরে গেল। দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আমার দৃষ্টি ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় হারিয়ে ফেলল। বাল্যকাল হারিয়ে গেলেও তার অনুষঙ্গ, তাকে ঘিরে নানা পরিবেশ, সেইসব সময়-মুহূর্তগুলি ক্রমাগত জেগে উঠছে। আমি যেন চলচ্চিত্রের মুখোমুখি। কখনো নিকটদৃশ্য কখনো দূরদৃশ্য, কখনো দ্রুতগতি কখনো ধীরগতি, বালকটির ছায়া ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। কত রাস্তা ট্রামলাইন বাস চলাচল, গলির পর গলি, গলি থেকে রাজপথ, রাজপথ থেকে আবার গলি, স্কুলের বিশাল দরজা, আটকে রেখেছে দশাসই দারোয়ান, কোনোরকমে হাতের নীচ দিয়ে গলে গিয়ে আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, কোনো-কোনোদিন নুন-মাখানো হজমিগুলি; কখনো রাস্তায় ক্যাম্বিসের বল নিয়ে, কখনো বড় মাঠে ফুটবলে লম্বা লাথি, কাঁকুড়গাছি পেরিয়ে কোথায় যেন সারি সারি গাছের নিচ দিয়ে গিয়ে যা এখন বাড়ির

পর বাড়ির ভেতরে হারিয়ে গেছে, সেখানে সাঁতরে পার হয়ে যাওয়া বিরাট দীঘি; কোনো-কোনো বিকেলে তেলেভাজার দোকানের সামনে বেগুনি, আলুর চপ হাতে, বড় রাস্তার মোড়ে ডিম ভাজা হচ্ছে, সন্ধেবেলায় নামতা পড়তে পড়তে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে পড়া সনাতনের 'ঘুগনি' ডাক, কুলপি মালাই-ই-ই; সমস্ত দিন সমস্ত বিকেল সমস্ত রাত জুড়ে সময়-কণাগুলি ছড়িয়ে পড়ছে, তাদের পার হয়ে সামনের দিকে বালকের ছায়া অনবরত ছুটছে, ছুটেই চলেছে।

সেই কখন থেকে যে সময়ের অলৌকিক ব্যবহারে গ্রস্ত হয়ে আছি! অতীতের গুহা থেকে অনর্গল এই সময়-প্রবাহ। তার অলৌকিক রেখায় কত বিচিত্র ঘটনাগুলি, আশ্চর্য সমন্বয়ে ওরা অমলগ্রথিত হয়ে আছে। বিভিন্ন মাত্রায়, সেই প্রবাহে লৌকিক নানা অঞ্চল গড়ে তুলছে, তার ভেতরে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ এক প্রদেশ। সেখান থেকে ঋজুমস্তক, উন্নত-গ্রীবার কেউ একজন দীপ্ত চোখ মেলে বলল, এমন বুড়োটে অবস্থা কেন তোমার!

আমার যৌবনের শরীর, তার সম্পন্ন মানস-চোখ চিনতে অসুবিধে হয় নি। শিরদাঁড়া-সোজা যুবকটির চোখে কেমন বিষণ্ণতা! অন্য সময়-মাত্রায় বালকটি ছোটাছুটি করছে, অথচ যুবকটির চোখে বিষাদ! আমার চোখে ঘোর লেগে আছে, ঐতিহ্য-দর্শনে যেমন মোহগ্রাস করে, বহমান সময়কে তছনছ করে দেয়। বললাম, আমার কিছু বদলায়নি তো! তোমার কেন এমন মনে হচ্ছে?

তেমনি বিষণ্ণ চোখে যুবক বলল, এখনই তোমার এমন দাঁড়িয়ে পড়ার কথা নয় তো। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে চেনার কথাও তো ছিল না। থেমে গেলে কেন! তোমাকে দেখে হতাশা গ্রাস করছে আমায়।

কিন্তু তোমাকে দেখে আমার চোখে ঘোর লেগেছে। রীতিমত উদ্বুদ্ধ। তবু কেন তোমার বিষণ্ণ চোখ!

বিষণ্ণ যুবকটি ঠিক তখনই মুখোমুখি থেকে সরে গেল। আমার চোখের দৃষ্টি থেকে লম্বরেখায় ওর ঋজু চলাচল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশে ছড়ানো অঞ্চলগুলি নিখুঁত জরিপ করে নিচ্ছে।— কোথায় কোথায় অঞ্চলগুলি, তাদের পরিবেশ, সেখানকার মানুষজন, এদের দখল নিতে হবে। থেমে থাকা নেই, অবকাশ নেই, শুধুই মরিয়া, শুধুই দখলদারী।

আমি দেখে যাচ্ছি যুবকটির ক্রমাগত অভিযান, ক্রমাগত আগ্রাসন, এক আবেগী চলচ্চিত্র যেন ঘনঘন পট পরিবর্তন করছে।

যুবকের ছায়া ঘিরে অন্য যুবকেরা। তার দীপ্ত চোখ অন্য যুবকেরা দেখছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে সে, প্রাণিত করছে অন্য যুবকদের।—সময় বড় কম, কাজ অনেক বুঝলি; সঙ্ঘ গড়ে উঠছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে।—আদর্শই সব, আর সব মিথ্যে। সঙ্ঘ প্রতীক মাত্র, থাকা-না-থাকায় কিছু এসে যায় না; বন্ধুরা জড়ো হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন বন্ধু, নতুন করে বিচ্ছেদ।—কিছু কিছু মূল্যবোধে আমি বিশ্বাস করি। যারা বিশ্বাস করে না, তারা আমার সঙ্গে নেই। শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলতে হবে, দাঁড়াতে না জানলে কিভাবে প্রতিবাদ? আলস্যে আমি একদম বিশ্বাস করি না; আঘাত আসছে সরাসরি, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেও ভাঙ্গছে না, জ্বলে উঠছে আরো দীপ্ত, শুদ্ধ হচ্ছে শাণিত হচ্ছে। প্রত্যাঘাত নেই, শুধু প্রতিরোধ।—প্রত্যাঘাত

কাপুরুষেরা করে। বীর্যবানের অস্ত্র প্রতিরোধ, আক্রমণকারীর হানি হয় তাতে। প্রতিরোধে সংহতি থাকে, প্রত্যাঘাতে শুধুই আত্মক্ষরণ;ক্রমশ প্রখর সেই যুবকের ছায়া। —এসব প্রস্তুতি মাত্র। একদিন ঠিক জ্বলে উঠব দেখিস। জন্মেছিস যখন একটা দাগ রেখে যেতে হবে, কথাটা মনে রাখিস।

সর্বত্র দেখছি এখন সেই যুবকের ছায়া। শুধু ব্যস্ত, অবকাশ নেই। শুধু চলা, থেমে থাকা নেই। শুধুই ভবিষ্যৎ, কোনো অতীত নেই।

এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে এখনো অব্যাহত আমার ব্যস্ততা, গতি। কিভাবে সেই যৌবন অতিক্রম করে, উত্তর-যৌবন পার হয়ে, প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করতে করতে কখন যে ভবিষ্যৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে অতীতমুখী, তার কোনো হদিস নেই আমার কাছে। ওরা কি দেখছে শুধু শরীর, মন দেখতে পাচ্ছে না! সময়ের সূত্রে থেকে, সময় শরীর ক্ষয় করে চলেছে, তাই দেখছে নাকি! মন তাহলে সময়-অতিক্রামী? ইচ্ছে করলে সময়ের ক্ষরণ থেকে মনকে বাঁচানো যায়! অথবা মন এই ক্ষয়িত শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে গেছে, বাইরে যত সোষ্ঠবই থাক। বালকটি বা যুবকটি তাই ধরে ফেলল বুঝি, কোনো এক রহস্যসূত্রে, সময়কে লিপ্ত না করে! হয়ত তারা মনের সেই গভীর দুর্বলতা ধরে ফেলেছে।

আমি জানি না। আমার না-জানার ভেতরে তেমন কিছু ঘটে থাকে যদি, আমার কাছে তার হদিস নেই। আমি শুধু জানি, সময় অতিক্রম করেও আমার মনের কোনো বিকৃতি হয়নি আজো। সামান্য অবকাশে যে অতীতমুখী হয়ে আছি, তা মনের বিচলন নয়, যে কোনো সময় ঘুরে দাঁড়াতে পারি। সমস্ত অতীত পেছনে ফেলে, হয়ত স্বপ্ন বা আবেগ তেমন মথিত করবে না যেভাবে গ্রস্ত আছে বালকটি, ঐ যুবকটি। কিন্তু এত সময়-সংঘর্ষের পরেও পরিশীলিত আমার চোখ, আমার মন, আমার অনুভূতি, কোনো-না-কোনো সময়ে অবশ্যই খুঁজে নেবে অন্য এক দেশ, যা আজো আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

বালককে ডেকে বলি, তোমার মত বিস্ময়-জাগানো চোখ আমার নেই। কিন্তু এই মন অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে, দ্যাখার ব্যাপারে চোখ তোমার চেয়ে অনেক গভীর। অনেক স্বপ্ন হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নির্বাচন তো হয়েছে, তা দিয়ে পরিণত প্রাসাদ নির্মাণ করা যায়, তা হতে পারে অনেক বেশী কার্যকরী। দুজনের মেলবন্ধন হোক, নতুন করে সবকিছু শুরু করা যাক।

বালকটির এসবে খেয়াল নেই। শুধু স্বপ্ন বোনা, চঞ্চল পদাঘাতে কেবলই পদস্খলন আর পদস্খলন।

যুবককে ডেকে বলি, আমি হয়ত হারিয়েছি তোমার ঋজুস্কন্ধ, নির্ভীক মন। এসবই সময়ের ক্ষরণ, বিনিময়ে পেয়েছি পরিশীলিত সহিষ্ণু মন, অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি, দৃষ্টি গভীর হয়েছে, যা তুমি অর্জন করনি। নতুন নতুন অঞ্চল অধিকারের বাসনা আমার নেই ঠিকই, তবু যে সাম্রাজ্য অধিগত আছে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি। সেখানেও তো আবিষ্কার হচ্ছে অনেক কিছু। এই সাম্রাজ্যে অনেক সম্পদ। তার ব্যবহারে নতুন পৃথিবী নির্মাণ করা যায়। আমরা যদি মেলাতে পারি তোমার বলিষ্ঠ মন, আমার পরিশীলিত দৃষ্টি, অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। সবকিছু গোড়া থেকে আবার শুরু করবে নাকি?

যুবকের দৃষ্টিতে কোনো বিচলন নেই, মগ্ন আছে নতুন নতুন অভিযানে। অনর্থক ব্যর্থ হচ্ছে, আবার গড়ছে, আবার ব্যর্থতা, আবার—

বুঝে গেছি, এসব হবার নয়। সময় শুধু এগিয়ে চলে, প্রত্যাবর্তন নেই। আজ অন্যরকম দিনে সামান্য অবকাশে যে অতীত অবারিত ছিল, জেগে উঠেছিল স্বপ্ন, অভিযান, এমনি সব আরো কত কি, হয়ত সেইসব আমারই পূর্ব-অবস্থান, তবু যেন বিযুক্তির স্বাদ লেগে আছে তাতে। সময় তাদের মলিন করে নি, ক্ষুণ্ণ করে নি, যেভাবে ক্ষয়িত হয়েছে আমার বর্তমান। তবু বর্তমান তো কোনো অবস্থান নয়, একটি অবস্থান-বিন্দু মাত্র, সে শুধু এগিয়ে চলে সরলরেখায়, অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। সেই কল্পিত সরলরেখায় গ্রথিত আছে বালকটি, যুবকটি। একসূত্রে গাঁথা আছে, মেলবন্ধন হবে না কোনদিন। হবে না যখন, যখন আমি বিযুক্ত একাকী, কেন তবে অতীত-চারণা! আমাকে এগোতে হবে সামনের দিকে, যেটুকু আবেগ, যা কিছু স্বপ্ন, যতটা দৃঢ়তা, এইসব সম্বল করে, ভবিষ্যৎ অবারিত করে এগিয়ে যেতে হবে অনিশ্চিতের দিকে, আরো সব অন্য অন্য অনাবিষ্কৃত দেশ-অভিমুখে।

# আমি ও আমার চারজন

আমার মুখোমুখি যে লোকটা বসে থাকে সবসময়, বসেই থাকে, নড়ে না, সে যে কে আমি চিনি না। 'চিনি না' বললে হয়তো ঠিক বলা হচ্ছে না, কেননা, স্মৃতির দূরতম অঞ্চ ল থেকে আজো পর্যন্ত সে এভাবেই বসে আছে, অতএব চিনি না, এ হয় না। তবুও মনে হয় চিনতে পারিনা ওকে। কেন সে ওভাবে বসে থাকে, আমি জানি না, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক বুঝতে পারি না। তবু সে বসেই থাকে, নিজে থেকে কিছু বলে না, আমার চোখে চোখ রেখে বিব্রত করে, আমার স্বাধীনতা খর্ব করে, কোথাও গেলে সঙ্গে সঙ্গে যায়, দাঁড়ালে দাঁড়ায়, বসলে বসে পড়ে, কারও সঙ্গে কথা বলতে থাকলে সতর্ক প্রহরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। 'সরে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও', এমন কথা কিছুতেই বলতে পারি না, ওর স্পষ্ট চোখে আমাকেও চোখ রেখে বসতে হয়, দাঁড়াতে হয়, অন্যের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

ওর কথা থাক, মাধুরীর কথা বলি। মাধুরী শুধুই একটা নাম, নির্দিষ্ট কোনো মেয়ে নয়, যে কোনো মেয়ে যে কোনো সময় মাধুরী হয়ে যেতে পারে। মাধুরী আমাকে ভালবাসে, স্ত্রী একথা জানে না। জানে না, এটা হয়তো ঠিক নয়, মাধুরী নামে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট মেয়েকে ও চেনে না, তাই ধরতে পারে না। স্ত্রী মনে করে, আমি ওকে ভালোবাসি না, এর কারণ, নিশ্চ য়ই মাধুরী আমাকে ভালোবাসে। স্ত্রীকে ভালো না বাসলে মাধুরী আমাকে ভালোবাসবে, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ। যে কোনো মেয়ে বাড়িতে এলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললে, ফোনে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনলে, কোনো মেয়ে চিঠি লিখলে, স্ত্রী খোঁজার চেষ্টা করে, সে মাধুরী কিনা, তবু এই আবিষ্কারটা ও কিছুতেই করে উঠতে পারে না, রেগে যায়, 'তুমি একটা পাকা শয়তান, তোমাকে চিনি না আমি? দেখতে ভালো মানুষ, আসলে হাড়বজ্জাত,' এসব উচ্চারণে তার আক্রোশ মেটাতে থাকে।

মাধুরীর কথাও থাক। সেই লোকটি বা মাধুরী, এদের রহস্য কোনোদিন বুঝে উঠতে পারব না। বরং সমরেশের কথা বলি। সমরেশ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এখনো। যদিও সে কুড়ি বছর আগেই মারা গেছে, আমার কাছে মোটেই ও মৃত নয়, ওর পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে সম্পূর্ণটাই আমার সঙ্গে রয়ে গেছে আজো। ওর সঙ্গে যখনই দ্যাখা হত, আমরা নানা কথায় মেতে উঠতাম, সেই কথা আজো হয়, অস্ফুট হলেও তা গভীর ও সঘন। আমাদের আলোচনার ধরন ছিল অন্য। আলোচনা করতাম, কিভাবে সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায়। মানুষের সংজ্ঞাও আমরা একরকম ঠিক করেছিলাম। সমরেশ গান গাইত, আমি কবিতা লিখতাম। আমার কবিতায় ভাব ছিল, ও তাতে সুর দিত। একা-মানুষ সব কিছু হতে পারে না, সবকিছু জানতে পারে না। একা-মানুষেরা পরস্পর সহযোগেই সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। অথচ বাস্তবে অন্য ঘটনা ঘটে, মানুষ সহযোগের পরিবর্তে বিয়োগ করে যাচ্ছে। একজন একা-মানুষ অন্য একা-মানুষকে ঈর্ষা করে, প্রতিযোগিতায় যায়, শোষণ করে, হিংসা করে, টেনে নামাতে চায়। ফলে

'মানুষ' শব্দটা অতিকথা হয়ে আছে। আমরা দুজনে এর বিরুদ্ধে গিয়ে আলোচনায়, আচরণে, কাজে মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করতাম। এইভাবেই সমরেশ আমার কাছে মানুষ হয়ে উঠেছিল। সমরেশ তাই মরেনি, কারণ মানুষ মরে না।

আরেকজনের কথাও অবশ্যই বলতে হবে। আমার বাবার কথা। তিনিও আজ বেঁচে নেই, পঞ্চাশ বছর আগে মারা গেছেন। আমার তখন আট বছর বয়েস, সেই প্রায়-কিশোর বালকটির কাছে তিনি যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে গেছেন, এই পঞ্চাশ বছর সময় তার কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। প্রতিদিন ভোর হবার আগে আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, তারপর নিয়ে যেতেন মাঠে। ছড়ানো মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনো কথা বলতাম না আমরা, ধীরে ধীরে ভোর হয়ে ওঠা দেখতাম, গাঢ় অনুভবের ভেতরে চলে যেতাম। কেন, কী, এসব প্রশ্ন-ব্যাতিরেকেই অনুভবটা ছড়িয়ে যেত ক্রমশ। মাঠে রোদ এসে পড়লে আমরা বাড়ি ফিরে আসতাম। বাবা বলতেন, অন্ধকার আমাদের জীবনে থাকবেই, কিভাবে তা আলো হয়ে ওঠে, এটা অনুভব করার জন্যে মানুষকে অনুশীলন করতে হয়। আলো-কে কখনো খারাপভাবে ব্যবহার করতে নেই, আলো তখন আর আলো থাকে না, অন্ধকারও হয়ে যায় না, কেমন যেন বিশ্রী মেটে রঙ। যেদিন ঠিকমত আলোর ব্যবহার হবে না, সন্ধেবেলায় হাঁটতে হাঁটতে, একা একা, আলোটাকে ধূসর করে, তারপর পৌঁছে দেবে অন্ধকারের কাছে। ঈশ্বর আমাদের এই আলো-অন্ধকার দিয়েছেন অনুশীলনের জন্যে, এরা প্রতীক, এই প্রতীকের সাহায্যেই ক্রমশ নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে, নিজেকে আবিষ্কার করাই তো মানুষের একমাত্র কাজ।

আমি ও এই চারজন মিলে আমার নিজস্ব পৃথিবী। সেখানে পারস্পরিক থেকে আমরা নানাভাবে পৃথিবীটা সাজাই, রঙিন করে তুলি, গভীর চিন্তার বুননে মজবুত করি, লড়বার সামর্থ দিই। সবসময় একমত থাকি এমন নয়, পরস্পর কাটাকুটি করি, তবু শেষ পর্যন্ত একটা সংহত চেহারা থাকে, বিশেষত, যখন বাইরের পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হয়। বাবার নির্দিষ্ট করা লক্ষ্যে স্থির থেকে যখন এগোই নানা কাজের মধ্যে, অন্যদের সঙ্গে আচরণে, বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিময় ঘটবার সময়, আমি ও সমরেশ যৌথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করি, কাজটা ঠিক হল কি হল না, মানুষের সঙ্গে না অমানুষের সঙ্গে এই ব্যবহার হল, বিনিময়ের আদৌ প্রয়োজন ছিল কিনা। এইরকম প্রতি মুহূর্তের চলাফেরায় মুখোমুখি লোকটা সতর্ক থাকে, উত্তেজিত হয়ে উঠলে প্রশমিত করে, অলস হয়ে পড়লে সক্রিয় করে, আবেগকে নিষ্প্রভ করে, বিকৃতি ঘটতে থাকলে নিবৃত্ত করে,—আমি যেন ঠিক স্বাধীন নই, নিয়তিবদ্ধ ;একমাত্র মাধুরীই তখন আমাকে মুক্তি দেয়, বাইরের পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে ওর সঙ্গে চলাফেরা করি, ওর কাছ থেকে স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা নিয়ে অন্যদের দিই, অন্যদের থেকে পেলে আবার মাধুরীকে ফিরিয়ে দিই। আমার মধ্যে ভালোবাসার ভারসাম্য এভাবেই বজায় থাকে। একমাত্র মাধুরী থাকে বলেই বাইরের পৃথিবী আজো আমাকে আকর্ষণ করে।

সমরেশ আমাকে তার গভীর বন্ধুত্ব দিয়ে মানুষকে চিনিয়েছে। মানুষ দেখে যখনই ব্যথিত হয়েছি, বলেছে, চিনতে ভুল করছিস, ও মানুষ নয় এখনো, মানুষ হবার জন্যে এগোতেও পারেনি, ও নেহাৎই একা-মানুষ মাত্র, ভেতরে ভেতরে মানুষ হবার জন্যে প্রবল ইচ্ছে যদিও,

পারিপার্শ্বিকের চাপে নির্যাতিত হয়ে আছে। ওকে সময় দেয়া দরকার, যেদিন মানুষের ধারাবাহিকতা ও বুঝতে পারবে, সেদিন আর ভয় পাবে না। আমরা সকলেই তো কখনো কখনো একা-মানুষ হয়ে পড়ি, ভয় পাই, বিষণ্ণ হই, এক একটা সময় আসে যখন একা-মানুষেরা আবার মানুষ হয়ে ওঠে, মানুষের ইতিহাসে অংশ নেয়। কেন এভাবে একা-মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়, আবার ফিরে যায় মানুষের কাছে, এর রহস্য কোনোদিনই আমরা বুঝে উঠতে পারব না, তবু আমাদের সতর্ক হতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি তাই সবসময় সতর্ক থাকি, বাবার অমোঘ উপদেশগুলি আমাকে সেই মানসিক স্থাপত্য দিয়েছে। নিয়মিত আলো ও অন্ধকারের অনুশীলন করি— আলো যেন তার উজ্জ্বলতা না হারায়, পারিপার্শ্বিকের ব্যবহারে যদি ম্লান হয়, বিশ্রী মেটে রঙ ধরার আগেই অন্ধকারের কাছে সমর্পণ করি। মৃত্যুর সমার্থক এই অন্ধকারের ভেতরে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তখনই তো নিরপেক্ষভাবে জীবনকে বুঝে নিতে পারা যায়, জীবনকে এইভাবে বুঝে নিয়ে আলোয় তুলে ধরি ফের, নতুন করে শুরু হয় জীবনকে মহিমান্বিত করা। মৃত্যু থেকে উৎপন্ন এই জীবন, আলোকোজ্জ্বল এই জীবনস্রোতে মানুষ কেমন অবলীলায় ভেসে চলেছে, দেখতে দেখতে আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য আমি বুঝতে পারি, ইতিহাস সরাসরি প্রত্যক্ষ হয়, ইতিহাসে স্থানরা, ইতিহাসের চলমানতা, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, এদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করি।

তবু সেই লোকটি, যে সর্বদাই লক্ষ্য রাখছে, যে আমার মুখোমুখি সবসময়, আমি তার চোখদুটো কিছুতেই এড়াতে পারি না। প্রতিটি কাজের সময়, ভাবনার সময়, সিদ্ধান্ত নেবার সময় তার চোখের দিকে আমার চোখ চলে যায়। কখনো দেখি ভ্রূ কুঁচকে আছে, কখনো না-ভঙ্গি, কখনো বা স্মিত চোখে আমার কাজে ভাবনায় সিদ্ধান্তে ওর মতামত ব্যক্ত করে। আমাকে সেইভাবে চলতেই হয়, মানসিক স্থাপত্যের ভারসাম্য তাই ঠিকঠাক থাকে। কখনো যদি ঐ চোখদুটোকে অগ্রাহ্য করি, লক্ষ্য করেছি, কাজকর্মে সমতা থাকে না, ভাবনায় গ্রন্থি পড়ে, সিদ্ধান্ত কিছুতেই নিতে পারি না। তখন আবার খুঁজে নিতে হয় চোখদুটো, সাম্য ফিরে আসে। এমন ওতপ্রোত সেই লোকটা, তার চোখদুটো, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, একে বিচ্ছিন্ন করা যায় না? যেমন আয়নায় নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেললে, আয়না না থাকলে নিজেকে ঠিক বুঝতেই পারি না শরীর ঠিক আছে কিনা, কোথাও অসংগতি আছে কিনা, তবুও তো আয়না না থাকলে একরকম চলাচল চলতে থাকে, কিন্তু এই আয়নায় নিজেকে এমন অভ্যস্ত করেছি, না থাকলে অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এটা কি মায়া-আয়না! যার থেকে মুক্তি নেই আমার? একবার চেষ্টা করেছিলাম, ক্রমে আত্মসংহত হতে হতে, হতে হতে...., তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি যখন, আর নিজেকে খুঁজে পাই না, বাইরের পৃথিবীতে চলাচলের সাধ্য নেই। মায়া-আয়না ফিরিয়ে আনি তখন, নিজের সুস্থিতি ফিরে আসে।

এইভাবে আমাকে ওরা লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখতে, মানসিক কাঠামোর ভারসাম্য বজায় থাকতে, নিজের প্রতি আস্থা আনতে সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে সারাৎসার খুঁজে নিতে মাধুরীকে আমার চাই। মাধুরীকে আমি ভালোবাসি কিনা আজো বুঝতে পারিনি, কিন্তু মাধুরী আমাকে ভালোবাসে, জীবনের সারাৎসার বুঝে নিতে সাহায্য করে, উদ্দীপ্ত করে, এটা

আমি বুঝতে পেরেছি। মাধুরী বলে, তোমার মন আছে, এই পৃথিবীতে সৃষ্টি না করলে তুমি বাঁচবে না, কেউই বাঁচতে পারে না। যা কিছু দেখছ চোখের সামনে, আভাসমাত্র, তোমার মনের মত তাকে সৃষ্টি কর, সাজিয়ে নাও, ব্যবহার কর। তুমি যেখানে চাইবে আমি সেখানেই জ্বলে উঠব, এভাবেই সাহায্য করব তোমার সৃষ্টিকর্মে। সেজন্যেই তো আছি, একান্তই তোমার হয়ে এসেছি। আমি ওর কথা বুঝতে পারি না, আমি শুধু জানি, আমার মাধুরী আছে, কোনো বিনিময় চায় না, শুধু হয়ে উঠতে চায়, আমি যেভাবে চাই, সেভাবে।—কর্কশতা দূর করতে ধূসরতা, বিবর্ণতা মুছে দিতে অকৃপণ রঙ, স্বপ্ন তৈরী করতে দেশকালের যথেচ্ছ ব্যবহারক্ষমতা। ও আমাকে সময়ের ব্যবহার শিখিয়েছে, যে সময় নিয়তির মত এগিয়ে নিয়ে যায়। ওর কাছে সময়ের ব্যবহার শিখেই প্রতিবাদী হয়েছি আমি, বাইরের পৃথিবীকে নিয়তি থেকে মুক্ত করতে মাধুরী আমাকে এইভাবে শিল্পী করেছে।

দীর্ঘকাল ধরে এই পৃথিবী আমার শরীর ব্যবহার করেছে, ব্যবহৃত হতে দিয়েছি আমি। সময়ের যে নির্দেশে এই পৃথিবী চলমান, সেই নির্দেশেই শরীরের ব্যবহার হয়েছে এতদিন। সময় ঘোষণা করেছে, এরপর শুধু ক্ষয়। সঞ্চয়ের পর্ব শেষ হয়েছে অনেকদিন, মাঝে কিছুকাল স্থিতাবস্থায় থেকে এখন শুধু ক্ষয়ের জন্যে। একে একে যন্ত্রের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, কিছুকাল পর যন্ত্রগুলি একের পর এক অচল হবে, যে শরীর পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে দিব্যঘোষণা করেছে একদিন, এবার তার অস্তমিত হবার পালা। সময়ের এই বিধান না মেনে শরীরের উপায় নেই।

তবুও আমি ভেতরের পৃথিবীতে প্রতিবাদী। সময়ের এই বিধান অগ্রাহ্য করে চলায় আমার দৃপ্তভঙ্গি। আমি শিল্পী, সময়ের অন্য ব্যবহার জানি, নতুন করে সৃষ্টি করি পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে। এই লড়াইতে আমি একা নই, আমার সঙ্গে আমার চারজন। বাবার কাছে যে লক্ষ্যের হদিস পেয়েছিলাম, সেই লোকটা, যে সর্বদা তার সজাগ দৃষ্টিতে সেইদিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সমরেশের সঙ্গে সহযোগে যাবতীয় একা-মানুষদের ব্যবহৃত হওয়া লক্ষ্য করি, তাদের ভেতর থেকে মানুষকে খুঁজে পাবার জন্যে অনুশীলন করি, আবিষ্কার করি। যখনই যা কিছু বিবর্ণ হয়ে যায়, দুহাত মেলে মাধুরী সেই গ্রাস থেকে রক্ষা করে, তার ভালোবাসা আমাকে অবসাদ থেকে উন্নত করে। মানুষ যেমন মরে না, শিল্পীরও মৃত্যু হয় না। অনশ্বর শিল্পী আমি, এই বিশ্বাসে অনন্তকাল হাঁটব, সময়ের সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করব আমি।

# দ্বন্দ্বযুদ্ধ

আমার ঘরে প্রতিদিন বিকেলবেলায় যে ইজিচেয়ারটায় বসি, তার সামনে চওড়া জানালা। ফ্রেমের মাঝখানে একটা কাঠের দন্ড লম্বভাবে জানালাটা দু'ভাগ করেছে। দুটো ভাগে দুটো লোহার গ্রীল, একই শৈলীর। শিল্পীকে তারিফ করতে হয়। ইজিচেয়ারে বসে বাইরে দেখলে আকাশ অনাহত থাকে না, তাতে ছন্দ এসে অন্য মাত্রা দেয়। দুদিকে গ্রীলের মাঝখানে দুটো বৃত্ত। তাকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঢেউ ছড়িয়ে, তাতে ফেনার মত ভেসে আছে খয়েরী, নীল, সবুজ ফুলগুলি। এইরকম গ্রীলের ভেতর দিয়ে দ্যাখা আকাশ মুক্তি দেয় না, কিন্তু একটা সম্মোহ এসে খন্ড দৃশ্য-জগৎকে মায়াময় করে।

প্রতিদিনই ইজিচেয়ারটায় বসি। আজ বসে জানালায় চোখ রাখতে অন্যরকম। জানালার সম্মোহন আমার মুখের ওপরে ক্রমশই গাঢ় ও গভীর। মুখমন্ডলের প্রসৃতি জানালায় মিশে অথবা জানালার প্রসৃতি আমার মুখমণ্ডলে, স্পষ্ট করে কিছু বোঝার আগেই মনে হল, লম্বভাবে বিভাজক দন্ডটি যেন আমার নাক, তার দু'পাশে বিভক্ত জানালার অংশদুটো চোখ। গ্রীলের দুটো বৃত্ত চোখের মণিদুটোয় মিশে গ্রীলের বাকি সমস্তটাই অক্ষিগোলকের স্নায়ুশিরাময়।

ঘরের ভেতরে না থেকে সমস্ত ঘরটাই কি আমি? এখন আমার সামনে সম্পূর্ণ আকাশ অনাবৃত!

অনেক দূরে কিছু কিছু স্থবির নানা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে, মাঝখানে অবাধ প্রসারণ, স্বতঃস্ফূর্ত আকাশ। আমরা জানি, দূরত্ব সময়কে প্রসারিত করে, প্রসারিত করে মায়া। তাই দূরবর্তী স্থবিরগুলি আকাশের মায়ায় অধ্যস্ত হয়ে, ঘরের ভেতরে ইজিচেয়ারটা আছে কি নেই, অন্যান্য আসবাব কোথায় কিভাবে যে, এখন এই ঘরটাই আমি। অনন্ত আকাশের ভেতরে কেমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে, এই দাঁড়িয়ে থাকার সারাৎসার খুঁজতে খুঁজতে ক্রমশ আমার শূন্য মানসভূমি ভরে উঠছে। কোন অলক্ষ্য থেকে, কোন গোপন গুহা থেকে, কোন সুদূর থেকে চকিতে ছুটে এসে, এমন কি স্বতপ্রকাশেও গড়ে উঠে নানা দৃশ্যকল্প, নানা ঘটনাচরিত্র, কিছু কিছু বাক্যবন্ধ, বিচিত্র পরিবেশ, মানসভূমিতে গড়ে তুলছে অন্য এক পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে অবিকল আমার হারানো শৈশব, আহত যৌবন, পরাজিত প্রৌঢ়, এরা সব কোনো সময়ের ব্যবধানে নেই, মুখোমুখি। কখনো ওতপ্রোত, কখনো একে অন্যকে ভেদ করে, যেন এক বিচিত্র আশ্লেষে সংগঠিত সবাই।

এই যে প্রায় নিমেষে গড়ে-ওঠা পৃথিবী, তা আমিই সৃষ্টি করছি। এবং আমিই যেহেতু তার মূল উপাদান, কেমন যেন হয়েছে গড়নটা! ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ এসবের গাঢ় রঙ নেই, কোথাও হাল্কা আভাসে কিছু অবশেষ রয়ে গেছে মাত্র। ফলে জটিলতা নেই, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, ক্ষোভ নেই, ভাল করে পরিষ্কার হওয়া কাপড়ের মত নির্মল হাসিতে উড়ছে মানসভূমিতে। এই পৃথিবী কঠিন পীড়াদায়কও নয় আর, অবলীলায় এমনই গড়ে তুলেছি আমি!

আসলে গড়ে তুলেছি নয়, গড়ে উঠেছে এই পৃথিবী। এবার নতুন করে গড়তে হবে। এখন আমি একমাত্রিক নই, তিনটি পরিচ্ছিন্ন সত্তার ত্রিমাত্রিক আমার আমি। প্রথম সত্তাটি ফেলে এসেছি পেছনে, কিভাবে তার অবস্থান জানি না, তবু তার পরোক্ষ চাপ আছেই, আমাকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছে। দ্বিতীয় সত্তাটি সচল রয়েছে এখানো, নির্মাণ হতে দেখছে অবলীলায় গড়ে-ওঠা পৃথিবীটা। বোঝা যাচ্ছে, পুরনো পৃথিবীর কিছু কিছু অংশ পরিস্রুত হয়ে তার উপাদান। এখানেও সময় সেই নিয়ামক। আমার তৃতীয় সত্তাটি উদ্বোধিত হচ্ছে, অবলীলা-পৃথিবীকে নতুন গড়ন দিতে হবে। এই কারণেই ঘরের ভেতরে বন্দী-আমি-র ঘর হয়ে ওঠা, আকাশের মুখোমুখি হওয়া।

স্মৃতি সময়ের অন্য ব্যবহার জানে। জীবনের অনাবশ্যক, অপ্রাসঙ্গিক যা-কিছু, যা হয়ত জীবনের কোনো না কোনোভাবে অনুষঙ্গও, স্মৃতি সেখান থেকে নির্বাচন করে। নির্বাচিত না-হওয়া অন্যেরা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত সময় ঝরে যায়, হয়ত কোনো অলৌকিকে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা কোনোদিন ফিরে আসে কিনা, আসতে পারে না-ও আসতে পারে, কিন্তু বর্তমান ভূমিকায় এসব অপ্রাসঙ্গিক। এত সমূহ ঘটনা, চরিত্র, দৃশ্যকল্পের ভেতরে যারা নির্বাচিত, তাদের পারস্পরিকতায় গড়ে উঠছে যে পৃথিবী, তাকে নতুন করে গড়ব বলে অপেক্ষায় তারা, সেখানে বহমানতার ভেতরে আমার মন আলো ফেলে ফেলে খুঁজে নিচ্ছে গড়নের বিষয়গুলি, কেননা নিজস্ব পৃথিবী নির্মাণের জন্য এর ভেতর থেকেই নির্বাচন করতে হবে।

ঐ যে মুখচোরা বর্ণহীন বালকটি, বসে আছে বাক্যহীন, চারপাশে তুমুল হট্টগোলের ভেতরে নির্বিকার।—প্রথমেই তাকে খুঁজে পেয়েছে। কেন সে একা! পিছিয়ে পড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে আছে, তবু যুক্ততা নেই, সে যেন কোলাহলের ভেতরে অন্তঃসার হয়ে। সমবয়েসী আরো অনেকে, যারা স্পষ্ট, কেউ আভাসমাত্র। অধিকাংশ স্বাতন্ত্রহীন মুখগুলির ভেতরে ঐ নির্বিকার মুখটিই উজ্জ্বলতা নিয়ে। কারো মনোযোগের ভেতরে নেই, নিজের প্রতি মনোযোগে আত্মস্থ, কারো ওপর ভার রাখে না, কারো কাছ থেকে চাইবারও নেই কিছু। আমার মন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না তার সারাৎসার, এই রহস্যই মনকে প্ররোচিত করছে নতুন করে সৃষ্টি করার জন্যে।

এরপরই দৃশ্যমান সপ্রতিভ যুবকটি। স্পষ্ট উচ্চারণে, দিব্য ঘোষণায়, সার্বিক অংশগ্রহণে, চতুর্দিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলনে রীতিমত বর্ণময় যুবকটি এখন। চলাফেরায় ঋজুতা, চিন্তাভাবনায় অনাবিল ঐশ্বর্য, অনন্ত জিজ্ঞাসায় দীপ্ত যুবকটির চারপাশে গ্রহ-উপগ্রহেরা ভিড় করে আছে। মধ্যবর্তী সময় কোন রসায়নে বর্ণহীনকে এইভাবে বর্ণময় করেছে! কোনো হদিস না রেখে সেই সময় আশ্রয় নিয়েছে অলৌকিকে। রহস্যময় সেই রসায়ন মনকে উদ্বুদ্ধ করছে এখন তার সৃষ্টিকল্পের উৎসারণে।

স্মৃতির আরো আশ্চর্য সময়-ব্যবহারে বর্ণময় যুবকটি আর নেই। প্রৌঢ়টি এত দ্রুত সেই অবস্থানে, মন রীতিমত বিভ্রান্ত। সমস্ত রঙ অদ্ভুত এক যৌগের ভেতরে, বিশ্রী তামাটে তার রঙ। স্তিমিত উচ্চারণ, চলাফেরায় মেদুরতা, ঘিরে-থাকা সমস্ত মুখ ফিরে গেছে, গ্রহ-উপগ্রহ সরে গেছে অন্য কক্ষপথে কিংবা অলৌকিকে। সে অর্থে বর্ণহীন নয় তবু কোলাহলের ভেতরে নীরবতায়। কী চায় সে! কিভাবে বিবর্তন, তার হদিস নেই। অতীত সঙ্গে নিয়ে গেছে ঝরে-

যাওয়া সময়গুলি, মনের কাছে জমা করেছে রহস্য! নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে মন যে অভিযানে নেমেছে, বিষয়ের অন্বেষণে তার আলো পড়েছে সেইসব সন্ধিস্থলে, যেখানে সময়ের গ্রন্থি নেই, রসায়নের বিবর্তন-পর্যায়গুলি ঝরে গেছে। জমা রেখেছে শুধুই রহস্য যা মনকে প্রকৃতই উদ্দীপ্ত করছে এখন।

অতএব একদা আমার যে একটা ঘর ছিল, ঘরের ভেতরে আশ্রয় ছিল, এখন আমি নিজেই ঘর হয়ে আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে আছি। আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়ে আকাশেরই মুখোমুখি, সেখানে প্রতিফলিত আমার অতীত-ছায়ারা। মন নির্বাচন করছে, যেটুকু অংশবিশেষে, সময়ের ঘর্ষণ থেকে স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের ভেতর থেকে।

সেই অতীত-ছায়ারা, শৈশবের, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, ধীর বিবর্তনে প্রকৃতির সঙ্গে গ্রহণ-বর্জনের সম্পর্ক নিয়ে আমার বর্তমানে এসে, কী সেই সাধারণ সূত্র বা দেখে চিনে নিতে পারি! যদিও শরীরের বিবর্তন অনিবার্য, অনেক বেশী দ্রুতগামী মনেরও কি বিবর্তন ঘটে, বিবর্তন-শৈলী বদলে যায়, শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না! মনের কোনো জৈবিক-মাত্রা সম্পর্কে জানি না, যেমন আত্মার স্বরূপ আমরা জানি না, ধারণা করি মাত্র। অতএব আত্মার মত মনেরও বিবর্তন হওযার কথা নয়। যেমন অধ্যাত্মবাদীরা বলেন, জৈবিক সত্তা আত্মার ওপর মলিন ছায়া ফেলে, শরীরের বিবর্তনও মনের ওপর তেমনই কোনো ছায়া ফেলে হয়ত, মনের এতে কোনো পরিবর্তন হয় না। এমন হতেই পারে, হয়ত সেই কারণেই অতীতের ছায়াগুলি অব্যক্ত মনের সূত্র ধরে আমাতে পৌঁছে, নিজেই তাদের নির্বাচন করেছে।

এখন আমার এই অবস্থানে মন কি করবে জানি না। মন যখন সৃষ্টিকর্মে থাকে, আমরা তার অনুসরণ করি মাত্র। দেখতে চেষ্টা করছি, নির্বিকার সেই বালকটি, বর্ণহীন তার চেহারা, নিরুচ্চার, ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে ভিড়ের ভেতরে বসে থেকে, তার মন কী করছিল তখন! কোন বিষয় কীভাবেই বা সৃষ্টি করছিল! চারপাশে কোলাহলের খোলস চুরমার করে কী ছিল তার অন্তঃসার? সেই মনের ওপর কোলাহল অনর্থক তার স্রোত বইয়ে দিয়ে নিজেই টুকরো টুকরো হয়ে, তার অন্তঃসার নির্বাচন করে মন কি সেই সময় নিজেকে সমর্থ করে নিচ্ছিল? কেননা তাকে তো এগিয়ে যেতে হবে সদর্থক লক্ষ্যের দিকে। তার মনের এই সৃজনশীলতা চারপাশে কেউ টের পায়নি, এটা হয়ত তাকে স্বস্তিই দিচ্ছিল। কিন্তু এসব তো অনিবার্য অনুষঙ্গ, সেই বিচ্ছিন্নতায় চারপাশ থেকে জড়ো হয়েছিল অনেক কৌতুক, উপহাস, ব্যঙ্গ, এমনি আরো কত কি। এসব তার উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে রাখার কথা, মন অবশ্যই তা জানে। স্মৃতি ঝরিয়ে দিলেও মন তাকে উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু মন নিজের মত নির্বাচন করছে, আমার কিছু করার নেই।

ক্রমশ আরো দেখছি, বিস্তর সময় উপেক্ষা করে মুহূর্তে সেই বর্ণহীন বালক বর্ণময় ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে, তার চারপাশে কৌতুক, উপহাস, ব্যঙ্গ বদলে গেছে কৌতূহলে। একই মনে, যে খোলসে আবদ্ধ ছিল এতদিন, খোলস ভেঙ্গে দখল নিতে চায় সবকিছুর। তার সৃষ্টিতে যাবতীয় মাত্রাবদল ঘটছে, আবেগ উত্তেজনা তুচ্ছ করছে যাবতীয় দ্বিধা, সংকোচ, কূপমন্ডুকতা। মনের এই সৃষ্টি-উল্লাস যেন দীর্ঘ প্রস্তুতির পর সহসাই এক বিজয়-অভিযান। কতদূর যেতে পারে এই বর্ণময় যৌবন! তার সারথি-মন, অস্ফুটে নয়, প্রকাশ্যেই তার রথ চালনা করছে

আগামী-সম্ভাবনার দিকে। এর স্বতঃপ্রকাশ তার উদ্দীপ্ত মুখে, ঋজু হাঁটাচলায়, স্পষ্ট বাক-ভঙ্গীতে। এইভাবে অগ্রগামী সেই বর্ণময় যুবক এগিয়ে চলেছে, যাচ্ছে, যেতে যেতে সহসাই তার চলা শ্লথ, বাকভঙ্গী সংযত, মুখে চাপা তামাটে আভা।

সময়ের এই অলৌকিক ব্যবহার বুঝে নিয়ে জেনে গেছি মনের অন্তঃসারও। তাই প্রৌঢ়কে স্পষ্ট চিনতে পারা যায়, মুখোমুখি হওয়া যায়। বোঝা যায়, বর্ণময় যৌবনের সেই সারথি-মন তার রশি সংযত করেছে, নিভৃতে বসে যাবতীয় হদিস জেনে নিতে চায় সে। উজ্জ্বল দিনের শেষে পড়ন্ত বেলার দিকে তার চোখ। সে কি খুঁজে পেতে চায় শৈশবের বর্ণহীন নির্বিকার বালকটিকে! হয়ত বা। বর্ণময়তার আবেগ কোথাও কি তাকে পৌঁছে দিতে পেরেছে! এর হদিস যদি থাকে, লোকটির কেন দেয়ালে পিঠ! হয়ত ফিরে দেখতে হয় শৈশবের দিকে, মনের হদিস খুঁজে পেতে হয়। বৃত্তময় পুনরাবর্তন অনন্ত পথের নির্দেশ করে তাই কি দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রৌঢ়? এখন তার নিজের অবস্থান, দূরবর্তী শৈশবকাল, মাঝখানে বর্ণময় গতিময়তা, এরা একসূত্রে গাঁথা হয়ে মন কিভাবে এর সন্ধি রচনা করছে, ভাবতে থাকি আমি।

এখন আমি এই ঘর, মুখোমুখি আকাশ, সেই অলৌকিক আকাশে স্মৃতি থেকে উৎসারিত দৃশ্যবন্ধ দেখে ভাবতে ভাবতে, আমার মন ওদের সম-সূত্রে গাঁথা মনটিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। একই নামে নির্দিষ্ট ঐ তিন ব্যক্তিত্ব, তাদের রূপ কিছু কিছু বদলেছে, যদিও ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। এদের যে বদল ঘটেছে, প্রকৃতির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার স্বতঃনিয়ম অনুসারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মূলে যে সংগঠক অর্থাৎ সময়, এই সময়-নামক ধারণাটি কোনো অস্তিত্ব না রেখেও অনির্বাচনীয়ভাবে ক্রিয়াশীল। অলৌকিক সময় এই লৌকিক পৃথিবীতে শুধু তার চিহ্ন রেখে যায়, সে সর্বদা অগ্রগামী, কারো অপেক্ষা করে না, নির্মম, সর্বদা পীড়ন করে, নিজে কখনো পীড়িত হয় না। তার নানা চিহ্ন দেখে পৃথিবীর ভেতরে পারস্পরিকতা বজায় থাকে, যেমন ঐ নির্বিকার ছেলেটির বয়েস বারো বছর, অথবা বর্ণময় ঐ যুবক, তার বয়েস তিরিশ, আর ঐ যে প্রৌঢ়ের তামাটে মুখ, তার বয়েস পঞ্চাশ। বারো, তিরিশ আর পঞ্চাশ এই তিনটে চিহ্ন জুড়ে দিলে যে সরলরেখা, তা তো সময় নয়, সময়ের এই লৌকিক অবস্থান নেই। আসলে তিনটি চিহ্নকে ঘিরে সময়ের যে অলৌকিক বলয় তাকেই তো অস্তিত্ব বলছি, যা এক ধারাবাহিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সময়ের এই চিহ্নগ্রন্থিগুলো যুক্ত হলে তবে সেই ধারাবাহিকতা জানতে পারি। তা সরলরেখা অবশ্যই, গ্রন্থির পর গ্রন্থি ছুঁয়ে সময়কে অনুসরণ করতে থাকে। ধরা যাক, ঐ অস্তিত্বটির নাম বিভাস, তার বালকবয়েস, যুবকবয়েস ও প্রৌঢ়বয়েস যথাক্রমে বারো, তিরিশ ও পঞ্চাশ। বিভাসের মন ঐ সরলরেখা, তার তিনটি অবস্থান ছুঁয়ে ক্রমাগত সময়কে অনুসরণ করে চলেছে।

এখন আমি এই ঘর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঘরের ভেতরের পূর্ব-অবস্থান অতিক্রম করে আকাশের মুখোমুখি হবার জন্যে। সেখানে বিভাসকেই খুঁজে চলেছি, —তার পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বগুলি। তাদের যোগসূত্রে যে মন এতকাল ক্রমাগত পৃথিবীগুলি সৃষ্টি করে চলেছিল, এখন আমি ঘরের পূর্ব-অবস্থান ভুলে, সেইসব পৃথিবী ছাড়িয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার জন্যে সৃষ্টিশীল। অথচ এই নতুন পৃথিবী আগের পৃথিবীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছে না, কেননা আমার মন, সেই সরলরেখার বাইরে যেন তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সে আমার সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণে, একথাও বলতে পারি না। সে শুধু সৃষ্টি করে, আমাকে অন্তর্গত করে, সর্বদা তরুণ, সময়কে অনুসরণ করে না, তার পীড়ন গ্রহণ করে না, যথেচ্ছ গতি নিয়ে সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যায়। অসহায় আমাকে শুধু মন আর সময়ের যুদ্ধ দেখে যেতে হয়, পুরনো পৃথিবীর পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

এমন অসহায় অবস্থানে, যারা ক্রমাগত ঐ পৃথিবীগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই মন আর সময়, ওরা কেউ আমার নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং আমাকেই বন্দী করে রেখেছে, কোনোদিন মুক্তি দেবে না, যেন সমস্ত জীবন তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখে যেতে হবে, শুধুমাত্র দর্শক। তবে কেন ঘরের ভেতরটা অতিক্রম করে এই ঘর হয়ে ওঠা! বরং এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মনের পক্ষ নেয়া ভাল। কেননা, সময় সৃষ্টি করেছে বিভাসকে, তার পরিচ্ছিন্ন সত্তাগুলি। সময়ের ক্রীড়নক হতে চাই না আমি। বিভাসের জগৎটা, তার যাবতীয় কারুকর্ম ভেঙে ফেলে আমাকে সৃষ্টি করতে হবে অন্য পৃথিবী, অন্য বিভাস, অতএব সময়ের প্রতিযোগী হতে হবে, তার সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আমার এবং মন তখন একান্ত সহযোগী হবে এই সৃষ্টিকর্মে। একজন শিল্পীর কাছে এছাড়া অন্য পথ নেই, কেননা একমাত্র সে-ই পারে সৃষ্টির জন্যে নিজেকেও অতিক্রম করে যেতে।

# পঞ্চ তন্ত্র

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যখনই ভাবি, দেখতে পাই এমন ছত্রাকার অবস্থায়! তবুও আশ্চর্য, অতীত ও ভবিষ্যতের সূত্র হয়ে, তার মাঝখানে আমার বর্তমানকে সে ঝুলিয়ে রেখেছে। তার স্থিতিস্থাপকতা দেখেও আমি অবাক। এই রহস্য বোঝার জন্যে, এই গতিময় স্থিতিস্থাপকতা কোন শৈলীতে আমার অস্তিত্বকে চলমান রাখে, তার খোঁজে গভীরে প্রবেশ করি।

দেখি, সংসার যেখানে সাজানো আছে, তা একটি অগ্নিকুন্ড। তার স্তরে স্তরে অগ্নিবলয়। ঐ লোকটি, যার নাম ভোগীচরণ, দীপ্ত আনন যার, পরতে পরতে ক্রমাগত তাকে ঝলসানো হচ্ছে, আরো দীপ্ত হচ্ছে ওর ক্লান্তি। ভোগীচরণ এই ঝলসানো বোঝে না, সে বোঝে আগুন একমাত্র আশ্রয়, যাবতীয় শক্তি নিষ্কাশিত করে, অগ্নিই সেই বাহন যে সমস্ত প্রার্থনা পৌঁছে দিতে পারে, যা ফিরে আসবে সিদ্ধি হয়ে। এভাবেই বেঁচে আছে ভোগীচরণ, ছোট থেকে বড় হয়ে যুবক, এখন প্রৌঢ়, এভাবেই বেঁচে থাকবে বাকি জীবনটা, অন্য কিছু সে ভাবতে পারে না।

আর একজনকে দেখি, গলায় তার উত্তরীয়, সংসারের পিঠের ওপর আসন করে বসে আছে। ওর নাম যোগীচরণ। চোখদুটো ছাড়া বিশেষ দীপ্তি নেই ওর মুখে, শরীরে। সংসারের অভ্যন্তর ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের মুখোমুখি, নিয়ত শুভচিন্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বময়। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-ঊর্ধ্ব-অধঃ-র দিকে। যোগীচরণ ও ভোগীচরণ মানসিক যোগাযোগে প্রায় নেই, ভিন্ন মাত্রায় ওদের চলাচল। আমি কখনো ভোগীচরণকে দেখি, ওর সঙ্গে কথা বলি, কখনো দেখি যোগীচরণকে, ওকে বোঝার চেষ্টা করি। ভোগীচরণ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন আমি আশ্রয় নিই যোগীচরণের কাছে। কিন্তু সে উদাসীন থাকে, বরং ভোগীচরণের আবেগ আমাকে বার বার ছুঁয়ে যায়, কখনো আপ্লুত হই, কখনো অতিক্রম করে যাই।

এদের দুজনকে কেন্দ্র করে আরো দুজন, অর্কপ্রভ ও মাধুরী, দুদিক থেকে ক্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে। এই দোলাচলের ভেতরেও ভারসাম্য বজায় রাখি। কখন কার অধীনে থাকি, বুঝতে পারি না। বিপরীত শক্তি যখন আক্রমণ করে, দ্বিমুখী আকর্ষণে সহসা বিভ্রান্ত হয়ে, এরপরই সংবিৎ ফিরে পাই, ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করি।

অর্কপ্রভ বড় রুক্ষ। সটান সোজা চেহারায় যখন সংসারের মাঝখানে দাঁড়ায়, কোনো কিছুই ওকে আকর্ষণ করে না। তার উগ্র চোখ যাবতীয় আর্দ্রতা শুষে নেয়। যখন হাঁটে, দীপ্ত সূর্য মাথার ওপর, নিঃসঙ্গ পথচলায় প্রত্যাশা নেই, তবু সংসারে অন্তঃসার হয়ে আছে। চারপাশ থেকে সবাই ওকে দ্যাখে, সে কাউকে দেখতে পায় না। যাবতীয় নিষ্কাশনের পর শুধু একটি সরলরেখা তাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, সামনের দিকেও প্রসারিত সেই একই সরলরেখা। সেই বৃক্ষের শাখা নেই, পাতা ফুল ফল চোখে পড়ে না, স্থির চোখে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে।

অথচ মাধুরী কেমন কোমল ছড়িয়ে থাকে। সংসারের প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি প্রান্তরেখায়

তার স্পর্শ, অনাবিল সেই স্পর্শে গভীর শান্ততা। সে যখন দাঁড়ায়, ছায়া প্রসারিত হয়, আর্দ্র সবকিছু। সবাইকে, সবকিছুকে এমন স্নেহের চোখে দ্যাখে, বড় মায়াময়। কেউ তাকে দেখছে কিনা হুঁশ নেই, ওর অমলিন চোখ সর্বত্র ছুঁয়ে থাকে। অতীত থেকেই এমন শাখায়-পাতায়-ফুলে-ফলে সজ্জিত, বর্তমানে পৌঁছে সকলের আশ্রয়। ভবিষ্যতের দিকে তার প্রসৃতি, আশ্রয়ের আশ্বাস সেখানেও। যখন হেঁটে যায় মাধুরী, পায়ের ছন্দে সংসারে সুর বেজে ওঠে, গঠন-সুষমায় সম্পন্ন হয় সংসার, গোপন আভা সেখানে বিচ্ছুরিত হয়।

ভোগীচরণ, যোগীচরণ, অর্কপ্রভ ও মাধুরী, এদের সঙ্গে ওতপ্রোত, তবু মাত্র দর্শকের ভূমিকায়, এমন আর একজন, —সেই প্রবুদ্ধ চারজনকেই চেনে, তাদের গতিবিধি জানে, ওদের অতীত ইতিহাসও অজানা নয়। এসব সত্ত্বেও নিস্পৃহ, ওদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না। ওরা আবেগে দীপ্ত হলে উদ্দীপ্ত হয় না, ওদের বিপর্যয় ঘটলে চিন্তিত হয় না, ওদের বেদনা- আনন্দ-হতাশা-গ্লানি প্রবুদ্ধ-র মনে কোনো ছায়াপাত ঘটায় না। নির্বিকার চোখদুটো ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয় নেই, ওদের যাবতীয় কিছু, খুঁটিনাটি সব ওর চেতনাসত্তায় শুধু মেঘের মত প্রতিফলন রেখে যায়। প্রবুদ্ধ কে দেখে মনে হয়, ওরা চারজন অস্তিত্ব রাখার অনেক আগেই সে ছিল, ওরা যখন থাকবে না তখনও একইরকম থেকে যাবে।

মনে পড়ছে, একবার অসুস্থ হলে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু একটা কাগজে অনেক কিছু নির্দেশ লিখে দিলেন। সে অনুযায়ী পৃথিবীর যাবতীয় সুস্বাদ আমার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে নিজেকে বন্দী মনে হল, অভিশপ্ত মনে হল, অন্য সুখী মানুষদের প্রতি রাগ জন্মাতে লাগল, কেউ উপদেশ দিতে এলে ব্যঙ্গ করা শুরু করলাম, রাগে ক্ষোভে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করে একাকী দিন কাটতে লাগল। অর্কপ্রভকে তখন দেখেছি, আশ্চর্য নির্বিকার। ডাক্তারের নির্দেশে তার বিচলন নেই। ডাক্তার তার কর্তব্য করেছে, অর্কপ্রভ নিজের মত যা করার করবে। শরীরের এই ব্যতিক্রমী ব্যবহারেও সে উদ্বিগ্ন নয়। ভোগীচরণ কিন্তু রীতিমত হতাশ। এই যদি নির্দেশ এবং তা পালন করতে হয়, বেঁচে থেকে লাভ কী! গভীর উদ্বেগে অপেক্ষা করত, কবে সেই নির্দেশ প্রত্যাহারে যাবে, ফিরে আসবে স্বাভাবিকে। ওর এই অবস্থা দেখে যোগীচরণ মৃদু হাসত, বেঁচে থাকা বিষয়ে ভোগীচরণের ধারণায় মজা পেত, এক এক সময় বলত, তোমার কি মনে হয় বেঁচে আছ? লাভ-লোকসানের কথা পরে, বেঁচে থাকার অর্থ কী সেটা আগে বোঝ। বরং মাধুরীর অন্য ভূমিকায় সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল। যোগীচরণকে বলেছে, বেঁচে থাকার একটা নয়, অনেক মানে আছে। যার কাছে যে মানে দাঁড়ায়। ভোগীচরণ তার নিজের মত বেঁচে-থাকাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখছে। পাশাপাশি ভোগীচরণকেও বলেছে, নানাভাবে যে বেঁচে থাকা যায়, এটা তোমার বোঝা দরকার। একদিক রুদ্ধ হলে অন্য পথে নৌকো ভাসাচ্ছ না কেন? জীবন এত সংকীর্ণ নয়। নির্বিকার অর্কপ্রভকে বলেছে, জীবন থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, ওটা ঠিক নয়, জীবনে থাকতে গেলে সহবৎ শিখতে হয়। এই চারজনকে প্রবুদ্ধ দেখত, অবলীলায় সবাইকে ছুঁয়ে যেত। প্রকৃতই জীবনের কোনো মানে আছে কিনা, বেঁচে থাকার সার্থকতাই বা কী, এসব খোঁজার চেষ্টা করত।

যেদিন আমায় সম্বর্দ্ধনা দেয়া হচ্ছিল, শ্রদ্ধাভাজন, বন্ধু, গুণমুদ্ধ রা অনেকে ভিড় করেছিল।

ফুলের স্তবক, শাল, স্মারক এসবসমেত ফটো উঠছিল অনেক অনেক। ভোগীচরণ সেদিন কত না উত্তেজিত, চূড়ান্ত বিহ্বল, সমস্ত পৃথিবী যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওর মনে হচ্ছিল, সমস্ত জীবন ধরে এত যে পরিশ্রম, প্রতিভার প্রয়োগ, ব্যর্থতা তুচ্ছ করতে করতে এগিয়ে আসা, এসবই এখন সারভূত হয়ে, যেন সুন্দর একটা বিনিময়, ব্যর্থ হয় না কিছুই। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে ভোগীচরণ। অথচ তারই পাশে যোগীচরণের স্মিত হাসি,—দেখছ না, বুঝতেও পারছ না, এসব বুদবুদ হে। অযথা ব্যাকুল তুমি, নিজেকে প্রস্তুত রাখছ না আগামী ব্যর্থতা সামলে নেয়ার জন্যে। নিজের ওপর আস্থাটাই বড় কথা, এসব আসছে আসুক, যদি না আসে না আসবে, নিজের ওপর ভরসা রাখ, তখন কষ্ট পেতে হবে না। এদিকে অর্কপ্রভ ক্রমশই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছিল। এতদিন বেশ ছিল একা সম্রাট, তুচ্ছ করছিল এই সবই, এসবের কোনো অন্তঃসার নেই ভাল করে জানে সে। তবু এরা তাকে জড়িয়ে, যেন নিজের গোপন গুহা থেকে সহসা উন্মূলিত, তার সবকিছু প্রকাশ্য হয়ে পড়ছে, নিজ ঐশ্বর্যের হানি ঘটছে। মাধুরী তখন পাশে দাঁড়িয়ে, কেন এসব নিয়ে ভাবছ অকারণ? তুমি চাওনি, ওরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, নিজের মত যেমন ছিলে থাক তুমি, বরং মজাটা উপভোগ কর। এইসব উচ্ছ্বাসের অনেক ফেনা সত্ত্বেও কিছু অন্তঃসার নেই এমন নয়, সেটুকু খুঁজে নিতে হবে এবং তা তোমার প্রাপ্য। প্রবুদ্ধ কিন্তু সবার কথা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল, ভাবছিল, সবারই কিছু আত্মমোহ আছে, কিছু যাথার্থও আছে। ও শুধু সবাইকে ছুঁয়ে অন্তঃসার খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে।

কখনো কখনো এমন ঘটেছে, রাস্তায়, পরিচিত সকলের সামনে, বা কোনো সভায় অকারণে বিব্রত হয়েছি। অপমানিত হয়ে এমন পরিবেশ তৈরী হয়, কিছু করার থাকে না। অর্কপ্রভ-র মাথায় তখন আগুন, সর্বাঙ্গ অপমানবোধে, নিজের শীর্ষভূমি নামতে নামতে অবসিতপ্রায়, মাধুরী তখন পাশে এসে ওর কাঁধে ভর রেখে দাঁড়ায়। অর্কপ্রভ-র কিছু না-বলতে পারার সামনে আশ্রয়ের মত মাধুরী, বলে, ওদের থেকে অনেক বড় তুমি। ওদের দিকে তাকিয়ো না। ওরা তোমার ঐশ্বর্য কী বুঝবে? অর্কপ্রভ-র গ্লানি তবু কাটে না দেখে ভোগীচরণ ওকে সরিয়ে দেয় ওখান থেকে। এটা তোমার জায়গা নয়, যার যেখানে থাকার কথা সেখানে থাকা উচিৎ। তুমি চল আমার সঙ্গে। নিজের অবস্থানের কথা স্মরণ কর, স্মৃতি উসকে দাও, দেখবে, এসব কিছু নয়, সহজে ওদের অতিক্রম করে যাচ্ছ। ভোগীচরণের সঙ্গে যেতে যেতে গ্লানি ম্লান হয়, তবুও একটা আঁচড়ের মত জ্বালা থাকে অর্কপ্রভ-র মনে। যোগীচরণ ওদের এইসব কান্ডকারখানা দেখে মজা পায়, ভাবে, এসব অর্থহীন বাক্যবন্ধ। কোথাও জায়গা নেই, আবার সর্বত্র জায়গা আছে। দুটো অবস্থানই বুঝে নিতে হবে, নাহলে এই টানাপোড়েনের ভেতরে নিজের অবস্থান কোনোদিন খুঁজে পাবে না। এদিকে প্রবুদ্ধ একবার অর্কপ্রভকে দেখছে, তারপর মাধুরীকে, ভোগীচরণকে একপলক দেখে নিয়ে যোগীচরণকে। অথচ কেউ প্রবুদ্ধ কে দেখতে পাচ্ছে না। প্রবুদ্ধ র ভাবখানা এই, অবস্থানের কথা আমিই একমাত্র জানি, অন্য সবাই কল্পনা করছে, একমাত্র যোগীচরণ ইঙ্গিতটুকু বোঝে। আসলে এই অবস্থান ঠিক বুঝতে না পারলে বাকি সব অলীক মাত্র।

কখনো কখনো জীবনে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অথবা একান্তই

মনের প্রসন্নতায়, প্রবুদ্ধ কে তখন চট করে খুঁজে পাওয়া যেত না। অর্কপ্রভ, ভোগীচরণ, মাধুরী এক জোটবন্ধনের ভেতরে থেকে যোগীচরণকে তখন একটু তফাতেই রেখেছে। এই দৃঢ় বলয়ের ভেতরে প্রবুদ্ধ নেই। অর্কপ্রভ-র টানটান চেহারা, প্রশস্ত ললাট। একপাশে ভোগীচরণের সানুনয় প্রার্থনা, অন্যপাশে মাধুরীর মুগ্ধ চাহনি, কাকে ছাড়বে, কাকে সঙ্গ দেবে, অর্কপ্রভ হদিস পেত না। প্রার্থনায় বিফল হলে ভোগীচরণ নিষ্প্রভ, সফল হলে এমন উজ্জ্বল যেন অর্কপ্রভ-র উষ্ণীষ। মাধুরী যখন সঙ্গ পেত, অর্কপ্রভকে নিয়ে নানা উদ্দীপনায়, অথচ সঙ্গ না পেলে তার এমন অভিমান, অর্কপ্রভ-র কাছে সমস্ত পৃথিবী বর্ণহীন। একহারা এই অর্কপ্রভ কিভাবে যে এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল! অথচ এদের থেকে তফাতে যোগীচরণ, যেন সম্পর্ক নেই, কাছে আসতে পারছে না। ওর অট্টহাসির শব্দ কখনো শোনা যেত, কখনো যেত না। যোগীচরণকে এমন হীনবল আগে দেখা যায়নি। ঠিক তখনই ওর খুব কাছে এসে পড়ত প্রবুদ্ধ, মৃদুকণ্ঠে বলত, এদের কান্ড দেখেছ? সবাই বিকৃত হয়ে গেছে, স্থিতিস্থাপকতা নেই ওদের। এখানে তুমি ভাল থাকতে পার না। এমন শক্ত সমর্থ তুমি, তবুও দ্যাখ কেমন হতাশায় ভুগছ।

যখন সাধারণভাবে এসব কিছুই ঘটে না, —অসুস্থতা থাকে না, কেউ সম্মানিত করে না, অপমান করে না বা বিশেষ সমৃদ্ধি ও নেই, কেমন ভাসমান অবস্থায় আমি, এরা তখন কোথায় কোথায় যেন হারিয়ে থাকে। ভোগীচরণের অস্তিত্ব সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না. হঠাৎ একপাশে কোণে কোথাও পড়ে আছে, না উজ্জ্বল না হতাশ, কেমন বিবর্ণ ওর চেহারা। নিজেই বোঝে না, বেঁচে আছে কি নেই, মৃতের মত চোখ, সাড়া দেয় না, কেমন আছ, জিজ্ঞেস করলে উত্তর নেই, যেন বর্তমানই নেই ওর, অতীত ছিল কিনা জানে না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। এদিকে যোগীচরণের কোনো কাজকর্ম নেই। আপন মনে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, সবাইকে দ্যাখে, কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই বুঝে নিয়ে আবার ঘুরে বেড়ায়। কখনো বসে থাকে না, অথৈ স্থির জলে ডুবসাঁতারে এপাশে ওপাশে যায়। কখনো কখনো মনে হয়, যে কোনোদিন দেশান্তরী হতে পারে কিন্তু কোন দেশে যাবে হদিস নেই তার কাছে। মাধুরীকে দেখেও কষ্ট হয়, সব রঙ ঝরে গেছে তার। দৃষ্টিতে মেদুরতা, কটাক্ষ হারিয়ে গেছে। শরীরে বিভঙ্গ নেই, ওর দাঁড়িয়ে থাকা, হেঁটে যাওয়া, বিশেষ কিছু নয় যেন। কেউ ওকে দেখছে কিনা সে আগ্রহ নেই, কারো প্রতি ওর-ও কোনো আগ্রহ নেই। মাধুরী আছে বা নেই, এ দুয়ের ভেতরে পার্থক্যই নেই আর। অতীত ও ভবিষ্যৎ দুদিকে দুই পাখা মেলে বর্তমানে শরীর-ভাসানো সেই মাধুরী কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, এখন ঐ বোধহীন শরীরে শুধু তার ছায়া। অর্কপ্রভকেও চেনা যাচ্ছে না। ভাবলেশহীন চোখমুখ নিয়ে কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে, কখনো হাঁটতে হাঁটতে, আর পাঁচজন থেকে আলাদা করা যায় না, অথচ ওর বৈশিষ্ট দিয়েই আমাকে সবাই চিহ্নিত করে। এখন ওর এই নির্বিশেষ, স্রোতে ভাসমান রেখেছে আমায়, কোথাও দাঁড়িয়ে বলতে পারছি না, এই আমি, আমাকে দ্যাখো তোমরা। অপসৃয়মাণ এরা চারজন, এদের ফাঁকফোকর দিয়ে প্রবুদ্ধ তখন উঠে আসে, আমার খুব কাছাকাছি চলে এসে, এটাই ভাল বুঝলে, কোলাহল নেই, কলহ নেই, হর্ষধ্বনি নেই। নিজেকে খুঁজে পাবার, নিজেকে বুঝে নেবার এটাই উপযুক্ত সময়। নির্মাণ কর তোমার নিঃশব্দ মন্দির! ওরা যে বিভব তৈরী করে,

অথবা সৃষ্টি করে যে হতাশা ও গ্লানির অন্ধকার, এসব তোমার নিজস্ব কিছু তো নয়, আমরা শুধু শুধু আমাদের নিভৃতিকে চুরমার করি। ওরাই এসব গড়ে, ভাঙ্গে। ওদের খেলা ওরা খেলুক। আমরা বুঝে নিই আমাদের, আমাদের স্বভূমি চেনা দরকার।

প্রবুদ্ধ কে এবার বলি, এই যে এদের নিয়ে ঘরসংসার পেতেছি, কেন? কিছু একটা ঘটলে তোলপাড় সব, কিছু না ঘটলে শুনশান। এসবের অর্থ কী? এরা যখন ভূমিকা রাখে, আমার কোনো ভূমিকা নেই। এরা যখন কোনো ভূমিকায় থাকে না, এদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার প্রকৃত অবস্থান তবে কোথায়? এদের ভেতরে যখন প্রতিফলিত আমি, আত্মবিস্মৃত থাকি। যখন কোনো প্রতিফলন ওরা দিতে পারে না, আমি প্রতিফলন খুঁজে বেড়াই। আমি তবে কিভাবে অস্তিত্ব রেখেছি!

প্রবুদ্ধ রহস্যময় হাসে, ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছ। এ অবস্থা থেকেই তোমার শিল্পীসত্তার জন্ম হবে।

কিভাবে?

এতক্ষণ যা বললে সেটা একটু গুছিয়ে নাও।

কী আবার বললাম। আমার অসহায়তার কথা বললাম, আমার অস্তিত্ব কোথায় জানতে চাইলাম।

এর অর্থই এই যে তোমার শিল্পীসত্তার উন্মেষ হচ্ছে।

উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না, প্রবুদ্ধ-র কথা শুনে যাচ্ছি,—

তুমি তো দর্শকমাত্র। যখন তোলপাড় হচ্ছে, তুমি থাকবে শুনশানে, কেননা তখনই তুমি পুরোপুরি দর্শক হতে পারবে। ওরা থাকবে নানা ভূমিকায়, দর্শক ভিন্ন অন্য কোনো ভূমিকা তোমার নেই। ওরা শুধু নিজের ভূমিকায় নয়, দেখতে পাবে, ওদের ওপর বিশ্বের তাবৎ ভূমিকার প্রতিফলন ঘটতে থাকছে। তোমার ভূমিকা শুধু দেখে যাওয়া, সেই সব বহুরঞ্জনা থেকে অনপেক্ষ রাখবে নিজেকে, নিরপেক্ষ থাকবে বিচার-বিশ্লেষণে। এটাই তোমার প্রকৃত অবস্থান। কেন তুমি ওদের ভেতরে নিজের প্রতিফলন খুঁজবে! তুমিই তো ওদের সৃষ্টি করেছ। বিভ্রান্তি দূর কর, নিজের প্রকৃত অবস্থান চিনে নাও। প্রতিফলকই বা কেন খুঁজতে যাবে, প্রতিফলক নির্মাণ করবে তুমি, সেটাই হবে তোমার শিল্পমাধ্যম, তোমার অস্তিত্ব নিহিত হবে শিল্পীত্বে।

মন দিয়ে প্রবুদ্ধ-র কথা শুনতে শুনতে আমি ক্রমশ দর্শক হয়ে উঠতে লাগলাম।

# আমি ও আমার খুনী-সত্তা

আমার মাঝে মাঝেই নিজেকে খুনী মনে হয়।—একজন নৃশংস খুনী, যে একই সঙ্গে ভালোমানুষ সেজে ভিড়ের ভেতরে নির্দ্বিধায় হেঁটে যায়;সকলের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে; মানুষের অধঃপতনের কথা, তাদের কারো কারো বিকৃত মানসিকতার কথা, এসব নিয়ে আলোচনা করে; সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলি পালন করে এবং আরো যা যা সব একজন সাধারণ নাগরিক দৈনন্দিন নির্বাহ করে। পাশাপাশি কখনো তার মনে ভয়, —তাকে কি চিনে ফেলল কেউ? স্থানীয় থানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চায়ের ভাঁড়-হাতে অথবা খৈনী ডলতে -থাকা অন্যমনস্ক পুলিশ চোখে পড়লে সন্তর্পণে একপাশে সরে যায়, অথবা কোনো পুলিশের মুখোমুখি হয়ে পড়লে অকারণ সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করে;কোনো জমায়েতে চারপাশে অনেক লোকের উগ্র চোখ দেখলে চকিতেই আড়াল খুঁজে নিজেকে গোপন করে অথবা কোনোদিন বাড়ি ফিরে স্ত্রী-পুত্রের সন্দেহজনক দৃষ্টির সামনে নিজেকে অসহায় মনে হয়।

আমি আমার খুনী-সত্তার সঙ্গে তার এই বিপরীত আচরণ নিয়ে মাঝেমধ্যেই এরকম কথা-চালাচালি করি—

তাকে প্রশ্ন করি, সত্যিই কি তুমি খুন করেছ?—কেন করলে? কোথায়? কবে?

সে উত্তর দেয়, আমি ঠিক জানি না। আমার মনে পড়ছে না।

তবে তোমার এত ভয় কেন!

কি জানি, কখনো কখনো মনে হয়, হয়ত সত্যিই খুন করেছি।

ওর এই বিপরীত কথাবার্তা আমাকে স্বস্তি দেয় না। তীব্র হয়ে বলি, সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। খুন যদি করে থাক, থানায় গিয়ে সব খুলে বল। আর যদি না করে থাক, সব ভয় ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক চলাফেরা কর। আমাকে স্বস্তি দাও।

খুনীসত্তা অসহায়ভাবে বলে, ঠিক জানলে তো সিদ্ধান্ত নেব। যদি ঘটনা হয়, ঘটে গেছে। না ঘটলে, ঘটে নি। ঠিক নির্বাচন করতে পারছি না বলে আমারও অস্বস্তি, কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে।

খবরের কাগজ পড়তে আমার ইচ্ছে করে না। ওরা শুধু বিভৎস রসের আমদানী করে। কেন করে জানি না। অন্যান্য খবর, যা মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত, সামাজিক ক্ষেত্রেও, এসব নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। ওদের ধারণা, বিভৎস রসেই মানুষ আলোড়িত হয়, তীব্রভাবে আকর্ষিত হয়। আমার ক্ষেত্রে এমন ঘটে না, বরং এইসব খবর প্রতিমুখি করে। তবু চায়ের কাপ হাতে এলে কাগজটা তুলে নিই, আর তখনই চোখে পড়ে—কোনো কিশোর তার বাবা-মা-কে খুন করেছে, কোনো যুবক কি এক অজানা কারণে তার

বন্ধুকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটিয়েছে অথবা স্ত্রী-কে বিশ্বাসভঙ্গের কারণে হত্যা করেছে। এর পর কাগজের একেবারে ডানদিকে চোখ পড়ল, ছাপা হয়েছে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি। কোনো এক সভায় তার বক্তৃতার প্রশংসা করে সারসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে। খুবই সারগর্ভ বক্তৃতা, গভীর সব সমস্যা থেকে উত্তরণের কথা। অথচ সকলেই জানে, এই ব্যক্তিটিই এইসব সমস্যা তৈরীর মূল হোতাদের একজন। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্পৃহা চলে যায়, কাগজটা সরিয়ে রাখি।

কিন্তু ততক্ষণে আমার চিত্তে সেই বৃত্তিটা গভীর আলোড়ন তুলে ফেলেছে। সমাজ, সংসার তার অন্য চেহারা নিয়ে চোখের সামনে। আমার মনে পড়ে যায় অনেক পুরনো কথা—সেই কিশোর বয়েসে বিকাশ নামে এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে রাজি হইনি বলে অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের কাছে মিথ্যে অভিযোগ করেছিল, তার শাস্তি হিসেবে কান ধরে বেঞ্চি র ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে পুরো ক্লাশটাই। এরপর বাবার কানে কথাটা পৌঁছলে আমার কোনো কথা না শুনেই প্রচন্ড মারধোর করেছিলেন।—অতসীর কথাও একই সঙ্গে মনে পড়ে। দেখতে সুন্দরী, তার সৌন্দর্যের ছটা এত তীব্র ছিল, আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে আর সবকিছু অন্ধকার। অতসীকে ছাড়া আমার জীবন ভাবাই যাচ্ছিল না, অথচ সে দিব্যি আর একটি যুবকের সঙ্গে আমার চোখের সামনেই চলাফেরা করতে থাকল, কেননা আমার বাবা-র তুলনায় যুবকটির বাবা অনেক বেশী অর্থবান ছিলেন। হতাশ হয়ে একদিন তার সঙ্গে ফয়সালা করতে গেলে, তার চোখে সে কি ঘৃণা! প্রেমিক যুবকটিও আমার দিকে তেড়ে এসেছিল। এরপর বেশ কয়েক রাত অপমানে, জিঘাংসায় ঘুমোতে পারিনি।—আর একটি ঘটনা, যা আমার মনে গভীর ক্ষত স্থায়ী করেছে, যা মাঝে মাঝে অনাবৃত হলে যন্ত্রণাটা টের পাই আজো।—অরিন্দম, একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে আমার গোপন ও গভীর এক বেদনার কথা বলে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে কথা রাখেনি, অন্য বন্ধুদের মাঝখানে প্রকাশ করে দিয়েছিল সেই বেদনার কথা, যেখানে আমার স্ত্রীও উপস্থিত ছিল, আমাকে রীতিমত হাস্যাস্পদ করে মজা করতে চেয়েছিল।—আর ঐ প্রদ্যুত সেনের ছবিটা, শয়তানির ছটা তাতে সূক্ষ্ম দেখতে পাচ্ছি। তার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। সুকোমল চৌধুরীকে নির্বিচারে গুন্ডা দিয়ে খুন করল, যে ছিল আমাদের দুজনেরই বন্ধু, প্রদ্যুতের রাজনৈতিক সহকর্মী। খুবই সামান্য কারণ, সুকোমল ছিল সৎ, পরোপকারী; অনুগামীদের প্রিয়পাত্র হয়ে প্রদ্যুতের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। সুকোমলের এক অনুগামীর কাছে খবরটা জেনে প্রদ্যুৎকে ভৎর্সনা করি, এ তুমি কি করলে? ও সামান্য হেসে, সে হাসিটা অবিকল ঐ ছবিটার মতই, বলেছিল, ও তুই ভাবিস না, রাজনীতিতে অমন একটু আধটু হয়। আমার কেমন ঘেন্না হয়েছিল, এরপর থেকে প্রদ্যুতের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখি নি।

এইসব স্মৃতিগুলি যখন আমার চিত্তে বৃত্তিগুলি উৎক্ষিপ্ত করছে, তখনই অন্য এক পৃথিবী গড়ে উঠে সেখানে ভয়ংকরভাবে উপস্থিত হয়েছে এক খুনী-সত্তা। আমি চমকে উঠি তার নৃশংসতা দেখে—কত সহজে বিকাশকে হাতের কাছে পেয়ে তার গলা টিপে ধরল, বিকাশের চোখ-মুখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ছাড়ল না কিছুতেই, যতক্ষণ না শরীরটা নিথর

হয়ে গেল। ওর হাতদুটো কেমন অস্থির, চোয়ালদুটো শক্ত, জিঘাংসায় সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু তারপরই ওর চোখ-মুখ শান্ত স্বাভাবিক, যেন এতদিন পর স্বস্তিতে ফিরেছে। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবলীলায় পেয়ে গেল অতসীকে, যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, পাশে দাঁড়ানো প্রেমিক যুবকটিরও শংকিত মুখ, খুনী-সত্তার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। ওদের সময় দেয় নি একটুও, পরপর দুটো গুলিতে ওদের বিদ্ধ করে, আর্তনাদ করে পড়ে যেতে যেতে অবশেষে দুটো লাশ—ওদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে 'এটাই অবধারিত ছিল, অনিবার্য ছিল' বলে আর ফিরে তাকায়নি সে। ততক্ষণে অরিন্দমের মুখোমুখি, ওকে কোনো সুযোগ না দিয়ে একটা ভারী লোহার রড ওপর মাথার ওপর। মজা করতে থাকা অরিন্দমের মুখ কেমন বিকৃত হতে হতে ভাবলেশহীন। 'বিশ্বাসঘাতকদের এটাই প্রাপ্য' বলে যেন কতদিনের ভার নামিয়ে দিতে পেরেছে এই বোধে তৃপ্ত, আর তারপরই হঠাৎ শান্ত স্বাভাবিক। এরপর চলে গেল সরাসরি প্রদ্যুতের বাড়ি। ও হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে 'কতদিন পর?' কিন্তু আর কথা এগোতে পারে নি। লুকিয়ে রাখা নাইলনের দড়িটা ওর গলায় ফাঁসের মতো পরিয়ে প্রাণপণ টানতে শুরু করেছে। টানছেই, যতক্ষণ না ওর হাত-পা ছটফট করতে করতে একসময় স্থির হয়ে গেল।—'রাজনীতিতে এরকমই হওয়া উচিৎ, তাই না প্রদ্যুৎ', বলেই সে হাসিতে ফেটে পড়ল, এবং হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

এইসব দেখে আতংকিত আমি, 'এ কি ভয়ংকর, এবার প্রত্যাহার চাই', ভাবতে ভাবতে একসময় দুঃস্বপ্নের পৃথিবীটা সরে গেল। আর আমি নিজের পৃথিবীতে সরে এসে, 'দুঃস্বপ্নেরা এত পাশাপাশি থাকে'! এই ভাবনায় অবাক হয়ে গেছি, মুক্তির হাওয়ায় ঠিকঠাক নিঃশ্বাস নিতে পারছি যেন, খুনী-সত্তাকে খুঁজতে গিয়ে, কোথাও নেই! এটা কী করে সম্ভব, কেন এমন হয়, আবার যদি সেই পৃথিবীটা ফিরে আসে—এইসব ভাবনায় ভাবনায় রীতিমত হয়রাণ হয়ে যাচ্ছি।

অথচ যে পৃথিবীটা এতক্ষণ, তাকেই বা অস্বীকার করি কী করে? ঘোর লেগে থাকলেও তাতো স্পষ্টই। এমন একটি সত্তা কোথা থেকে উঠে এল, যার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই? আমার ভেতরেই গভীর গোপন এমন এক অন্ধকারময় অঞ্চ ল, যেখানে সহসা জন্ম নিল খুনী-সত্তা, তার হদিসই আমার কাছে ছিল না। এইসব ভাবছি, ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছি অনেকটাই, পাশাপাশি গভীর বিস্ময়াবিষ্ট আমি—আমার দ্বারা এমন আচরণ সম্ভব! এটা ঠিক, একদা খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, ঘৃণায় মনটা ভরে গিয়েছিল, অপমানিত হয়েছিলাম, তবুও তার প্রতিক্রিয়ায় জিঘাংসা আমাকে পেয়ে বসবে, এমন চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। অথচ এমনই এক জিঘাংসার পৃথিবী তো গড়ে উঠল যেখানে প্রায় আমার অপ্রতিহত ভূমিকা—আমাকে অতিক্রম করে আর এক আমি-র দুরন্ত আক্রোশ। সেখান থেকে কে বা কারা আমাকে ফিরিয়ে দিল এই স্বাভাবিক পৃথিবীতে, সে-ও এক রহস্য, যা আমি ভেদ করতে পারছি না। কিন্তু এই রহস্যমোচন জরুরি, সতর্ক না থাকলে যে-কোনো মুহূর্তেই আবার পৌঁছে যেতে পারি সেই অন্য পৃথিবীতে, যেখানে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই।

ঠিক এই সময় খুনী-সত্তা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, চলাফেরায় আগের মতই কখনো সন্ত্রস্ত কখনো স্বাভাবিক।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমিই কি আমাকে জিঘাংসার পৃথিবীতে নিয়ে গিয়েছিলে?

রীতিমত বিভ্রান্ত সে। বলল, আমি জানি না, আমার কিচ্ছু মনে নেই, এসব আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিভ্রান্ত আমিও, প্রশ্ন করি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কোথা থেকেই বা এলে?

বিশ্বাস কর, এসব আমি কিছুই জানি না। তোমার এসব প্রশ্ন শুনে আমার ভয় করছে। তুমি কি আমায় জেরা করছ?

আমার কাছেও এর উত্তর নেই। বললাম, ঠিক আছে, শান্ত হও। এ বড় দুর্যোগের সময়, সবকিছু জেনে বুঝে নিতে হবে, নাহলে নিজেদেরই হারিয়ে ফেলব।

এই পরিস্থিতি দীর্ঘ অবকাশ ও নির্জনতা দাবী করে, বুঝে নিয়ে আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছি।—মনের ভেতর অন্য কোনো ভার রাখি নি, মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ, দুপাশে ছড়ানো বিস্তৃত মাঠ।

হাঁটতে হাঁটতে দুজন দুজনকে বুঝে নিচ্ছি। যদিও কেউ কাউকে দেখছি না, দুজনেই নিজ নিজ পৃথিবীতে, মাঝে মাঝে কখনো এ ওর-টাতে, কখনো ও এর-টাতে ঢুকে পড়ে। ঢুকে, কী যেন বুঝে নিয়ে ফিরে আসে, সাজিয়ে নেয় নিজের পৃথিবী।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একসময় কিছু বলার কথা মনে হল। খুনী-সত্তাকে বললাম, একদা যা ঘটেছিল কোনোটাই ভাল নয়, মনের ভেতরে অনেক ক্ষত তৈরী করেছে, সেই যন্ত্রণা টের পাই মাঝে মাঝে। তোমার কি মনে হয়, প্রতিহিংসা ভাল? তাতে কোনো সুরাহা হয়?

সে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে, আর ওর পৃথিবীতে দেখছি প্রতিহিংসা সক্রিয় এখনো। আমার কথা কি শুনতে পায়নি! এখন ভাবছি যখন, সে বলল, প্রতিহিংসা ভাল নয় জানি, তাতে কোনো সুরাহা হয় কিনা জানি না। কিন্তু ঐ ক্ষত নিরাময় হবে কিভাবে? নিরাময় হলেও চিহ্ন তো থাকেই, যার স্মৃতি সারাজীবন কুরে কুরে খায়।

শুনে আমার পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল নির্জন পথ।—বিকাশ, অতসী, অরিন্দম, প্রদ্যুত, এদের মুখগুলি জেগে উঠছে অবধারিত, ক্ষতগুলি নির্ভুল চিনিয়ে দিচ্ছে। আমি হেরে যাচ্ছি, খুনী-সত্তার কাছে হেরে যাচ্ছি আমি। তার প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই আমার কাছে।

সহসা চাপা হাসির শব্দে থমকে গেলাম। তার স্বগত ভাবনাগুলি বিদ্ধ করছে আমাকে—আসলে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর নেই কারো কাছে। প্রশ্ন করারও অর্থ নেই, ধারণ করতে না পারলে প্রশ্নেরা উঠে আসে। পৃথিবীতে যে ঘটনা ঘটে, তার প্রতিঘটনা, তারও প্রতিঘটনা—এসব ঘটতে ঘটতেই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন করে করে থামাতে পারবে তুমি? কার কাছেই বা উত্তর খুঁজবে? প্রত্যেকে সেই ঘটনা-প্রতিঘটনায় জড়িয়ে আছে।

আমার পৃথিবীতে সবকিছু তোলপাড় এখন। শান্ত হবার জন্যে আরো নির্জনতা চাই। বললাম, এসো আমরা শান্ত হই, আরো গভীর নির্জনে প্রবেশ করি। সে চুপ করে বসে আছে, কিছু বলছে না।

একসময় কিভাবে যেন পথের মধ্যেই ওর মুখোমুখি। প্রশ্ন করলাম, এসব কি মিটবে না কোনোদিন?

খুনী-সত্তা কেমন গুটিয়ে গিয়ে, ওর মুখে সেই পুরনো সন্ত্রস্তভাব। গুটিয়ে গিয়ে আরো গভীর গভীরতরে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলল, আমি তার কি জানি?

পাল্টা প্রশ্ন করি, জান না বলছ, তবু তো নিজের পৃথিবীটা সাজিয়ে নিচ্ছ ঠিকঠাক। পাশাপাশি যখন, তোমাকে চেনা যায় না, এখন না বোঝার ভান করছ। আমাকে মুক্তি দেবে না তুমি?

ওর সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরতমে পৌঁছে গেছি। আমার একমুখিনতা দেখে বলল, বিশ্বাস কর, এসব কী হয়, কেন হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারি না। কোনো কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি তোমার থেকে আলাদা কিছু নই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, কেন করেছ তুমিই জান। বরং নিজেকে প্রশ্ন কর, উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে।

হাল ছেড়ে দিই। আবার পাশাপাশি আমরা, যে যার পৃথিবী নিয়ে পাশাপাশি চলতে থাকি।

সারাদিন এইভাবে পরিক্রমার পরও কোনো সুরাহা হয় না আমাদের। খুনী-সত্তার দ্বিচারিতা বিভ্রান্ত করে শুধু। অস্বীকার করতে পারি নি, ও আমারই সৃষ্টি, তবে কি দ্বিচারিতাই জন্ম দিয়েছে ওকে! এর মূলেও কি নিজেরই দ্বিচারিতা? এ প্রশ্ন আমার, আমাকেই তার উত্তর খুঁজতে হবে।

গভীর নির্জনে বসেছি এখন। পাশে খুনী-সত্তা নেই। আছে কি নেই নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না, তবু তাকে রুদ্ধ করে সংহরণে ফিরে আসছি। কেননা ইতিহাসের নির্মোহ সন্ধানে যাব এবার। হয়ত সেখানে এই বিভ্রান্তির সূত্র পাওয়া যাবে।—

মানুষের ইতিহাস সম্পর্ক গড়ার ইতিহাস, এই তত্ত্বে নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, — কোথায় সেই সম্পর্ক, যা পরম্পরাবাহিত এই ইতিহাস নির্মাণ করেছে—সবই তো সম্পর্ক ভাঙার ইতিহাস! সম্পর্ক কোথাও তো গড়ে ওঠে নি, নতুন সম্পর্ক এসে পুরনো সম্পর্ক ভেঙেছে, তারপর নিজেকেও ভেঙেছে। তবে কি সবই উপরিতলের ঘটনা? হয়ত এর সূত্র গভীরে কোথাও অন্তর্লীন, এই খোঁজে ডুবুরির মত অতলে গিয়ে কোথাও তার হদিস নেই তো! সবই একক, সবাই একক, অস্থির একক! সেই অস্থিরতাই সম্পর্কের জন্ম দেয়, কিন্তু স্থিরতায় যেতে গিয়ে এরপরই ভেঙে যায় সেই সম্পর্ক।—এই বিশ্লেষণ ক্রমশ হতাশ করছে আমায়। সুরাহা তবে কিভাবে! একা-একা, কারো সহযোগ ছাড়া? সহযোগ অর্থে তো আবার সেই সম্পর্ক, যা ভঙ্গুর, শুধু ভেঙে ভেঙে যায়। তবু তো পৃথিবীর ইতিহাস পরম্পরারই ইতিহাস। তাই যদি, কোন সে সূত্র যা পরম্পরাকে বহমান রাখে!—এইসব বিরুদ্ধ ভাবনায় ক্রমশই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি আমি।

বিকাশ যথার্থ বন্ধু ছিল আমার। ছোটবেলায় অসুখ হয়েছে শুনলেই ছুটে আসত, বলত, সেরে যাবে, ভাবিস না। ওর শিশুবয়েসে মা মারা যায়, আমার মা-কে নিজের মা বলেই মনে করত। তাতে কি আমার ওপর অধিকার জন্মে গিয়েছিল? যা বলবে তাই করব আমি, এমনটাই

ধারণা ছিল? সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না, আর ও সেই ছোটবয়েসেই সিনেমা-পাগল। সম্পর্কই কি অধিকারের জন্ম দেয়! নাহলে কেন তার এমন আচরণ? অধিকারবোধে আঘাত লেগেছিল বলেই হয়ত হেনস্থা করেছিল, যা আমার নিজস্ব সত্তায় এমন আঘাত করেছে, প্রতিহিংসায় জন্ম নিল খুনী-সত্তা।—আমার না-চাওয়াকেও অতিক্রম করে প্রবল হয়েছে তার প্রতিহিংসা। যে-কারণে নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে যেতে হল। এই বিরুদ্ধতাও কেমন জটিল! মনে মনে ভাবছি, আমি যেমন নিজের ভেতরের জটিলতায় আচ্ছন্ন, হয়ত পৃথিবীর সব মানুষই এমন আচ্ছন্ন থেকে সম্পর্কের হদিস পায় না।

অতসীর ঘটনাও বিভ্রান্তিকর। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে কথা বলি, আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো কেমন অলৌকিক উদ্ভাসের ভেতরে গিয়ে, যেন নিজের মধ্যেই ছিলাম না। অতসীর মনেও কি তেমন বোধ বা স্নায়ু অবশ-করা অনুভূতি ছিল? হয়ত ছিলই না, থাকলেও তা সাময়িক, তাই অন্য স্রোত এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই পারস্পরিক ছিল না আমাদের সম্পর্ক, অথচ আমার মনে তার গাঢ়তায় অন্য এক পৃথিবী গড়ে তুলছিলাম। যখন সেই পৃথিবী বিপর্যস্ত হল, সহ্য করতে পারি নি। রিভলবার শুধুমাত্র প্রতীক, আমার খুনী-সত্তা সেই প্রতীকটি পেয়ে গেল। অথচ আমি চাইনি, অতসীর প্রতি আমার স্নায়ু অবশ-করা বোধ এভাবে খুন হয়ে যাক, অথবা যখন আমার পৃথিবীতে থাকলই না, সে তবে মুছে যাক। অথচ আমার থেকেই জন্ম-নেয়া খুনী-সত্তা এমনই নৃশংস হয়ে উঠল! এখানেও সেই জটিলতা। —সে আমার মুখোমুখি হতে পারে না, সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে চলাফেরা করে কিন্তু তবুও তার অস্তিত্ব টের পাই আমি! এভাবে সম্পর্ক গড়ে, তারপর ভেঙ্গে দিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকব? অথচ পৃথিবীর ইতিহাস এভাবেই বেঁচে আছে, সংহরণ বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রতিহিংসায় চলে যায়।

অরিন্দমই বা ঐরকম ব্যবহার করল কেন! কোন সে সূত্র? আসলে সেই একই ঘটনা—কোনো সম্পর্কই স্থায়ী হয় না, নতুন সম্পর্কেরা এসে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। আমার যে বেদনা ওর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম, তাকে ও মূলধন করেছে নতুন সম্পর্কের আশায়। পুরনো সম্পর্কের কোনো মূল্যই ওর কাছে ছিল না। আমার নিজের বেদনার কথা কেন জানাতে গিয়েছিলাম তাকে! হয়ত সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনে কিন্তু ও তাকে ব্যবহার করেছে সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে। আর এই ব্যর্থতায় আমার ভেতরের খুনী-সত্তা লোহার রড হাতে নিয়ে ভঙ্গুর সেই সম্পর্ককেই চিরকালের জন্য শেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু আমিও কি তাই চেয়েছিলাম?—এই জটিলতার নিরসন কিছুতেই করতে পারছি না।

প্রদ্যুত সেনের সম্পর্কটা এখন বুঝতে পারি। প্রথমে বুঝতে পারি নি কিন্তু তারপরই জেনেছি, আমার সঙ্গে শুধুমাত্র আপাত-সম্পর্কে ছিল, যা গাঢ় হয়নি কখনো। একতরফা আমিই ভেবেছি কিন্তু তার ভাবনা ছিল অন্যরকম। প্রদ্যুৎ অন্য জগতের মানুষ, এটা জেনেও খুনীসত্তা উগ্র হয়ে উঠল কেন! নাইলনের দড়িটা প্রতীক, আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা জৈবিক ছিল না, কৃত্রিম, এটাই কি প্রমাণ করতে চেয়েছিল? যে বন্ধুটি খুন হল, আমারও বন্ধু ছিল সে, তাকে খুন করায় মনে হয়েছিল, বন্ধুত্ব ওর কাছে শুধুমাত্র উপায়, কাজ শেষ হলে তার আর প্রয়োজন থাকে না। এই বিশ্বাসঘাতকতাই কি প্রতিহিংসাকে উন্মত্ত করেছে? এসব আমি ঠিক

ঠিক জানি না, খুনী-সত্তাও জানে না এই জটিল রসায়ন, তাই কৃতকর্ম বিষয়ে ও এত অজ্ঞ, এত সন্ত্রস্ত থাকে সবসময়।

এইসব বিশ্লেষনেরই বা সারাৎসার কী? সম্পর্ক ভাঙ্গা-গড়ার রসায়নে একটা সূত্র অবশ্যই থাকা উচিৎ ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটি সম্পর্ক ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিশ্লেষনের পরেও নির্দিষ্ট কোনো সূত্র তো খুঁজে পাওয়া গেল না! আশ্চর্য এই, নির্দিষ্ট সূত্র না থাকলেও পৃথিবীতে পরম্পরা বজায় থাকছে ঠিকই, অতএব উৎসভূমি অবশ্যই আছে।

এই উৎসভূমির সন্ধানে, প্রথমেই রসায়নের সমস্ত জটিলতা সরিয়ে দিলাম। সম্পর্ক ভাঙ্গার সূত্র প্রয়োজন নেই আর, এরপর সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রটি মুছে দিতেই খুনী-সত্তার অস্তিত্ব আর থাকল না। অতএব পৃথিবীতে একাকী আমি কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না গড়ে নিস্পৃহ দর্শক, দেখতে চাই, কিভাবে পরম্পরা বজায় থাকে এই পৃথিবীতে, কোন ধারাবাহিকতার সূত্রে মানুষজন পারস্পরিক হয়।

আমার চোখের সামনে এতকাল পরিচিত যাবতীয় সংসারগুলি, চেনা-অচেনা যত সংস্থা, নিয়ামক প্রতিষ্ঠানগুলি, রাষ্ট্র-আদালত-পুলিশবাহিনী, সবাই যে-যার ভূমিকায় নির্বাক চলচ্চিত্রের মত আপাত-সম্পর্কে থেকে নানা ভঙ্গিময়। সমস্ত দৃশ্য বেশ রমনীয় এখন। সম্পর্ক ভাঙ্গার দৃশ্যগুলি অকিঞ্চিৎকর, তারপরই অন্য সম্পর্ক গড়ার দৃশ্যগুলি বরং গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে কি সবাক থেকে নির্বাকে রূপান্তর এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কথা কি সেই সূত্র, যা বিভ্রম ঘটায়! একদা শব্দ থেকে যা উৎপন্ন হয়েছিল, যে শব্দ থেকে এই জগৎ-বিস্তার। সেই শব্দই জন্ম দিয়েছে অধিকারবোধের, অথবা বোধ-বিচ্ছিন্নতার। সম্পর্কের দিগভ্রান্তি ঘটানো কিংবা আপাত-সম্পর্ক স্থাপনেও কি সেই শব্দেরই ভূমিকা!

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু আভাসে সেই সূত্র উদঘটিত হচ্ছে। এটা ক্রমশ স্পষ্ট যে, শব্দ তার বিস্তার-প্রেষণায় বোধকে উৎক্ষিপ্ত করে জটিলতার জন্ম দেয়! এখন এই প্রতীতিই আমার মনে। অতএব বোধকে শান্ত করা কর্তব্য, কেননা তখনই বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়ে মনকে আর জটিলতার ভেতরে নিক্ষেপ করবে না।

এখন এই আমি নির্বাক বোধের ভেতরে স্থিত হয়ে দেখছি, যাবতীয় সম্পর্কগুলি ভাঙ্গাগড়ার খেলায় নিজেরা দীপ্ত, দীপ্ত করছে পৃথিবীকেও। সেই সম্পর্কময় সমস্ত মানুষজনকে ডেকে বললাম, আমি প্রস্তুত, তোমরা এসো আমার পৃথিবীতে। তবুও সতর্ক আমি, এই আহ্বানে আরো বলেছি, এসো, কিন্তু কোনো সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্য দিয়ে নয়। আমার বোধের ভেতরে তোমরা এসো।

তৃতীয় বর্গ

# অনলবাবুর তথ্যপ্রমাদ

অনলবাবু বিস্তর পড়াশোনা করেছেন। এখনো তাই নিয়ে থাকেন। নিয়মিত বই কেনা, বই-য়ে নম্বর লিখে খাতায় তা নথিভুক্ত করা, আলমারীতে সাজানো। এর জন্যে নতুন নতুন আলমারী, র‍্যাক, ঘরের দেয়াল জুড়ে, মেঝে জুড়ে, পড়াশোনার জায়গাটুকু ছাড়া ঘর এখন পুরোপুরি লাইব্রেরী।

সেখানে প্রায় সমস্ত দিন কাটে। তথ্যের পর তথ্য মস্তিষ্কে জমা হয়, তার বিচার-বিশ্লেষণ, নিজের চিন্তা তাতে আরোপ করা, কিছু লিখে ফেলা। কিন্তু এগুলো শুধুই একতরফা গ্রহণ, নিজেকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা। এটাই ঘটে চলেছে সকাল, দুপুর, সন্ধে পর্যন্ত, কখনো কখনো সারারাত গড়িয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে বইয়ের দোকানে যাওয়া, তাতে নতুন তথ্যের সম্ভাবনা থাকলে সেই বই কিনে ফেলা, নথিভুক্ত করে আলমারীতে সাজিয়ে রাখা। কত বই শুধু সাজানোই আছে, পড়া হয়নি, একদিন নিশ্চই পড়া হবে, পাওয়া যাবে আরো নতুন নতুন তথ্য। এই গ্রহণের শেষ নেই, চলবে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, অন্তত যতদিন আগ্রহ বজায় থাকবে তার। এতে একটা আত্মতৃপ্তি আছে, এইরকম ভাবেন অনলবাবু। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে কত বিচিত্র চিন্তা করেছে মানুষেরা, তার কিছু তো জানা যাচ্ছে, নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করতে চান। পৃথিবীর চলমানতায় যে তাৎপর্য, মানুষের ক্রমবিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতিতে যে সূত্রগুলি, তার হদিস মেলে। এই উত্তরাধিকার না জানলে মানুষের বেঁচে থাকার, আরো অগ্রগামী হবার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। অনলবাবু তাই নিবিষ্ট হয়ে এই গ্রহণে মনোযোগী, চিন্তনে পরিশ্রমী, জীবনের যতটা সম্ভব বেশী সময় এতে ব্যয় করা যাচ্ছে, এই বোধে বেঁচে থাকার সারাৎসার খুঁজে পান।

তবু মাঝে মাঝে এই তৃপ্ত মনেও বিচলন ঘটে। এই যে একতরফা গ্রহণ, একমুখী বিচার-বিশ্লেষণ, কোনো বিনিময় ছাড়া এর যাথার্থ কতটুকু! পক্ষের প্রতিপক্ষ না থাকলে এগোনো বোঝা যায় না, এগোতে গেলে চিন্তায় সংঘর্ষ চাই, এভাবেই তো চিন্তাজগৎ বিস্তৃত হয়েছে। গ্রহণে ত্রুটি আছে কিনা, বিচার-বিশ্লেষণে ন্যূনতা আছে কিনা, তার পরীক্ষা হওয়া দরকার, নাহলে এসবের কী মূল্য? একটা মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে, তিনি একা সমাজে বাস করেন না, আরো অনেকের চিন্তার সঙ্গে সহবৎ চাই, তবেই তো তার সামাজিক মূল্য নির্ধারণ হবে, সামাজিক অবদান বলে স্বীকৃত হবে।

পাড়ায় দুচারজন বিদগ্ধ ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। একদিন সবাইকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলেন। অনলবাবু তাঁদের বললেন, আমরা সবাই কাছাকাছি থাকি অথচ বিচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে এইরকম বসা যেতে পারে, কে কী ভাবছি তার বিনিময় হওয়া দরকার, তবেই তো আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

সবাই উদ্যোগের প্রশংসা করলেন, মাঝে মাঝে বসার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করলেন।

উৎসাহী অনলবাবু এতদিনের ভাবনা-চিন্তার রুদ্ধ মুখ খুলে দিতে গিয়ে, যদিও কিছুটা এলোমেলো, তবু সকলেই একবাক্যে অনলের ভাবনাচিন্তার বিস্তৃতি স্বীকার করে বললেন, এভাবে আমরা কেউ ভাবিনি। অনলবাবুর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা হল, বইয়ের আলমারীগুলি দেখে অভিভূত সবাই কিন্তু ওদের সবটাই শুধু গ্রহণ, কোনো বিনিময়ের ভেতরে গেলেন না। কোনো বিষয়ে কেউ ভাবনাচিন্তা করেন বলেও মনে হল না।

এইরকম পরপর কয়েকটি আলোচনা-সভার পরেও যখন প্রতিপক্ষ পেলেন না, অনলবাবুর উদ্যোগ স্তিমিত হয়েছে। পাড়ায় তাঁর সুখ্যাতি হল, দ্যাখা হলে সম্ভ্রমসূচক কথাবার্তা বলেন সবাই, তাঁর স্বস্তি হয় না, আবার রুদ্ধ মুখ হল ভাবনাচিন্তার স্রোত, বিনিময়ের প্রত্যাশা না থাকায় আবার তিনি শুধুই গ্রহণের ভেতরে।

স্কুলের, কলেজের কিছু কিছু বন্ধুবান্ধবের কথা মনে পড়ল। সে-সময় তাদের অনেকের বুদ্ধি দীপ্ত চেহারা, কথাবার্তা ছবির মত ভেসে উঠছে। উৎসাহ নিয়ে যোগাযোগ করলেন ওদের সঙ্গে। ওরা নানা কাজে সবাই ব্যস্ত, তবু মাঝে মাঝে কফিহাউসে বসার বন্দোবস্ত হল। দু'একবার বসার পর বুঝলেন, কেউ লায়ন্স ক্লাব, কেউ রোটারী ক্লাবের কাজকর্ম নিয়ে বিহ্বল, কেউ আবার নানা ধরনের সেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িয়েছে। তবু এর মধ্যে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নিজের ভাবনা-চিন্তার খণ্ড অংশ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কেউ আগ্রহী হয়নি। ওদের মধ্যে প্রমথ, যাকে ছোটবেলায় সবচেয়ে প্রতিভাবান মনে হত, সে তো বলেই ফেলল, দেশের যা অবস্থা, এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা অলস মস্তিষ্কের কাজ। বরং কার্যকরী কিছু করা ভাল, সেটাই জরুরী।

অনলবাবু বলতে চেষ্টা করেছেন, কিছু করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু তার দিশা আছে কিনা এটা তো বুঝতে হবে, না হলে সেসব পণ্ডশ্রম হয়ে যেতে পারে।

প্রমথ হেসে বলল, পৃথিবীতে মনীষীরা অনেক তত্ত্ব জমা রেখেছে, নতুন তত্ত্বের আর দরকার নেই। এখন কাজ চাই, শুধু কাজ।

কাজের কথায় অনলবাবু উৎসাহ পান না। সমস্ত জীবন অন্যের নির্দেশ পালন করে এসেছেন, অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। মনীষীরা অনেক তত্ত্ব জমা করেছেন ঠিকই, তার তো নবীকরণ দরকার, বর্তমান সময়ের উপযোগী করে নিতে হবে। কাজ করবে নতুন প্রজন্ম, যদি কিছু না জানল, ওরা কোন ভিত্তিতে কাজ করবে? কে তাদের দিশা ঠিক করে দেবে?

সুপ্রকাশ, যে মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হয়েছিল, বলল, ঠিকই বলেছিস। কিন্তু কি হয়েছে জানিস, মাথা এখন আর কাজ করে না, প্রমথ-র মত দৌড়ঝাঁপ করতেও ভাল লাগে না। তার চেয়ে বরং আমাদের রোটারি ক্লাবে তোর একটা বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে দিই। ওখানে অনেক বাঘা বাঘা লোক আছে, কর্মবীর, পাশাপাশি চিন্তকও আছে। মেলবন্ধন করতে পারিস যদি দ্যাখ।

অনলবাবু উৎসাহ পেয়েছেন। দু'তিনদিন পরিশ্রম করে বক্তৃতার খসড়া তৈরি করলেন, নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতাও দিলেন বেশ গুছিয়ে। হাততালি পড়ল, খুশী হয়েছে সবাই, ওর জ্ঞানের বিশাল পরিধি, বক্তৃতার দক্ষতা, ভাবনার স্বচ্ছতার কথা বলল কেউ কেউ, শুধু প্রতিপক্ষ পাওয়া গেল না। এরপর পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচী, কোন কোন বাসস্টপে অপেক্ষা-ছাউনি নির্মাণ করতে হবে, কোন রাস্তার ধারে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা দরকার, এইসব আলোচনার

ভেতরে চলে গেছে ওরা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ভাল, এমনকি বুলেটিনে অনলের পরিচিতিসহ ছবিও ছাপা হয়েছে, তবু তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেনি।

তাঁর কাছে এটা বরাবরই দুঃখের যে সংসারের অন্যান্যরা অর্থাৎ স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ওরা এত কাছে থেকেও তাঁর জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আগ্রহ দ্যাখায়নি কোনোদিন, এমনকি ওদের কৌতূহলও নেই। ওরা শুধু দেখেছে, লোকটা বইপত্র, কাগজ-কলম দিয়ে কীসব করে, যত্তো অকাজ। ওদের এই মনোভাব টের পেয়েছেন, তাই ওদের সঙ্গে আদান-প্রদানে ব্যস্ত হননি কখনো।

হঠাৎ তাঁর এক পিসেমশাই-র কথা মনে পড়ল। শুনেছেন, তিনি বইপত্র নিয়েই মজে আছেন। একদিন ফোন করে সময় চেয়ে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। পিসেমশাই হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কী খবর অনলবাবু, এ্যাদ্দিন পর হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল যে! তিনি চট করে গুছিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। তবু দমে না গিয়ে বললেন, অনেকদিন দ্যাখা হয়না, শুনেছি আপনি পড়াশোনা নিয়ে থাকেন, ভাবলাম, সামান্য কিছু যদি জানা যায় আপনার কাছ থেকে।

পিসেমশাই হো হো করে হাসলেন কিছুক্ষণ। ও এই কথা। পড়াশোনা আর তেমন কি, ঠাকুরের বইটই পড়ি। তাতে কি আর তোমার আগ্রহ হবে?

অনলবাবু কিছুটা হতাশ, তবু হাল না ছেড়ে বললেন, ঠাকুরের বই মানে দর্শন টর্শন তো?

আমি শুধু রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ি। তাকে দর্শন বল, মজার গল্প বল, আর আধ্যাত্মিকতাই বল, এই বয়েসে অন্য বই পড়ার রুচি নেই। ওর মধ্যেই সব আছে বুঝলে, আর কিছু পড়ার দরকার নেই। পড়েছ তুমি?

অনেকদিন আগে পড়েছিলাম একবার।

অনেকদিন আগে! তাও একবার, মানে আগ্রহ হয়নি। ও বই একবার পড়লে হয় নাকি, আমি তো রোজ পড়ি, আমার নিত্যসঙ্গী।

হ্যাঁ, ভাল বই ঠিকই, আরো তো অনেক কিছু জানার আছে। ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, এছাড়া কত কত দর্শন, শাস্ত্র, এসব না জানলে......

ঐ একটা বইতেই সব আছে। জীবনের সারাৎসার। বেশী পড়ে কী হবে, গুলিয়ে যাবে। শুধু কথার পিঠে কথা। সময় কাটাতে চাও ক্ষতি নেই, নিজেকে বুঝতে হলে, জীবনকে বুঝতে হলে, অনুভব করতে হলে ঐ একটা বই-ই যথেষ্ট।

অনলবাবু বুঝলেন, এখানে আদান-প্রদান সম্ভব না। অন্য নানা প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। চারপাশে এই রকম বন্ধ্যাদশা দেখে অন্য সন্ধানে তৎপর হলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দু'একটা সভাসমিতিতে গেছেন। একটা সভা হচ্ছিল, বিষয়, আদিবাসী উন্নয়ন। সেখানে এক তুমুল পরিস্থিতি। এই আদিবাসীরা সংরক্ষণের তালিকায় নেই কেন, ওদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট প্রকল্প নেই, অর্থ সাহায্য নেই, রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই, শতকরা এতজন নিরক্ষর, মৃত্যুহার এত বেশী, এসব নিয়ে জোর বক্তৃতা হল, হাততালি পড়ল, কার বক্তব্যে জোর বেশী, আনাচে-কানাচে তা নিয়ে আলোচনা চলল। এরপর খুশি হয়ে সবাই বাড়ি ফিরে গেল।

অনলবাবু অবাক হয়ে ভাবছেন, মূল বিষয় নিয়ে কেউ আলোচনাই করল না। —আদিবাসী যখন, ভূখণ্ডের মূল আদিবাসী এরাই। কেন তারা বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত হল কিভাবে,

স্বাধীনতার এত বছর পরেও সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে কেন, এসব নিয়ে কেউ প্রশ্নই তুলল না, বিশ্লেষণে যাওয়া দূরের কথা। এ তো অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারের দিকে যাত্রা।

অন্য এক সভায় গেছেন, সেখানে বিষয়—সাক্ষরতা। এদিনও জোর বক্তৃতা, পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি। কোথায় শতকরা কতজন সাক্ষর হল, নিরক্ষরদের জন্য আরো কী কী কর্মসূচী, এই কর্মসূচী কোথায় কোথায় পালন করা যাচ্ছে না রাজনীতির কারণে, অথবা যথেষ্ট কর্মীর অভাবে, অন্যান্য প্রদেশ, অন্য দেশ-মহাদেশের তুলনায় তা কতটা অপ্রতুল, এসব নিয়ে গম্ভীর, জোরালো বক্তৃতা করল সবাই। সাফল্যের সংবাদে হাততালি, বক্তৃতার প্রসাদগুণেও হাততালি, আক্রমণাত্মক হলেও হাততালি। তারপর অমুক সালের মধ্যে শতকরা একশোভাগ সাক্ষর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সভা শেষ হল।

অনলবাবু হতাশ হয়েছেন। এসব আলোচনা, পরিসংখ্যান, প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য কি! প্রকৃত দিশা নেই—সাক্ষরতার কী প্রয়োজন, এরপর তারা কী করবে, নিরক্ষরদের সঙ্গে কোন তফাৎ তৈরি করে, প্রকৃত শিক্ষা কী, এইসব কর্মসূচীর মাধ্যমে সেই শিক্ষার দিকে কিভাবে এগোনো যাবে, এসব কোনো প্রসঙ্গ আলোচনায় নেই। শুধু কাজ, কর্মসূচী, সাফল্য-অসাফল্যের কথা। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এরা কেউ জানে না। এতসব কাজ আরো অকাজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, এসম্পর্কেও কোনো চেতনা নেই।

এমনি আর এক সভায়, সেখানে বিষয় ছিল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। যথার্থ কিছু কথা শুনবেন, জানবেন, প্রত্যাশা ছিল। অনলবাবু অবাক হয়ে গেলেন, এরা সংস্কৃতি বিষয়ে কিছুই জানে না। কিভাবে একটি জাতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, ঐতিহ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিভব তৈরি হয়, ধারণা নেই। অথচ কত কথা বলে গেল তারা। কেউ আবেগের সঙ্গে বলেছে, কিভাবে বিদেশী সংস্কৃতি দেশী সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে, কেউ আবার এর মূলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, তার ব্যাখ্যা করল, কেউ বিশ্বসংস্কৃতির অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করল, মূল্যবোধ, অবক্ষয় নিয়ে বোধহীন শুধু কথার পর কথা।

এসব নেহাৎ-ই উপরিতলের ভাবনা। গভীরে যেতে না পারলে আবেগের জন্ম হয় শুধু, হচ্ছেও তাই। সংস্কৃতির অনুসন্ধানে তার দৃঢ়ভিত্তি কতটা, সেই বিশ্লেষণ না থাকলে বাইরের অভিঘাত কতটা সহ্য করতে পারবে, বোঝা যাবে কী করে! সংস্কৃতিরও বিবর্তন হয়, কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় দেশের সংস্কৃতি এ যাবৎ বিবর্তিত হয়েছে, এটা না বুঝে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কেন করছে এরা!

এইসব সভায় গিয়ে অনলবাবুর অভিজ্ঞতা, এরা শুধুই বক্তৃতা করে, হাততালি খোঁজে, অস্মিতার পরিপোষণ হয়। তত্ত্ব জানে না, অনুসন্ধান নেই, মানসিক জারণক্রিয়া এদের মধ্যে কাজ করে না। ফলে সভাসমিতিতে যাওয়ার আর্কষণ কমে গেল। তিনি আবার নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে আত্মমুখী।

এখন দিন ও রাত্রি আবার সেই পুনরাবর্তনে। বইয়ের ভেতরে পৃথিবীকে খোঁজা, মানুষের স্বরূপ আবিষ্কার করা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন অনুসন্ধান করা। এইরকম চর্চায় থাকতে থাকতে একদিন কাজের মেয়েটির দিকে দৃষ্টি পড়ল। প্রতিদিন একই সময়ে আসে, নিঃশব্দে কাজ করে, ঘরটা মুছতে হলে কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে অন্য ঘরে যেতে হয়, স্ত্রী ওকে

মাঝে মাঝেই বকাঝকা করে, কখনো কারণে কখনো অকারণে, মেয়েটি কিছু বলে না, কাজ শেষ হলে চলে যায়। মানুষ হয়েও যন্ত্রের মত ওর ব্যবহার দেখে অনল বিস্মিত, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না মেয়েটি, মুখ তুলেও কখনো দ্যাখেনি। অনলবাবু ভাবছেন, কাজ শেষ হলে মেয়েটি যে বাড়ি ফিরে যায়, সেখানে তারও একটা জীবন আছে। তার সংসার, স্বামী, ছেলে বা মেয়ে আছে। সেই সংসারে নিশ্চই তার মুখটা ওপরে তোলা থাকে, কথা বলে, অন্যকে নির্দেশ দেয়, শাসন করে। ওরা জীবনটা কিভাবে দেখে, কি তার অভিমুখ, পৃথিবীর কোনো খবর ওদের কাছে পৌঁছয় কিনা, ওদের আশা-আকাঙক্ষা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি, আগামী দিনগুলিতে কোন আশ্বাসে বেঁচে থাকতে চায়, এইসব জানার কৌতূহল হল তাঁর।

সেদিন মাইনে নেবার জন্য অপেক্ষা করছে, ওকে ডাকলেন। কিছু মনে কোরো না, দু'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব। মেয়েটি দরজার এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একইরকম মাথা নিচু করে।

পড়াশোনা কতদূর করেছ? উত্তরে মাথা নাড়ল শুধু।

স্বামী কী করে?

রঙের মিস্তিরি।

ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে না?

ছেলে মাধ্যমিক পাশ দিল, মেয়ে কেলাস সিক্সে।

বাঃ খুব ভাল ছেলে, এরপর কী পড়বে?

আর পড়বে না, ওর বাবার সঙ্গে কাজে যায়।

সেকি! আর পড়বে না তা কি হয়? কেন পড়বে না?

আমাদের সামথ নেই বাবু, পড়ার খুব শখ ছিল তাই এ্যাদ্দূর পড়ল। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে জড়তা কেটে গেছে অনেকটাই।

ইতিমধ্যে স্ত্রী দুবার উঁকি দিয়ে গেছে। বুঝলেন, বেশী সময় পাবেন না। একটা গভীর উদ্বেগ ওর মনের ভেতরে। কিছু জরুরী কথা এখুনি বলে নেয়া দরকার।

অনলবাবু শুরু করলেন, দ্যাখো, এই যে জীবন কাটাচ্ছ, এটা জীবিকা। জীবনের কিন্তু অন্য মানে আছে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এই যে বাড়ি-বাড়ি কাজ করছ, তোমার স্বামী রঙের কাজ করে, এ তো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা। না করে উপায় নেই, কিন্তু এটাই সব নয়। তোমরা কাজ করলে, খেলে, ঘুমোলে, ছেলেও কাজ করল, খেল, ঘুমোলো, মেয়েও এরপর কাজ করবে, খাবে, ঘুমোবে। ব্যস, এতেই সব হয়ে গেল? কেন এই জীবন, বুঝবে না? কী লাভ তা হলে বেঁচে থাকায়? এই যে মানুষ হয়ে জন্মেছ, এতকিছু ঘটছে চারিদিকে, কেন তার খবর রাখবে না? ছেলে-মেয়ে পড়বে, আরো পড়বে, জানবে এসব—

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। একপাশে অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রী দাঁড়িয়ে, কাজের মেয়েটি অনড়, স্থির। ও কি শুনেছে ওর কথা, নাকি একটা পাথরের সামনে কথাগুলি আছড়ে পড়ল।

স্ত্রী কাজের মেয়েটিকে মাইনের টাকা দিতে সে নড়ে উঠল। টাকা নিয়ে তারপরই মুখ তুলে বলল, আমাদের আর কী, এই যে ছেলে-মেয়ে বড় করছি, এরও তো সাথকতা আছে

বাবু। বলেই সামনে থেকে সরে গিয়ে বাইরে চলে গেল। স্ত্রী ওর যাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে বলল, কাল সময়মত আসবে কিন্তু। দেরী করবে না।

মেয়েটি চলে গেলে স্ত্রী কাছে এসে বলল, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে? এদেরকে এসব কথা বলার মানে কী? ওদের চাহিদার শেষ নেই, এই যে উসকে দিলে, খাই মেটাতে পারবে তুমি?

অনলবাবু কি তবে ভারসাম্যে নেই! কথাগুলি ভুল বলেছে? অপাত্রে? ঠিক পাত্র তাহলে কোথায়! সবাই তো দিব্যি আত্মসম্মোহে, এমনকি কাজের মেয়েটিও। তবে কি তিনিই শুধু ভুল বিন্যাসে? সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তাকে এখন নতুন বিন্যাসের কথা ভাবতে হবে।

# জীবনের সন্ধানে

একখন্ড জীবন সঙ্গে নিয়ে বসে আছি এই সন্ধেবেলায়। দূরে দাঁড়িয়ে মায়াবী পাহাড়, তার চারপাশে জীবনের স্রোত! মাঝখানে খন্ড জীবন নিয়ে, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ভেতরে বসে আছি। সকালে সূর্যের আলো পাহাড়কে দিয়েছিল গভীর শান্ততা, স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য. দুপুরে তা হয়ে উঠলো তীব্র খরশান, সন্ধেবেলায় ভারাক্রান্ত স্মৃতিমেদুরতা। ক্রমশ রাত্রি এসে মায়া অপসৃত, পাহাড়টা কোথায় যে ডুবে গেল! ডুবে গেছে আমার দ্বীপও, খন্ড জীবনসমেত। এখন এই অন্ধকার সমুদ্রে বোধের বিস্তৃতি নিয়ে জীবনের প্রসারণ দেখি। শুধুমাত্র প্লবতায় ভেসে থেকে, খন্ড জীবনের কোনো অবশিষ্ট নেই আর।

প্রকাশ একদা বলেছিল, জীবন খন্ড হ'তে পারে কিন্তু জীবনে জীবন যোগ করতে হবে, না হ'লে প্রাণের পসরা ব্যর্থ হয়। আর এই কারণেই আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে। আমার বিশ্লেষণ সে শুনে যায় নি। —জীবন আর প্রাণ কি এক? আমেরিকা থেকে নিয়মিত প্রাণশক্তির কথা জানায় আমাকে। ওদের জীবনযাপনের কথা। একতরফাই। বলে, স্থবির বসে আছিস কূপমন্ডুকের মত। দেখে যা, এখানে প্রাণশক্তির কি তুমুল প্রাচুর্য। ক্ষয় নেই, জন্ম দিচ্ছে অসংখ্য প্রবাহ, গ্রহণ করছে অবারিত। খন্ডিত জীবন আগলে রেখে কি লাভ? যদি না জীবনের ভেতরে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

জোর তর্ক বেঁধেছিল শুভ্রদীপের সঙ্গেও, যৌবনের সেই রক্তঝরা দিনে। বলেছিল, জীবনকে নিয়ে কৃপণ হিসেব কেন? খন্ড জীবনের কোনো অর্থ নেই। আরো আরো জীবনের সাথে মেলাতে হবে। তবেই তো গড়ে উঠবে কালাপাহাড়, ভাঙ্গবে অচলায়তন। না হ'লে এই খন্ড জীবন নিজেই ভাঙ্গবে, ভাঙ্গতেই থাকবে শুধু। অবশেষে থাকবে না আর।

বলেছিলাম, খন্ডজীবন চোখেই দেখছ শুধু। এ দ্যাখায় ভুল আছে, বড় জীবনের অংশ সেটা, অচ্ছেদ্য বন্ধনে। বড় জীবনে যাবার আগে এই অংশজীবন জানতে হবে, না হ'লে তলিয়ে যাবে। একাকার জীবনে থাকা না থাকায় তফাৎ কি?

অত শত বুঝি না। তবু বুঝি ওটা কৃপণতা, আত্মবিলাসের ছদ্ম-মোড়ক। কৃপণরা ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকে। তাদের বাদ দিয়েই জীবনের স্রোত বয়ে যায়। বড় জীবনের ডাক আমি শুনেছি, আমাকে যেতে হবে। অন্য উপায় নেই আমার।

তবু বলেছিলাম, ব্যক্তির মূল্য দিয়েই সমাজ মূল্যবান হয়। সমষ্টি শুধু গ্রহণ করে। যে কোনো যুদ্ধ ই ব্যক্তি-নির্দেশিত। সমাজ সেই নির্দেশ পালন করে। তোর প্রতিভা আছে, সমষ্টির কাছে পৌঁছনোর আগে নিজের মূল্য বুঝে নে। না হলে কোথায় তোর ভূমিকা জানা হবে না। ভুল লোক ভুল জায়গায় গেলে ব্যক্তির ক্ষতি, সমষ্টিরও ক্ষতি।

শুভ্রদীপ ক্রুদ্ধ হয়েছিল। স্বার্থপর, ভাববাদী, প্রতিক্রিয়াশীল—এই সব নানা অভিধায় আমাকে চিহ্নিত করে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এরপর কেটে গেল তিরিশ বছর, আজও

ফিরে আসেনি। ওর খন্ড জীবন বড় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে গিয়ে, কিভাবে তা সম্পন্ন হ'ল সে হদিস আমার কাছে নেই। তবু ব্যক্তি শুভদীপ আমার কাছে আজও অম্লান। ওর প্রতিভা, মেধা, তীব্র জীবন-স্ফুলিঙ্গের চেয়ে অনেক অনেক বেশী সম্পন্ন ছিল, মেলবন্ধন হ'ল না বলে সমন্বয় ঘটতে পারেনি। আমি জানি, আমাকে যে সব অভিধায় চিহ্নিত করেছিল, ওর বিশ্বাসে মিথ্যে নয়, আমার কাছে তা অপবাদও নয়। ওর অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষণগুলির অন্য রূপান্তর ঘটিয়েছে। ওকে দোষ দিতে পারি না। ওর কাছে সময় ছিল না, সময়-সংকোচনে চলে গিয়ে, এইভাবে পৃথিবীতে কত ভুল ব্যাখ্যাই না তৈরী হয়েছে। আমি এর মর্ম বুঝেছি, জীবনকে স্ফুলিঙ্গ হ'তে না দিয়ে এই খন্ড জীবনকেই গড়তে চেষ্টা করছি। অথচ এই খন্ড জীবন নিয়ে এরপর কি করবো আমি, আমার কাছে তারও কোনো দিশা নেই।

দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতার পর অনিমেষকে আমি চিনতে পারিনি। আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর ওর চোখের হাসি, নাকটানার অভ্যেস দেখে চকিতে বলে উঠেছিলাম, 'আরে অনিমেষ!'

আগের মতই হাত তোলার ভঙ্গি করে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, যাক চিনতে পেরেছিস তাহলে। বাঁচালি।

ভীষণ মেধাবী অনিমেষ, স্কুল ফাইনালে প্রথম, আই এস. সি.তে প্রথম, বি.এস. সি.-র ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম অনিমেষ, তারপর আরো বেশী পড়াশোনা করতে বাঙ্গালোর গেল। তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সময়। মাঝে একবার একটি ঘোষণাপত্র সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিল। অন্য একটি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যতর জীবনযাপনের ঘোষণা ছিল সেই পত্রে। অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। ঝলমলে পোষাকে অনিমেষের দীপ্তি নতুন জীবনের উদ্দীপ্ত ভাবনায় ঠিকরে উঠছিল বারবার। অনেক পরিচিত অপরিচিতরা সাক্ষী ছিল সেদিন। ওকে নতুন জীবনের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে আসার পর এই প্রথম ওর সঙ্গে দ্যাখা। ঘন চুল সরে গিয়ে প্রশস্ত টাক অপরিচিতি বাড়িয়ে তুললেও স্মিত হাসিটুকুই ফিরিয়ে দিয়েছে পুরনো পরিচিতি। পরবর্তী জীবনের সম্প্রসারণ বিষয়ে ওর কোনো তথ্য আমার কাছে ছিল না। এখন গোলাকৃতি ওর শরীরে তার হদিসও নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছে তোর জীবন, তার সম্প্রসারণ?

কেমন হতাশ গলায় বলল অনিমেষ, আমার জীবন নিয়ে আর ভাবিনা, কোনোরকমে কেটে যাচ্ছে। তিন বছর আগে স্ত্রী বিয়োগ হল, ছেলে আমেরিকায় বছর সাতেক, ওর মায়ের কাজের সময় এসেছিল, আর আসবে ব'লে মনে হয় না। মেয়ে বাঙ্গালোরেই আছে, বিয়ে করেছে ওখানকার এক ছেলেকে, একসঙ্গেই চাকরী করে। একটা ছোট্ট বাড়ী করেছি, সময় সুযোগ পেলে আসিস, আমার কার্ডটা রেখে দে। কলকাতা এসেছিলাম শ্বশুরমশায়ের শেষ কাজে, পরশু ফিরে যাব। আজকাল কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই, বড় একা হ'য়ে আছি। কলকাতা আসতেও উৎসাহ পাই না।

অনিমেষ কখনো এত কথা বলত না। তাও এভাবে একসঙ্গে। শুনতে শুনতে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম। ও কথা শেষ করতে সম্বিত ফিরে এসেছে। বললাম, চল, কোথাও বসে কফি খাই, অনেকদিন আড্ডা দেয়া হয় না।

নারে, খুব তাড়া। চার পাঁচটা কাজ আছে। আজই শেষ করতে হবে। কতদিন বাদে দেখা হ'ল, খুব ভাল লাগছে জানিস, কিন্তু উপায় নেই।

অনিমেষ চলে গেল। একা-একা হেঁটে কফির দোকানে এসে বসেছি। কেমন এক উদাস ভাবনা আমায় আচ্ছন্ন করল।—জীবনকে নিয়ে জীবনের কি অদ্ভুত ব্যবহার! অনিমেষের কাছে নিজের খন্ড-জীবনের হদিশ নেই। জীবনে জীবন যোগ করতে গিয়ে, কোন প্রাণের পসরা ও সাজাতে পারল তার হিসেব নেই। দু-একটা পসরা যা সাজিয়েছিল, কেউ হারিয়ে গেছে, কেউ ছিটকে সরে গেল অনিমেষের ভাঁড়ার শূন্য করে। গভীর শূন্যতার ভেতরে এখন শুধুই তাড়া, নিজের জীবন থেকে পালাতে পালাতে অন্য জীবন-সন্ধান। নতুন কোনো পসরা-নির্মাণে উৎসাহ নেই তার।

আমার আত্মসম্মোহ চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। জীবনে জীবন যোগ হয় কোন্ অলৌকিকে? প্রকাশ যে বলে গেল, না হলে প্রাণের পসরা সাজানো যাবে না, অনিমেষের তবে কি হল! জীবন কি কণা-তত্ত্ব অনুসরণ করে! জীবনের সঙ্গে জীবনের সংঘাত, খণ্ডজীবন ক্ষয় করে, পসরাগুলি ছিটকে যায় নিয়ন্ত্রণহীন। এ তো জীবনের তত্ত্ব নয়, প্রাণের অহরহ যথেচ্ছ খেলা। অথচ আমার বোধে জীবন আর প্রাণ সমার্থক নয়।

খণ্ডজীবন নিয়ে তাহলে কি করি এখন! প্রবল বেগে চারপাশে জীবনের বহুমুখী স্রোত। স্রোত থেকে নিরন্তর হাতছানি দেয়, কোনটাই স্থির নয়, শুধুই বিভ্রম, সেখানে নিজেকে মেলাতে পারি না। ঐ দূরে দাঁড়িয়ে মায়াবী পাহাড়, সূর্যের আলোয় যার দিব্য উজ্জীবন, অন্ধকার হলে অতলান্তে ডুবে যায়। আমাকে ইশারা করে, সেখানে নিষেধ—হারিয়ে যেও না, হারিয়ে যেও না তুমি। হারিয়ে যাবার বড় ভয়, দ্বীপের ভেতরে তাই চুপ করে বসে থাকি।

কখনো কখনো তুমুল ঝড়ে উত্তাল হয় জীবনের স্রোত। নির্জন দ্বীপের ভেতর খণ্ডজীবন ডুবুডুবু প্রায়। দিশাহারা আতঙ্কিত ছোটাছুটি করি। অস্মিতার সব কিছু তছনছ হয়, বাঁচার হদিস থাকে না। এরপর ঝড় থেমে গেলে ছন্নছড়া অবশেষ, উর্বর জমিতে ফের নতুন ফসল গড়ে তুলি। এই বৃত্তে ডুবে-থাকা আমার জীবন, এ খণ্ডজীবন। দূরে থাকে মায়াবী পাহাড়। তার অমোঘ আশ্বাস। এভাবে কি বাঁচবে মানুষ? খণ্ডজীবনের বৃত্তময় উর্বরতা থেকে উৎপন্ন ফসল, তার প্রাণের পসরা কোথায় বিকোবে! তবে কি প্রকাশের মতই জীবনের জয়গান গেয়ে যেতে হবে? অথবা শুভ্রদীপের মত। জীবন-স্ফুলিঙ্গ হয়ে হারিয়ে যাওয়া, নিবেদন মহাজীবনের স্রোতে। অথবা যেভাবে অনিমেষ, নিজেকে ক্ষয়িত করে প্রাণের পসরা উৎপাদন, তারপর ছিটকে যাওয়া নিয়ন্ত্রণহীন।

আমি জানি না। সাক্ষীর মত দূরে দাঁড়িয়ে মায়াবী পাহাড়। আশ্বাস দেয় না। দিনের শেষে অতলান্তে ডুবে যাবার আগে শুধু বলে, হারিয়ে যেও না, জেগে থাকো। আবার আসব আমি।

দ্বীপের ভেতরে বসে বসে অন্য জনপদ চোখে পড়ে। খবরের কাগজ পড়ি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। যেমন আজ চোখে পড়ল প্রথম পাতায়—কোনো এক গ্রামের মানুষেরা আক্রান্ত—খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ। ভেতরটা কেঁপে উঠেছে। কোথায় কোন্ দূর গ্রামের কথা, তবু আলোড়িত আমি! এরকম কেন হয়! কোন্ যোগাযোগে? ভেতরে ভেতরে তবে কি যোগসূত্র থেকেই যায়? যেন মনে হল, আমিও সেভাবেই আক্রান্ত হয়েছি। এখন এই যে দ্বীপে বসে আছি, চারপাশে জীবনের বহমান স্রোত। দূরে দূরে জনপদের বিস্তার। এসব কোন্ অর্থ বহন করে? যে সংবাদে অন্তঃস্থল নড়ে গেল, হয়তো ঘটেছে ঐসব জনপদেরই

কোন একটায়। প্রত্যক্ষ নয়, অথচ পৌঁছে গেছে খণ্ড জীবনে। তার অনুভূতিতে। এই অলৌকিক ঘটল কি ভাবে!

সামনে জেগে উঠেছে আবার সেই মায়াবী পাহাড়। আমি জানি, দিনের শেষে অতলান্তে ডুবে যাবে। কোথায় যায় ও। কোথা থেকে জেগে উঠে আমাকে জাগায়? শোনা যায় পৃথিবীতে সমুদ্রের জলরাশির ভেতরে কখনো নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে, কখনো পুরনো দ্বীপ ডুবে যায়। ডুবে কোথায় যায়, কোথা থেকে উঠে আসে আবার! ভাবতে ভাবতে আমার মন আলোড়িত হয়ে উঠছে। মায়াবী পাহাড় কি এভাবেই তার হদিস দিতে চায়—

সফেন জলরাশির ভেতরে একদা জন্ম নিয়েছিল এই দ্বীপ, চারপাশে দ্বীপের সমষ্টি, দেশ মহাদেশ। জলের ওপর দিয়ে তারা নিত্য চলমান। এ ওর কাছে যায়, সে তার কাছে আসে, জীবন-স্রোতের ভেতরে এভাবেই জন্ম নিল দ্বীপ, পরিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলি, তাদের খণ্ডজীবন। এতকাল ধরে দেখছি তো, কোনো দ্বীপের কাছে পৌঁছব বললেই পৌঁছনো যায় না, জীবন-স্রোত যেখানে নিয়ে যাবে, যেতে হয় সেখানেই। কত পরিচয় অপরিচয়ে ঢাকা পড়ে গেল। পাশাপাশি কত অপরিচয় এসে পরিচিত হয়েছে। বোধের সন্ধানে ভেসে জীবনের স্রোত বেয়ে যখন গিয়েছি সেই মরুতীর্থের দেশে—নিষ্পত্র শরীর তার। সেই তীব্র অপরিচয়ের ভেতরেও ফসল তো ফলিয়েছি আমি! অথচ ভোগ্য হল না কারও! পসরা সাজান হল, বিনিময় নেই। হতাশ হইনি তবু। নতুন তীর্থের দিকে আবার গিয়েছি। এবার সম্পন্ন সেই দেশে পসরার ছড়াছড়ি—কত যে দাবীর ভিড়, তীব্র কোলাহল। কোলাহলের ভেতরে থাকতে থাকতে অনায়াস-বিনিময়, বোধের ভেতর তার সঞ্চার বুঝিনি। অনুভবে গাঢ় রেখাপাত নেই, বিহ্বল হয়েছি শুধু, বিভ্রম বেড়েছে। এইসব অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসে এই দ্বীপের ভেতরে আবার ফিরেছি আমি। মায়াবী পাহাড় ডেকে বলে, কেমন দেখলে সব? কোথাও কি খুঁজে পেলে বিনিময়?

এখন অভিজ্ঞ আমি নির্দ্বিধায় উত্তর দিই, বিনিময় চতুর্দিকে। সে তো শুধু প্রাণের পসরা সাজিয়ে পারস্পরিক বিনিময়। জীবন গভীরে থাকে শুধু অনুভবে, তার বিনিময় হয় না তো। জীবন কিভাবে প্রাণের পসরা হয়, তার হদিস দিতে পার কি?

পাহাড়ের স্থির স্থাপত্যের মায়াবী রহস্যময় চোখ ইসারায় বলে, আমার বিভব দেখছ না? আমার এই চোখের মুগ্ধতায় দ্যাখ, জীবনের স্রোত বয়ে যায় অবিরাম সমুদ্রের মত। এর মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে কত জীবনের অসংখ্য বিভব। নিজের খণ্ডজীবন বুঝে নাও আগে।

বুঝে নিতে গিয়ে প্রকাশকে মনে পড়ে। খণ্ডজীবনের হদিস কি ওর কাছে ছিল? বিভব না জেনে প্রাণশক্তির কথাই বলে গেছে শুধু। অনেকদিন খবর নেই ওর। কোন্ অবস্থানে রয়েছে এখন? মায়াবী চোখের ইশারায় নিজের বিভব না জেনেই জীবনীশক্তির কাছে সমর্পণ করেছে নিজেকে। জীবন ও প্রাণের তফাৎ না বুঝে, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষয় করে ফেলেছে নাকি খণ্ডজীবন? ওকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে কোনোদিন? অপেক্ষায় আছি, যদি ফেরে, জেনে নিতে হবে সেই প্রাণের সংবাদ, জীবনের অবশেষ।

শুভ্রদীপ কোথায় এখন? জীবনে জীবন যোগ করে গড়ে তুলবে মহাজীবন, ভেবেছিল একদিন তা কালাপাহাড় হয়ে ভেঙ্গে দেবে অচলায়তন। এই প্রতিজ্ঞা কি আজও তার বুকের

ভেতর জেগে আছে? নিজের জন্য কিছু অবশেষ না রেখে সেই উদারতা কোন্ বিনিময় পেল? স্ফুলিংগেরও বিভব থাকে,— মুহূর্তের। সেই খণ্ডজীবন কি অটুট এখনো? বড় ইচ্ছে করছে জানতে, কতটুকু অবশিষ্টে শুভ্রদীপ আজও বেঁচে আছে। অনেকদিন খবর নেই, অপেক্ষায় আছি, একদিন দ্যাখা হলে জেনে নেব। —অন্য জীবনের সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ-জীবন কিভাবে যুক্ততা তৈরী করে।

ইদানীং তবু তো অনিমেষের সঙ্গে দ্যাখা হল। অন্য জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে নিয়ে নিজের হদিস নেই। প্রাণের পসরাগুলি চিহ্ন হয়ে শুধু। অথচ ওর জীবনের বিভব ছিল, খোঁজ রাখত না। অন্য জীবনের স্রোতে চূর্ণ হয়েছে সে। খণ্ড জীবনের কথা ভুলে গিয়ে, নিজস্ব বিভবহীন একা। জীবনে জীবন যোগ হলে কোন অঙ্কে শূন্য হয়ে যায়, এই তত্ত্ব কোনোদিন বুঝে উঠতে পারব না, তাই জেনে নিতে চেয়েছি ওর কাছে। অথচ ও নিজের স্থাপত্যে নেই। উত্তর না দিয়ে চলে গেছে অন্য স্থাপত্যের কাছে।

সূর্যের তেজ ধীরে ধীরে কমে আসছে। মায়াবী পাহাড় ধূসর এখন এই পড়ন্ত বেলায়। আমার চোখেও কি সেই মায়ার ঘোর! আমি দেখছি, মহাজীবন ঘিরে ধরেছে আমায়, তার মাঝখানে এ খণ্ডজীবন তার স্বতোৎসার হারিয়েছে। ক্রমে ক্রমে মায়াবী পাহাড় ঘনিষ্ঠ হয়েছে আরো। স্বগত উচ্চারণে বলছে, এমন বিষণ্ন কেন? মহাজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নও তুমি। বিভব বজায় রেখে প্রাণের উৎসার দেখ। বাইরে জীবন-স্রোত বয়ে যেতে দাও। চলমান দ্বীপের গভীর খুঁজে নাও অতলান্তে, সেখানে প্রবহমান প্রাণের স্পন্দন, বিলম্বিতে পৌঁছে যায় জীবনের কাছে।

দিনের অবসানে ক্রমশ রাত্রি নামে। মায়াবী পাহাড় অপসৃত। চরাচরের ভেতরে একা বসে আছি,—নির্বেদ ভূষণ। এখন কি যাত্রা শুরু হবে! কোন সেই শৈশবের অন্ধিসন্ধি খোঁজা!—আমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে, কিছুই জানিনা। শুধু জানি এ সন্ধানে ফিরে আসা নেই।

# লক্ষ্য-অভিমুখে

চোখ দুটি বন্ধ করলে আজও সেই দৃশ্য দেখতে পাই।—বহুদূরে স্থাপিত কালো একটি বিন্দু। বড় হচ্ছে, ক্রমে আরো বড়, গোল-আকার ছেড়ে আয়তাকার, তাতে জাগছে নানা বিভঙ্গ—একটা মানুষ-আকার, হাতে পিস্তল, আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আগে ভয় পেতাম। মৃত্যুর আশঙ্কায় কাহিল হতে হতে, তারপরই চোখ খুলে ওপরে সোজা ঘুলঘুলিটা। এক চিলতে আকাশ আর কিছু আলো, ছবির মত ডানপাশে চায়ের কাপ-হাতে দাঁড়িয়ে আছে মা।

মা-কে দেখে কী যে স্বস্তি। আঃ।

ক্রমে অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, বিন্দুটি প্রতিপক্ষ যদিও, সরাসরি আঘাত করতে পারবে না। অন্য দেশ-কাল মাত্রায় ওর অবস্থান। আমার ভয় কেটে গেছে। এরপর থেকে প্রয়োজন হলে চোখ বন্ধ করে বিন্দুটির ক্রম-রূপান্তর, চোখ খুললে স্বস্তিতে ফিরে আসা। এসবই এখন সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে। এই দুটি অবস্থানের তারতম্য বুঝে নেয়া প্রয়োজন ছিল, তাই বারবার পরীক্ষা করতে হয়েছে।

এর বিজ্ঞান বুঝে নেবার পর এই প্রয়োজন আরো স্পষ্ট হল। প্রকৃত অর্থে আমরা কেউ নিজেদের লক্ষ্য ঠিকঠাক জানি না। প্রতিপক্ষ আসে, মুখোমুখি হয় না, শুধু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। দৈহিক যেহেতু নয়, সম্পূর্ণ মানসিক, তাই সন্ত্রস্ত হই। ফলে প্রাণপণে তা অতিক্রম করার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। একসময় সফল হলে সেই লক্ষ্য-অভিমুখে। লক্ষ্য অদৃশ্য হলে আবার প্রতিপক্ষ, নতুন লক্ষ্য...। সমস্ত জীবন ধরে এইভাবে সাফল্যে, ব্যর্থতায় লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকি। এই বিজ্ঞান জেনে প্রতিপক্ষ নিয়ে আর আশঙ্কা থাকল না, লক্ষ্য-অভিযান বরং নির্দিষ্ট হয়েছে। তখন এমন অবস্থা, প্রতিপক্ষ যুতসই না হলে তাকে সৃষ্টি করে নিতে হত।

এই প্রক্রিয়ার ভেতরে থেকে সেই পুরনো দৃশ্যটাই এখন নিজের প্রয়োজনমত সৃষ্টি করেছি।—বিন্দু বড় হতে হতে নানা বিভঙ্গে পিস্তল-হাতে মানুষ এখন নেই। দূরবর্তী থেকে সেই মানুষটিই সোজা-শিরদাঁড়া অথচ উদাসীন, চোখে স্বপ্ন নিয়ে তার সার্বিক অথচ ক্ষুদ্রতম অবয়ব ক্রমে বড় হয়, বড় হতে হতে আমার মুখোমুখি হলেই জেগে উঠি। নিজের অস্তিত্বে তাকে জড়িয়ে নিয়ে আমার যাত্রা সুরু হয়। আমার ভেতরে কোথায় যেন সে লুকিয়ে থাকে।

এইভাবে দীর্ঘপথ চলতে চলতে একসময় ক্লান্তি ও অবসন্নতার ভেতরে, কিংবা অন্যমনস্কতার সুযোগে, হয়ত বা ঘুমিয়ে পড়ার অবকাশে সেই লোকটি আমার ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে। তারপর কোথায় যে চলে যায়! আমার তখন কোনো লক্ষ্য থাকে না।

ক্লান্তি দূর হলে চোখদুটো বন্ধ করি, এবং আবার সেই লোকটা, যেভাবে সৃষ্টি করেছি সেই বিভঙ্গসমেত। তার ক্ষুদ্রতম অবয়বটি দৃশ্যমান হয়। আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, আমার লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। একসময় প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়লে—

এভাবেই প্রবাহিত এযাবৎ আমার নিজস্ব জীবন-কাহিনী। সবসময় নয়, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার ভেতরে লোকটির কথা ভাবি। কে এই লোকটা? কোথা থেকে আসে? কিভাবে আমার ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে! আমার অস্তিত্বে আবার সম্পৃক্ত হয় কেন? দুজনের পরিক্রমা প্রায় এক হলেও, বিপরীত চরিত্রদুটির মধ্যে মূল পরিক্রমা কার? কারই বা ছায়া-পরিক্রমা!

এই সমস্যাও এরপর থাকল না। সাধারণভাবে দুটো অস্তিত্ব এখন পৃথক নয়। লক্ষ্য-নির্মাণে একটি অন্যটির পরিপূরক। এটি হয়ে উঠেছে প্রায় সহজাত ঘটনা। ফলে আমার জীবন মূলত এক দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা, এটাই লক্ষ্য-অভিমুখ। মনে পড়ে না কবে এই পরিক্রমা সুরু, কবে এই পরিক্রমা শেষ হবে তারও হদিস নেই আমার কাছে। কতদূর এসেছি, কতটা পথ অতিক্রান্ত হল, সে হিসেবও নিরর্থক আজকাল। ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে নিই, পথে নামি, আমার চলা সুরু হয়ে যায়। একের পর এক ইলেকট্রিক পোস্ট, নানা নক্‌সাখচিত বাড়ি, রাস্তার মোড়, নানা দিকচিহ্ন আমার পেছনে চলে যায়। এদের সংখ্যা আগে গুণতাম, আজকাল গুনি না। বুঝে গেছি, গুণে এদের শেষে পৌঁছনো যাবে না। এরা অনন্ত, এদের গোনায় কোনো সাফল্য নেই। আমায় ক্লান্তই করবে শুধু। নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিই, কোথাও পৌঁছব কিনা জানিনা, পৌঁছনোর কথা ছিল কিনা তা-ও জানি না। পথের সমুদ্রে শুধু ভেসে যাই। হয়ত এভাবেই কোনো একদিন পথের স্বাভাবিক দিকচিহ্ন হয়ে যাব।

পথে নামলে ইদানীং তাই মনে হয়, এটা আমার স্বদেশ। অনুকূল স্রোত পেয়ে যাই, গভীর নেশায় আচ্ছন্ন থাকি। তার রোঁয়া-ওঠা শরীর দেখতে দেখতে, দুপাশে বাড়ি, কখনো গাছ, কখনো মাঠ দেখতে দেখতে, মানুষের সুখ-দুঃখ, অমনস্ক ঘুম, কখনো সুন্দর কখনো কুৎসিত, কখনো উদ্‌ভ্রান্ত কখনো রহস্যময়, এইসব মানুষের মুখ ক্রমাগত দেখতে দেখতে আমার পথ অতিক্রান্ত হতে থাকে। এক একদিন বড় গুমোট হলে ঘামে-ভেজা গেঞ্জী জামা, প্যান্টের ভেতরের ঘাম-চটচটে পায়ে অস্বস্তিকর চলা, তবুও অধিকাংশ দিনই হাওয়ায় ভর রেখে চলি, সমস্ত শরীর এক আশ্চর্য স্পর্শে আন্দোলিত হয়। কখনো রোদ, কখনো শীত, কখনো বৃষ্টি, ছাতা সঙ্গে থাকে তবু এদের স্পর্শ-অনুরাগ থেকে বঞ্চিত হয় না শরীর। এইভাবে প্রায়-অনাবৃত প্রকৃতির সব উদারতা-অনুদারতার সঙ্গে পরিচিত এই সেই পথ। তার সঙ্গে সহবতে থাকা আমার পা দুটো, পা আমার শরীর বহন করে চলে, তার ভেতরেই কোথাও সক্রিয় থাকে মন, যে রসদের জোগান দেয়, যাকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি, সমৃদ্ধ করে অহংকার।

এভাবেই তো আমার স্বদেশ আমার পথ, আমার দ্যাখা আমার শোনা;আমার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলা, অভিজ্ঞ হওয়া, কোনো-না-কোনো একদিন লক্ষ্যে পৌঁছে যাব এই আশ্বাসে অবিরাম পথ বেয়ে চলা।

এই পথে কতদিন কতকিছু ঘটেছে। এই পথেই একদিন সহসা বদলে গিয়ে অমলেশ হয়ে গেল বিষাণ। কেমন উদ্ধত ওর মুখ-চোখ।—অমলেশ মরে গেছে, এখন আমি বিষাণ। এই সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, তোর কিন্তু বেঁচে থাকার কথা ছিল না। আমাদের লড়াই তুই কি বুঝিস? কেন এর বিরুদ্ধে কথা বলিস? পরশুদিন লাইব্রেরীর দরজা পেরোচ্ছিলি যখন রিভলবারের গুলিটা তোর হাতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, তবু

হল। তোর বেঁচে থাকার কথা ছিল না, তবু বেঁচে আছিস। তখনই বুঝেছিলাম, ছোটবেলা থেকে তোর কাছে আমার যে বিশাল ঋণ, এবার তা শোধ হল। লড়াইতে যোগ দিতে না পারিস, বিরুদ্ধে যাবি না। মনে রাখিস, দ্বিতীয়বার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমি কি ভয় পেয়েছিলাম?—জানি না। আমি কি নিজেকে নতুন করে গড়েছিলাম?—মনে নেই। আমার পথ সেদিন থেকে নতুন লক্ষ্যে প্রসারিত হয়েছে।

আরো একদিন। পথের মোড়ে ইন্দ্রাণীকে দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম। ও অনেক বদলে গেছে। আমার দুঃখ অনুভব করে ইন্দ্রাণী বলেছে, এরকম হয়, হতেই পারে, সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তোমার লক্ষ্য আমার লক্ষ্যে মিলতে পারছে না, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়, এটাই ঘটনা। ধরে নাও আমি ইন্দ্রাণী নই, বর্ণালী বা অন্য কেউ। তোমার তাহলে দুঃখ থাকবে না।

ইন্দ্রাণী নয়, বর্ণালী বা অন্য কেউ, নিজের সম্পর্কে ইন্দ্রাণী এটা ভাবতে পারল, আমি অবাক। তবু ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে, ওর ভিন্ন-অভিমুখ সত্বেও নিজস্ব অভিমুখে এগিয়ে গেছি, মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আমার চলা থামেনি। ইন্দ্রাণীর কত বদল হল পথে, কতভাবে যে ওকে গড়েছিলাম! মাঝে মাঝে নানা পথের বাঁকে এরপর ওকে দ্যাখা গেছে, সে অন্য ইন্দ্রাণী, নিহিত-সূত্র ধরে চিনেছি। ওকে বলেছিলাম, আমরা তো বন্ধু হতে পারি, পারি না?

ইন্দ্রাণীর সপ্রতিভ জবাব, না, পারি না। অনেক অসুবিধে, এছাড়া এসবের কোনো মানে নেই। তুমি সব ভুলে যাও।

ভুলতে পারিনি। ইন্দ্রাণী আজও রয়ে গেছে আমার সঙ্গে, নতুন নতুন গড়নের ভেতর দিয়ে।

এমনি করেই হঠাৎ একদিন সুকোমল হারিয়ে গেল। একসঙ্গে দীর্ঘপথ চলতে চলতে পথের মাঝখানে তার শরীর রেখে, সুকোমলকে আর দ্যাখা গেল না। এমন হবার কথা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই এক চিন্তাভাবনায়, আমাদের খেলাধূলো, পড়াশোনা, একইসঙ্গে চাকরি, কত স্বপ্ন দ্যাখা, কিছু একটা গড়ে তোলার ভাবনা। এভাবে ওর হারিয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারিনি। ওকে অনেক প্রশ্ন করার ছিল, বিকল যন্ত্র-শরীরটা সে প্রশ্নের উত্তর দেবে কি করে! শ্মশানে দাহ করে যখন ফিরছি পথটা মনে হল বড় রুক্ষ, বড় ধূসর।

কত কথা মনে হয়েছিল সেদিন। আসলে আমাদের সবাইকে একা পথ চলতে হয়। কখনো কেউ সঙ্গী হলে, মুখোমুখি না হয়ে পাশাপাশি থাকা ভাল। যে-কেউ যখন খুশী সরে যেতে পারে বিদায়-সম্ভাষণ ছাড়াই। মুখোমুখি হয়ে পড়লে সরে যেতে বড় কষ্ট। যে অন্য পথে চলে যায় তার কষ্টের কথা জানা যায় না, তখনো যে পথে থাকে, ভারী মনে হয়। সুকোমল এখনো আছে আমার সঙ্গে বুকের ভেতরটা ভারী করে, তাকে বদলানো যায় না, তার কিছু অংশ বাদ দিয়ে, নতুন কিছু জুড়ে হয়ত সহনীয় করা যেতে পারে, কিন্তু নিজেকেও তবে নতুন করে গড়ে নিতে হবে। আজ এই প্রত্যন্ত সময়ে নিজেকে নতুন করে গড়া অসম্ভব। লক্ষ্য-অভিমুখ বদলে যাবে, নিজেকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে সুবিমল সুবিমলই থাক, অবিকৃত, অমলিন।

এখন আমার এই দীর্ঘপথ আর জীবনযাপন সমার্থক হয়ে আছে। একে একে সবাই বদলে

গিয়ে অথবা সরে গিয়ে একাকী আমার পথচলা। তাদের বদল, তাদের সরে যাওয়া নিজের ভেতরে নতুন করে সৃষ্টি করেছি, নিজের মত সঙ্গী করেছি। এই সঙ্গসুখ অন্যমাত্রায় পৌঁছে গিয়ে আত্মবিলাস হয়ত, তবু থেমে নেই আমার এগিয়ে যাওয়া। আমি চলেছি লক্ষ্য-অভিমুখে। মাঝে মাঝে পিস্তল হাতে লোকটিকে দেখতে পাই, অতীত-অনুষঙ্গ ফিরে আসে। সে এখন প্রতিপক্ষ নয়, বন্ধুর মতই আমাদের ব্যবহার। অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, আমরা হাসাহাসি করি, জীবনকে নিয়ে মজা, তবু সে আমার সঙ্গী হতে পারে না। তাকে বলি, অনেক তো হল, অনেক নাটক, কী সারাৎসার নিয়ে বেঁচে আছি বলতো।

লোকটি বলে, এই অন্বেষণই সারাৎসার। এবার নির্মেদ চলা তোমার। আত্মসম্মোহন।

বুঝতে পারি না ঠিক। সারাৎসারের খোঁজে লোকটিকে একপাশে অথবা পেছনে ফেলে আরো এগিয়ে যাই। একসময় বুঝতে পারি, এই মধ্যবর্তী পথে যা কিছু ঘটেছে শুধু বিভ্রম। লক্ষ্য-অভিমুখ কিভাবে যেন হারিয়ে গেছে, সেটাই এখন পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই সারাৎসারের দিকে নিজেকে চালিত করি।

এইভাবে আমার একাকী চলার পথে যখন তীব্র সংহরণ, দূরবর্তী সেই মানুষটি, যে আমার ভেতরে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে গুপ্ত রেখেছে দীর্ঘকাল, সে হঠাৎ নড়ে ওঠে। তার ঘুম ভেঙেছে নাকি! আড়মোড়া ভেঙে সহসা সে আমার ভেতর থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়, মুখোমুখি হয়।

সে বলে, শেষ পথটুকু এবার পাড়ি দিতে হবে, চল এগোই।

শেষ পথ কেন?

শেষ পথই তো। অনেক দ্যাখাশোনা হল, বিনিময় হল, বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি করলে কতকিছু। ভালোয় ভালোয় এবার শেষটুকু সম্পন্ন হোক।

তুমি আমার মুখোমুখি, শেষ কোথায় দেখছি না তো। শেষের কথাই বা বলছ কেন?

সুরু যখন করেছিলে, শেষ তো অনিবার্য। অন্যের পথ কেন আটকে রাখবে তুমি?

চারপাশ তাকিয়ে বললাম, কই না তো, পথ তো অবারিত।

দ্যাখার চোখ হারিয়েছ তুমি। পেছন ফিরে দেখো না, সামনে এগিয়ে চল।

লোকটি মুখোমুখি থেকে ঘুরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, ওর মত দ্রুতগামী হতে পারছি না। ক্রমেই ও সংক্ষিপ্ত হতে হতে একসময় বিন্দু হয়ে, সামনে আমার পথ দীর্ঘ প্রসারণে, একাকী আমি সারাৎসারের খোঁজে শুধু এগিয়ে চলেছি। তার খোঁজ কোনোদিন পাব কিনা জানি না, এখন শুধু এগিয়ে চলা, অনন্ত প্রসারিত পথ সামনে ছড়ানো, এর শেষ কোথায়, তা-ও জানি না। সুরু যখন করেছিলাম, একদিন শেষ হবে এটা অনিবার্য, লোকটি একথা বলেছে। কিন্তু এখন সে বিন্দু থেকেও অপসৃত, —আমার লক্ষ্য-অভিমুখ হারিয়ে গেছে। শেষ কোথায়, কোনদিকে, কিভাবে, আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। এখন একটাই অভিমুখ, অদৃশ্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

# জীবনের বিষয়-সন্ধানে

নিজের জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ্য করে পরিমলবাবু অনুভব করলেন, তাঁর জীবনে এখন কোনা বিষয় নেই। আসক্তি আর বৈরাগ্যের মাঝামাঝি কেমন এক নির্বেদ অবস্থানে থেকে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন এই জীবনযাপন! এটাই কি তাঁর থেমে যাওয়া! এই ভেসে থাকায় তিনি যে নিরালম্ব, উপরিতল ও গভীরতলে একটা ভারসাম্যই কি তাঁকে এমন স্থিতি দিয়েছে!—এ সমস্তই বিষয়হীন কুয়াশাময় এক চিন্তাস্রোত, ইদানীং তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর কিছু করার নেই, যতক্ষণ এই ধূসরতায় নিমগ্ন আছেন ও থাকবেন।

এই কুয়াশাময়ের ভেতরে সূক্ষ্ম রশ্মির মত এক সরলরেখা, অতীত থেকে এসে ভবিষ্যতের দিকে সোজা চলে যাচ্ছে, যা স্মৃতিচারণ ও ভবিষ্যৎ-ভাবনার এক ঘনীভূত সম্মিলন। তা বিষয় কিংবা বিষয়ের আভাস, পরিমলবাবুর কাছে তার আলাদা তাৎপর্য নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, জীবন অর্থে শুধু পল্লবিত হওয়া, তাহলে এই সংকোচন কোন বার্তা রেখেছে সেখানে।—প্রকৃত অর্থে এ-সমস্ত ভাবনা নয়, ভাবনার আভাস তাঁকে জাগিয়ে রেখেছে এমন এক জীবনবোধে, যেখানে কোনো বিষয় নেই।

অথচ এর আগে পরিমলবাবু বিষয়ের অভাব অনুভব করেন নি। বিষয়ের পর বিষয় তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, আকর্ষণ করেছে, প্রতিমুখি করেছে, হয়রান করেছে, আনন্দ দিয়েছে; কিন্তু তা যে কী বোঝেন নি তখন, সেই খোলসের ভেতরে জীবন যে কোথায় লুকিয়ে ছিল, টের পান নি কোনোদিন। কিন্তু আজ সহসা এই বিষয়হীন অবস্থানে জীবন যেন গভীর থেকে উঠে এসে বলছে, আমি আছি, আমাকে ধরে থাক তুমি। আর তখনই সমস্ত অতীত অর্থহীন হয়ে গেল, ভবিষ্যতেরও অস্তিত্ব যেন আর নেই।

তবুও, তা কি করে সম্ভব। এ-পর্যন্ত এই জীবন গড়ে ওঠায় সেইসব বিষয় কোনো ভূমিকাই রাখে নি? প্রতি বছর স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া-সেকেন্ড হওয়া নিয়ে বালক-কিশোরের উত্তেজনা-আনন্দ-হতাশা জীবনকে ছোঁয়নি তখন? অভিষিক্ত করেনি? পড়াশোনার পর্ব শেষ করে যুবকটি যখন চাকরিতে ঢুকল, সেই নতুন স্বাদ, তারপর থেকে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার ভেতরে যেতে যেতে উন্নতির পর উন্নতি, একে পেছনে ফেলে, ওকে টপকে গিয়ে সামনে এক অদৃশ্য হাতছানি ক্রমাগত তাকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে,—এসব কি জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হয়নি! এর পাশাপাশি নিজস্ব সৃজনশীলতা যখন তাঁকে জীবনের অন্য মানে চিনিয়েছিল, যা প্রকৃতই জীবনের স্তরের পর স্তরে আরোহণ-অবরোহণের সমাহার, অন্বেষণের কর্ষণভূমি, তারও উপাদান ছিল না সেই জীবনবোধ?

হয়ত এসব একক-জীবনের কথা। তার একমাত্রিকতার কারণে যদি মর্মমূলে যেতে না-ও পেরে থাকে, এরপর তার জীবনে নতুন জীবন যুক্ত হয়ে, স্ত্রী সুমনা এসে দাঁড়াল লম্বরেখায়,—এই যৌগেও কি জীবন জাগে নি সেদিন? প্রাণের প্লাবনে-প্লাবনে শরীর-মন তোলপাড় করা

সেই দিনগুলি, মাসগুলি, বছরগুলি, তা-ও কি ছিল জীবন-বহির্ভূত? এরপরও সেই যৌগ যখন নিষ্কাশিত এক নতুন জীবনের জন্ম দিয়েছে, তার উৎসেও ছিল না কোনো জীবন অথবা জীবনের বোধ,—একথা কিভাবে মেনে নিতে পারেন পরিমলবাবু? অথচ এখন এই বিষয়হীনতা জীবনের গভীরে ডুবিয়ে রেখে সেকথাই প্রতিপন্ন করতে চাইছে,—সেই বিষয়েরা জীবনকে ঢেকে রেখেছিল শুধু, তার উন্মুক্তি ঘটাতে পারে নি।

এইভাবে বিষয়ের পর বিষয় এসেছে, কিন্তু যে-বিষয়টি নতুন কোনো বিষয়ের দিকে এগিয়ে না দিয়ে জীবনকে বিষয়হীন করল, সেটা তবে কি বিশেষ কোনো বিষয়, যা বন্ধ্যা, এগোনোকে স্তব্ধ করে, সুযোগ দেয় অন্তঃস্থিতকে উৎসারণে যেতে? কী বিশেষ ছিল সেই বিষয়ের!

সপ্তাহ দুয়েক আগে শুভ্রার বিয়ে হয়ে গেল। তারপরেও কিছু আনুষঙ্গিক—বৌভাতের অনুষ্ঠান, মেয়ে-জামাইয়ের আসা ও ফিরে যাওয়া, ওরা বেড়াতে যাবে তার ব্যবস্থাদি—ট্রেনে রিজার্ভেসন, হোটেল বুকিং, সেখানে রোজই টেলিফোনে যোগাযোগ, ওদের ফিরে আসা, ষ্টেশনে যাওয়া, ওদের পৌঁছে দেয়া, এরও পর ছিল—শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন ব্যবহার করে, ননদও। কৌশিকের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকে ভাব-ভালোবাসা, বিয়ের পরেও তা ধারাবাহিক কিনা।—এসব তত্ত্বতালাশের পর শুভ্রা কাল ফোনে জানিয়েছে,—আমার জন্যে আর চিন্তা কোরো না, ভাল আছি আমি, ভাল থাকবও, আমি তো বড় হয়েছি নাকি? তুমি চিন্তামুক্ত হয়ে এখন থেকে নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীর নিয়েই শুধু ভাবো।

বস্তুত, শুভ্রার এই ফোনে-বলা কথাগুলি শোনার পরই পরিমলবাবু তাঁর জীবনে বিষয়হীন হয়ে গেছেন। নিজেকে নিয়ে থাকতে বলল শুভ্রা, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র এখন আর কিছু আছে নাকি! কখনো মনে হয়নি তো! একাকী-জীবনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, তারপর সুমনা-শুভ্রা, এখন কৌশিক—এ সমস্ত নিয়েই তো তিনি, নিজেকে আলাদা করতে হলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হবে, অঙ্গহানিরও ভয় আছে। আর এমন কথা বলল কিনা শুভ্রা!

অথচ এই শুভ্রাকে নিয়ে কতই না দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর সফল-জীবনে সামান্য যে হানিটুকু ছিল, তা শুভ্রা। পড়াশোনায়, বুদ্ধি তে, সরসতায় চমৎকার মেয়ে হলেও দেখতে সুশ্রী ছিলনা। সেই খোলস পেরিয়ে অভ্যন্তরে যাবার সুযোগ কোথায় অন্যদের? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কয়েকজন যোগাযোগ করেছে, দুতিনজন দেখতেও এল, সৌজন্য বজায় রেখে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু পরে আর যোগাযোগ করেনি। পরিমলবাবুর সামনে তখন হতাশাই একমাত্র বিষয়। যাবতীয় সাফল্য সেই সূত্রে নিষ্প্রভ হবার উপক্রম হলে বাধ্য হয়ে মেয়েকে ইঙ্গিত দিতে হয়েছিল—তোর বন্ধুবান্ধব নেই? কাউকে তো বাড়ি আসতে দেখি না। ইঙ্গিতটা হয়ত বুঝেছিল, একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা তারপরই এসে বলে। ঘটনাটা নিশ্চয়ই আগে থেকে সুরু, প্রশ্রয় পেয়ে দ্রুতগামী হয়েছে। এরপর মাথা থেকে সেই ভার কমতে কমতে গতকাল একেবারে শূন্যে গিয়ে পৌঁছল।

শুভ্রার টেলিফোন-বার্তায় তারই কি ইঙ্গিত! নিজেকেই বিচ্ছিন্ন করে অবকাশ দিতে চেয়েছে তাঁকে! এবার তাহলে নিজেকেই খোঁজা সুরু বিষয়হীন জীবনের ভেতরে!

পরিমলবাবু সমস্ত জীবন পড়াশোনা নিয়ে থেকেছেন, কিছু কিছু লেখালেখির চর্চাও। তাঁর ধারণা ছিল, সেখানে তাঁর দ্বিতীয় জীবন। এখন সে ভুল ভাঙ্গল। সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয়

জীবনে নতুন কোনো বিষয় দিয়ে শূন্যপূরণ হচ্ছে না তো। অবশেষে এই ধারণায় নিশ্চিত হলেন, এই জ্ঞানসংগ্রহ বা সৃজনশৈলী মানসিক পরিকাঠামোকে হয়ত সুগঠিত বা বহুমাত্রিক করে, কিন্তু জীবনের গভীর অন্তঃস্থলে কোনো প্রভাবই রাখে না।— জীবনবোধে যেমন কোনো সংযোজন করে না, সেখান থেকে নিঃসরণও ঘটে না।

ধারণার এই পরিবর্তনের কারণটিও ইতিমধ্যে তাঁর মনে স্পষ্ট হয়েছে।—যে জ্ঞান জীবনসম্পৃক্ত নয় তার শুধু অতীত থাকে, নিজে অর্জন করাও নয়। অতীত যেহেতু শুধুমাত্র স্মৃতি, বোধ দীপ্ত হলেও নতুনভাবে সমৃদ্ধ হয় না। এই সমৃদ্ধি বা নিঃসরণের জন্যে বর্তমানকে প্রয়োজন। বর্তমান অর্থে এই সময়ের মানুষ, যারা তাঁর বোধকে উৎপীড়িত করবে অথবা সম্প্রসারিত করবে, যার ফলশ্রুতি বোধের নিঃসরণ অথবা সমৃদ্ধি। শুভ্রা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে, ভবিষ্যতে হয়ত তার সঙ্গে সংযুক্তির সূত্র আসবে, কিন্তু সে তো ভবিষ্যতে, আপাতত সে আর কোনো বিষয় নয়। আর একজন অবশ্য আছে, তাঁর পাশাপাশি চলাফেরা করে, কখনো কখনো কথাবার্তাও হয়,—তাঁর স্ত্রী সুমনা। কিন্তু দীর্ঘ ব্যবহারে, নতুন কোনো অভিঘাতহীনতায় সে যেন চারপাশে দেয়াল, ব্যবহারের টেবিল-চেয়ারের মতই, যা জীবনবোধের সম্প্রসারণে বা নিঃসরণে ভূমিকা রাখতে পারে এমন কোনো বিষয় সে নয় আর। অতএব বিষয়ের জন্যে মানুষ চাই অথবা ব্যক্ত প্রকৃতি, যা অনুভূতিসম্পন্ন, আবেগের পোষক, অগ্রগামিতার সূচক।

বরং সৃজনশৈলীর ভূমিকা এখন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তার বিষয় অতীতের হলেও সেখানে বর্তমানের কিছু ভূমিকা থাকেই। সরাসরি নয় হয়ত, তবু নির্বাচিত কিছু অংশ বোধে জারণ-ক্রিয়ার ফলেই অতীত-সংগ্রহে যায়, অবশেষে নির্মাণ-শৈলীর সাহায্যে তা থেকে একটা গঠন সম্পন্ন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির প্রয়োগে বর্তমানের কিছুটা বিকৃতি ঘটলেও সেই গঠন হয়ে উঠবে এক অন্য বর্তমান, কেননা বোধ সম্প্রসারিত হতে চেয়েই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেয়। এইসব ভাবনাসূত্রে পরিমলবাবু অবশেষে অনুভব করলেন, তাঁর বর্তমান বিষয়হীন অবস্থানে জ্ঞান-অর্জনের কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই, তাঁকে বর্তমানের মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে আছে বর্তমান মানবসমাজ আর স্ফুরিত প্রকৃতি।

এইরকম ভাবনায় স্থির হবার পর পরিমলবাবু বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, ব্যাপ্ত আকাশ সূর্যবিভায় মন্ডিত হয়ে আছে। তার অন্তরালে নীলের আভাস, গোপন আবেগ নিয়ে আপাতত অপেক্ষায়। সেই ব্যাপ্তির নিচে মানুষজনের নানা বিভঙ্গ, যান্ত্রিক চলাফেরা, যেন এক ব্যাপক কম্পনকে আশ্রয় করে আছে। সেখানে কোনো মানুষের আলাদা চিহ্ন নেই। অতএব বর্তমানের ভেতরে থেকেও এরা তাঁর বোধে বিষয় হতে পারল না।

এরপর কিছুকাল মানুষজনের ভেতরে চলাফেরা করতে করতে আবিষ্কার করলেন, এই যান্ত্রিক বিভঙ্গের ভেতরেও কোনো কোনো অদৃশ্য সূত্রে গোষ্ঠী তৈরী হয়, গোষ্ঠী ভাঙ্গে, নতুন করে আবার গোষ্ঠী। কোনো গোষ্ঠী সাময়িক, বিশেষ উপলক্ষ্যে গড়ে ওঠে, অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়। নিয়ত ভাঙ্গাগড়ার ভেতর দিয়ে যে গোষ্ঠীগুলি, তা থেকে আবার উপগোষ্ঠী—গড়ে ওঠে, ছড়াতে থাকে। তিনি এ-ও লক্ষ্য করলেন, এইরকম ছড়াতে ছড়াতেই মানবগোষ্ঠীর সাধারণ যে দৃশ্য-চেহারা, অনেকটা দাবার ছকের মত,

তার ভেতরে কুশীলবেরা যার যার ভূমিকায় অভিনয় করে, অভিনয় করতে করতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, এমনকি ভুলে যাওয়া ব্যাপারটাও ওদের বোধের ভেতরে থাকে না।

পরিমলবাবুর কৌতূহল ক্রমে আগ্রহে পরিণত হল,—কী ওদের স্বরূপ জানতে হবে। একবার এইরকম এক ভাঙ্গাগড়ার গোষ্ঠীতে চলে গিয়ে কিছু কথাবিনিময় হল ঃ

আপনি তো অমুকবাবু, তাই না?

হ্যাঁ।

কী খবর আপনার?

আগামী সোমবার মিছিল, তারপর ময়দানে জমায়েত, আগামী শুক্রবার পার্টি কনফারেন্স, ভোট আসছে, প্রস্তুতি নিতে হবে।

না না, আপনার কী খবর সেটাই জানতে চাইছি।

!

যাকগে, তা কেমন আছেন বলুন।

আমি এখন অমুক পার্টিতে। সব পার্টিতেই কোরাপসান, কাজ করতে হলে দেখলাম এই পার্টিটাই ভাল, লড়াকু ভাব আছে।

তা হোক, আমি জানতে চাইছি আপনি কেমন আছেন।

!

পরিমলবাবু বুঝলেন, ওদের 'আমি'-টাই হারিয়ে গেছে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অথচ মাঝে মাঝে অন্যধরনের লোকজনের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখলেন, ওদের সবকিছু হারিয়ে গিয়ে শুধু 'আমি'-টাই আছে। যেমন,

আরে, বিমানবাবু যে, আপনার সংসারের কী খবর?

খবর? এই তো কাল প্রমোশনের অর্ডার পেলাম, চেন্নাই যেতে হবে—জেনারেল ম্যানেজারের পোষ্ট।

খুব ভাল খবর। তা আপনার ছেলেমেয়ের খবর কী?

ওদের খবর আর কী থাকবে বলুন। ছেলেটার ড্যাশ-পুশ নেই, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বসে আছে। আমার এক বন্ধুর কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দিলাম, চালিয়ে যাচ্ছে এই আর কি।

শুনলাম মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পাত্র বেশ ভালই।

হ্যা, আটলাখ খরচা করলাম, নেমন্তন্নে কাউকে বাদ দিই নি। আফটার অল আমার একমাত্র মেয়ে। জামাইকে যা জিনিস দিয়েছি, ট্যা ফুঁ করতে পারবে না। আর বলেছি, এখানে কিস্‌সু হবে না, বিদেশে চলে যাও, কোয়ালিফিকেশন বাড়াও, ভাল চাকরি কর, জীবনটা উপভোগ কর। টাকার দরকার হলে, ইনফ্লুয়েন্স করতে হলে চিন্তা করবে না, আমি আছি।

আর বাড়ির খবর কী, মানে পরিবারের খবর?

আমার বাড়ি যান নি? তিনতলা করলাম, পুরো পাথর। সাত-আটটা ঘর তো পড়েই থাকে, পুরো সময়ের দুটো চাকর-ঝি। একদিন আসুন না? নিজের চোখেই দেখবেন, চা খাবেন, আড্ডা মারবো।

পরিমলবাবু আতংকিত হয়ে আর কথা বাড়ালেন না। বুঝলেন, সমস্ত ভেতরটা নিংড়ে 'আমি' এসে ওপরটায় জমেছে। এখন এই 'আমি' চারপাশে ছড়াচ্ছে শুধু।

পরিমলবাবুর চারপাশে এইরকম 'আমি'-রা এখন ঘিরে থাকে। ওদের বিচিত্র বিভঙ্গ তাঁর সৃষ্টির উপাদান হয়ে, তিনি ওদের ক্রমাগত গড়তে গড়তে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। অথচ ওদের শরীর-খোলক মনের কোনো হদিসই দেয় না, ফলে প্রকৃত কোনো যোগাযোগ নেই, সেখানে কোনো রহস্যময়তাও নেই।—কিছুকাল এইভাবে পরিক্রমা করতে করতে পরিমলবাবু নিশ্চিত হতে পারছেন না, এরা প্রকৃতই মানুষ কিনা, অথবা মানুষ-আকৃতি নেহাৎই এক যান্ত্রিক সত্তা। এরা তবে কিভাবে পরিমলবাবুর বোধে বিষয় হবে!

তবুও পরিক্রমার ভেততে থাকতে থাকতে তাঁর চোখে পড়ে গেল, সেই দাবার ছকের ভেতরে কুশীলবদের যান্ত্রিক অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে এমন কেউ কেউ আছেন, ছায়ার অন্তর্বর্তী হলেও স্বতন্ত্র।—কোলাহলের ভেতরে নিঃশব্দ পদচারণায়, একান্তই নিজস্ব বোধের ভেতরে থেকে, সেখানে বিস্মিত করে রাখছেন সমগ্র পৃথিবী, তার যাবতীয় ইতিহাস। সেই ইতিহাসে অংশভাগী ওরা অপেক্ষায় আছেন, থেমে-থাকা ইতিহাসের চাকা আবার কবে সচল হবে, সেই রথের রশিতে দেবেন টান, এগিয়ে নিয়ে যাবেন নতুন সভ্যতার দিকে।

এরা সহজে কারো কাছে ধরা দেন না। পরিমলবাবুও প্রথমে চিনতে পারেন নি। এদের গায়ে রোদ পড়ে না, বাইরেটা নিষ্প্রভ, ভেতরের দীপ্তি তাই বোঝা যায় না। একদিন বিষয়-সন্ধানে বেরিয়ে দেখলেন, সামনে প্রবাহিত জীবনের উদ্দাম স্রোতের ভেতরে কে একজন, একটানা সাঁতার দিতে দিতে,—বিপরীতমুখি, তাই এগোতে পারছেন না। সামান্য যেটুকু, পরিশ্রমের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সেই স্রোতের ভেতরে তিনি যেন কিছু একটা বিষয় পেয়ে গেলেন। অতএব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে স্রোতের বিপরীতমুখি করতেই সহসা প্রবল টানের ভেতরে। ক্রমাগত চেষ্টায় অবশেষে সেই টান ছাড়িয়ে সামান্য এগোতে লোকটির কাছাকাছি। তাঁকে এইভাবে আসতে দেখে লোকটি বলে উঠলেন, পারবেন না, বেশীক্ষণ পারবেন না মশাই। বরং স্রোতে ভেসে যান, নাহলে আমার মত অবস্থা হবে। দেখছেন না, কেমন রক্তাক্ত হয়ে আছি?

তাঁর শরীর থেকে ক্রমাগত এই রক্তক্ষরণ পরিমলবাবু দেখছেন,—ঝরতে থাকা রক্ত লোকটিকে নিঃস্ব করে করে স্রোতের বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও অটল সেই লোক, চোখ-মুখ কঠিন। তাঁর এই ব্যর্থতার ভেতরেই পরিমলবাবু তাঁর বিষয় পেয়ে গেছেন, তাই ওকে ছাড়তে রাজি হলেন না। সে-অবস্থাতেই চলমান লোকটিকে বললেন, এত রক্ত! তবু কেন এইদিকে। জীবনের স্রোতের দিকে যাচ্ছেন না কেন?

লোকটি হেসে বললেন, জীবন কোথায়! ওটা তো মৃত্যুর দিকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ পরিমলবাবুকে সাক্ষী রেখে লোকটি বলে চলেছেন, দ্যাখেননি স্রোতে মড়া ভেসে যায়? বিপরীতে না গেলে জীবন বুঝবেন কী করে। জীবন মানে যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রেই একজন শিল্পীকে, একজন চিন্তাবিদকে, একজন আপসহীনকে খুঁজে পাওয়া যায়, যারা জীবনের মানে বোঝে। আর ঐ পথে যারা,—যুদ্ধক্ষেত্রে এসেই নিহত হয়, তারপর ভাগাড়ে যায়। যারা যুদ্ধই জানল না, জীবনকে জানবে কী করে?

কিন্তু এত কষ্ট, এভাবে কতদিন!

বিপরীত স্রোতে এগোতে এগোতেই লোকটি হাসলেন, কষ্ট তো বোধেই হয়, বোধ না

থাকলে কষ্টও নেই। ঐ দূরে লোকটাকে দেখুন। পিছিয়ে পড়েছেন কিছুটা, কিন্তু ভাবতে পারিনি আবার কোনোদিন চলতে পারবেন। স্রোতের ঘূর্ণিটা হঠাৎই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তবু ফিরে এলেন তো। শরীর ছিন্নভিন্ন, তবুও। আর ঐ যে দেখুন,—বাঁদিকে একজন, ডানদিকে আর একজন। ওরা কিন্তু সুরু করেছিলেন একসঙ্গে, তীব্রভাবেই। সহ্য করতে পারেনি অনেকে। মুখোমুখি হয়ে পড়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল। প্রবল আক্রমণে ওদের ভিন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। অনেকটা পেরেছে, সবটা নয়। ঐ দুটো মানুষ কিন্তু আলাদা সত্তা নয়, চলাফেরা সন্তর্পণে যদিও, অপেক্ষায় আছে, একদিন ওরা যৌথ হবেই। বুঝতেই পারছেন, উপায় নেই, অন্য উপায় নেই আমাদের। এই সময়ের কিছু চিহ্ন রাখা তো দরকার, নাহলে ভবিষ্যৎ চিনবে কী করে?

দেখতে দেখতে পরিমলবাবুর চোখের সামনে এইরকম অনেক বিষয়, নানা ভঙ্গিতে চারপাশে ছড়িয়ে, মিল একটাই, তাঁরা সবাই স্রোতের বিপরীত দিকে।

টের পান নি, কখন থেকে একই পাল্লার ভেতর তিনিও। চারপাশে এইরকম আরো অনেক মানুষ, মূলস্রোতে কেউ নেই তাঁরা। তাঁদের 'আমি'-গুলি আশ্চর্য বিভায় মন্ডিত, সমস্ত অস্তিত্বেই ওতপ্রোত, উপরিভাগ থেকে অন্তঃস্থল পর্যন্ত। তখনই মনে হল, এই তো বিষয়, বিষয়হীনতার ভেতরে যা খুঁজছিলেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই অলৌকিক আদানপ্রদানে, যে বিনিময়ে কোনো ভার নেই।—আশ্চর্য প্লবতায় ভেসে আছেন জীবনের সুলুক-সন্ধানে।

পরিমলবাবু এখন যেন কিছুটা স্বস্তিতে—যোগাযোগে স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি না হলেও ওদের স্বাতন্ত্র বোঝা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ জানা কখনো সম্ভব নয়, তবু সৃজনকর্মে সেই ঘাটতি পূরণ হবার যথেষ্ট উপাদান সেখানে। এইভাবে যখন গভীর মনোনিবেশে ওদের খুবই কাছাকাছি, ওরাও যেন কৌতূহলে ওর কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করছেন। যেমন,

হঠাৎই সেদিন বদ্রীনাথবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে বোঝা দায় মশাই, এত কম কথা বলেন!

পরিমলবাবু হাসলেন, বোঝার অসুবিধে নেই তো। আসলে কথা বলার চেয়ে শুনতে বেশী ভালবাসি।

বদ্রীবাবুও হাসছেন, ওটাই আপনার তুরুপের তাস। রঙ আপনি দ্যাখাতে চান না, আসল সময়ে আমাদের মারবেন, যারা ওপেন খেলছি।

এ ধরনের কথা শুনতে পরিমলবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কী বদ্রীবাবুর খুব কাছে চলে গিয়ে, যেখানে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। বুঝতে পারেন নি এমন কথা তিনি বলবেন,—অচেনা অন্তঃস্থল পর্যন্ত দুলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দূরত্বে সরে এসে, এমন দূরত্বে যেন চেনা যায় তাঁকে। তিনিও তখনই নিমেষে বদলে গিয়ে পরিমলবাবুর খুবই চেনা লোক হয়ে গেলেন। পরিমলবাবু বুঝলেন, মানুষের এত কাছে যাওয়া উচিৎ নয়,—কোনো বিষয়েরও। নিজের তখন কিছুই করার থাকে না, সৃজনশীলতাও নষ্ট হয়ে যায়।

আর একদিন শৈলেশ্বরবাবু, তিনি নিজেই পরিমলবাবুর এত কাছে এসে পড়লেন, দূরত্বে যাবার সুযোগই পান নি। ফলে শুনতে হল, আপনি তো মশাই ডুবে ডুবে জল খান। দেখে বোঝাই যায় না, এত বড় পোস্টে চাকরি করতেন। এছাড়া এত বিখ্যাত আপনি, একবারও বলেননি তো আমাদের?

পরিমলবাবু হেসে, না না, এ আর এমন কি। এসব কি বলার মত কথা নাকি?

দেখুন মশাই, অকারণ বিনয় যারা দ্যাখায়, তাঁদের সন্দেহ করি। এত জায়গায় সম্বর্ধনা দিচ্ছে আপনাকে, কাগজে খবর বেরোচ্ছে, এটা বলার মত কথা নয়? কিছু বুঝি না ভেবেছেন? কথা কম বলেন, তার মানে কথা বলার যোগ্য মনে করেন না আমাদের।

চমকে গিয়ে পরিমলবাবু এরপর দূরত্বে সরে আসতেই শৈলেশ্বরবাবু আবার স্বাভাবিক অবস্থানে। বারবার এইরকম ঘটতে থাকল পরিমলবাবুর জীবনে। কখনো খুব কাছাকাছি এসে পড়েন, আশ্চর্য সব কথা শুনে তারপরই সরে যান, যখন তাঁর মর্মস্থলে আলোড়ন ঘটে যায়। এমন তো চান নি তিনি। বিষয়ের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, সন্ধান মিলল যখন, নিজেরই ভুলে সেই বিষয় আর বিষয় থাকল না। ওরাই পরিমলবাবুকে বিষয় ভেবে,—ওরাও কি তবে ওরই মত বিষয়হীনতায় ভুগছিলেন। পরিমলবাবুকে দেখতে পেয়ে নতুন বিষয়ের সন্ধানে—

ভাবতে ভাবতে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন তিনি,—জীবনের বিষয় সন্ধান করতে করতে নিজেই কখন বিষয় হয়ে উঠলেন! অভ্যন্তর সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে সন্ত্রস্ত, তাঁর 'আমি'র প্রকৃত অবস্থান তবে কোথায়?—তা কি সৃজনশীল সত্তা, অথবা তাঁর শরীর-খোলক, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে যা মনকে গোপন রাখে, কিংবা তাঁর গভীর অভ্যন্তর, যা আয়ত্তে ছিল না কোনোদিনই, যা এখন মাঝেমাঝেই আমূল নড়ে যাচ্ছে।

এসবের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না পরিমলবাবু। এক আশ্চর্য দোলাচল অগোছালো করে দিয়েছে তাঁকে, বুঝতেই পারছেন না কখন তিনি বিষয়ী আর কখনই বা হয়ে উঠছেন বিষয়।—তবে কি এখন বিষয়েরই মৌলিক সন্ধানে তাঁকে যেতে হবে।

# গূঢ় অভিমুখের সন্ধানে

একদিন বিকেলের শেষে সন্ধের প্রাকমুহূর্তে প্রণবেশের মনে হল, অনেক বয়েস হয়েছে তার। টের পায়নি তো! মনে পড়ছে কলেজের উজ্জ্বল দিনগুলো, হইচই করা দিন, বন্ধুরা সবাই পড়াশোনা শেষ করে ছিটকে গেল কোথায় কোথায়। চাকরি পাওয়ার দিনটাও স্পষ্ট মনে আছে। এরপর সবকিছু হিজিবিজির ভেতরে চলে গিয়ে, তিরিশটা বছর কম সময় নয়, অবলীলায় শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে, শরীরে সেই ভার যথেষ্ট অথচ স্মৃতির কোনো অবশেষ দেখতে পাচ্ছে না সে। সময়ের এমন ব্যবহারে বিস্মিত প্রণবেশ, কখনো স্মৃতির গাঢ় ছাপ, কখনো পেলব স্পর্শ। চাকরিজীবন শেষ হতে চলল, আর ছ মাস পর অখণ্ড অবসর, সময় তখন ওর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে জানে না।

স্পষ্ট সেই উজ্জ্বল দিনগুলো মনে আছে প্রণবেশের। তখন সময়ের নিপুণ ব্যবহার জানত, বিনিময়ে রঙিন উৎসার। এরপর সেই সময় বিপরীতে চলে গিয়ে, নিদারুণ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আর সৃষ্টিসম্ভার নেই, বর্ণহীন দিনযাপনের পালা শুধু। সে কি এরপর আরো ব্যবহৃত হবে, নাকি নিজেকে সুস্থিত রেখে সময়কে চালনা করবে? আজ এই প্রদোষকালে বিমূঢ় প্রণবেশ, গভীর ভাবনা-পথে চালনা করছে তার মন।

আশ্চর্য স্মৃতিহীন এই তিরিশটা বছর! স্মৃতি আশ্রয় করলে তবেই সময়কে বোঝা যায়, নাহলে এমনই অলৌকিক, তার অস্তিত্ব থাকে না। অথচ সন তারিখ মিলিয়ে তিরিশ বছর পার করল প্রণবেশ। 'স্মৃতি সতত সুখের' এটি প্রবাদবাক্য। অনেক অভিজ্ঞতা এই প্রবাদবাক্যটি তৈরি করেছে, কেননা এই সঞ্চয়টুকু নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। অথচ স্মৃতি দুঃসহ হলে বিস্মৃতি গ্রাস করে। তবু হারিয়ে যায় না কিছুই, হিসেব-নিকেশ করতে বসলে পুঙ্খানুপুঙ্খ উঠে আসে মনের গভীর থেকে, একটা ব্যূহের ভেতরে চালনা করে। তখন স্বস্তি দেয় না, তা থেকে মুক্তির জন্যে ব্যাকুলতা শ্বাসরোধ করে যেন। এমনই এক বিস্মৃতির পাহাড় প্রণবেশের মন ভেদ করে উঠে আসছে আজ, দূরে ঠেলে দিচ্ছে যাবতীয় সুখস্মৃতি, নিজের সম্পর্কে এক দৃঢ় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে সামনে—কেন এই নির্যাতন? কোন সে গূঢ় অভিমুখ এই তিরিশটা বছর তাড়িয়ে নিয়ে এসে এই ব্যূহের ভেতরে বন্দী করেছে তাকে!

প্রণবেশ জানত না, মানুষ একদা এই সংসার, এই সমাজ গড়তে চেয়েছিল অবশেষে নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে এই ক্রীতদাস-ভূমিকাকেই নিশ্চিত করার জন্যে! কিন্তু জানত, তার নিজের কিছু করার আছে, এই পৃথিবীর ভেতরে অন্য এক পৃথিবী গড়ে তোলার কাজ, তাকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে। ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে বলার কথা ছিল, মানুষ হয়ে আমিও পারি হে ঈশ্বর, অন্য এক পৃথিবী গড়ে, সেখানে যত অসমঞ্জস তার গ্রন্থি খুলে দিতে। সেই সরল পৃথিবীতে তুমি যদি আসতে চাও নিজেকে পাল্টে নিতে হবে অনেকটাই। তখন মুখোমুখি বসে পরস্পর বুঝে নেব নিজেদের ইতিহাস, অনেক-না-বলা কথার উৎসার ঘটে গিয়ে প্রাণিত হব দুজনেই নতুন এক ইতিহাস-রচনায়।

কিন্তু হয়নি, সেই গূঢ় অভিমুখ অন্য পথে নিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ পথের প্রায় প্রান্তসীমায় এসে মনে হচ্ছে, আগে থেকেই এই পথ রচনা করা ছিল। অসহায় পথিক হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। প্রতিটি গ্রন্থি পার হবার পরই সেই অংশ-পথ তার খর্বতার কথা জানতে দিয়েছে, জেনে তার লাভ হয়নি কিছু, কেননা সময় সেই অবকাশ রাখে না যে নতুন করে শুরু করবে। পরবর্তী অংশ-পথের শুরুতে প্রস্তুতি নিয়েও লাভ হয় না, সে-পথ অজানা, যেটুকু রম্য-আভাস পরিণামে তার সূত্র হারিয়ে যায়, গ্রন্থিতে পৌঁছে ব্যর্থতাই অবশেষ এবং তা সংশোধনের উপায় নেই। এইভাবে একের পর এক গ্রন্থি পার হয়ে তার কাছে স্পষ্ট, কোনো এক নিয়ন্ত্রক তাকে নির্দিষ্ট করেছে এই পথ-পরিক্রমায়। সেই নিয়ন্ত্রকের হদিস তার কাছে ছিল না, আজও নেই। এখন সেই জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি আরো ব্যবহৃত হবে, নাকি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হবে।

নারীদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল ছোটবেলা থেকেই। এমন এক পরিবেশের ভেতরে বড় হয়েছে, এমন ভাবনাচিন্তায় অভ্যস্ত ছিল, যেখানে আদর্শ জীবনযাপনের জন্যে নারীরা উপযোগী নয়, একথা জেনেও অদিতিকে ভাল লেগে গেল কেন! কেন তার মনে হল, পুরনো ধারণায় হয়ত ভুল ছিল, অসম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে কোনো বিচার ঠিক না। অদিতির ভেতরে এমন কিছু আবিষ্কৃত হতে পারে যা তার আদর্শ জীবনযাপনের জন্যে হয়ত বা উপযোগী। ফলে নতুন বিন্যাসে গেল প্রণবেশ।

অদিতির সঙ্গে প্রণয়পর্বে এমনই উৎসারিত হয়েছিল—দুজনেই দুজনের কাছে এমনভাবে নিজেদের মেলে ধরবে যেন এক নতুন পৃথিবী গড়ে ওঠে। এমন এক সন্তানের জন্ম দেবে তারা, ছেলে হোক অথবা মেয়ে, দুজনের স্বপ্ন ধারণ করে সেই প্রসৃতি ওদের জীবন সার্থক করবে, সবার সামনে গর্ব করে বলতে পারবে, তোমরা দ্যাখ, এ আমাদের সন্তান, আমাদের স্বপ্নের অবশেষ।

স্বপ্ন কেবলই স্বপ্নের জন্ম দেয়, অথচ স্বপ্নের খোলস ভেঙে যখন রাস্তায় পা, স্বপ্ন উড়ে যায়। পড়ে থাকে ধ্বংসাবশেষ। রুক্ষতা আরো রুক্ষতার জন্ম দিতে থাকে, স্বপ্নেরা মাঝে মাঝে উঁকি দিলেও শুধুই বিভ্রম, রুক্ষকে রুক্ষতর করে।

অন্তত প্রণবেশের অভিজ্ঞতা এইরকমই। নাহলে ওদের বিয়ে হবার পর সে যখন সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে, অদিতির কেন শুধুই গ্রহণ! তার এমনই ঘোর, যেন সেই গ্রহণেই সার্থকতা, স্বপ্নপূরণ, কিছু পাবার কথা ভাবেনি প্রণবেশ। সন্তানের ভাবনাতেও ছিল যাবতীয় কামনা, ভালবাসা, স্বপ্নের উৎসার। সেই সন্তানের জন্ম হলে কি এক আশ্চর্য স্রোতে দুজনের ভেসে যাওয়া। ভেবে দ্যাখে নি প্রণবেশ, ভাববার মানসিকতাই হয়ত ছিল না তখন— স্রোতের ভেতরে সে প্রসারণে থাকলেও অদিতি ছিল সংহরণে, ধারণবৃত্তে। প্রণবেশের আবেগকে নিস্পৃহায় গ্রহণ করছিল বসে, শুয়ে, তাতে যোগ করেনি নিজেকে, সবকিছু গ্রহণ করে কোটরগত করছিল শুধু।

অভিমুখের এই দিকবদল প্রণবেশ বুঝেছে অনেক পরে, সেই গ্রন্থি পার হয়ে এসে। ধারণায় কি ভুল ছিল? নারীর বৃত্তি শুধু ধারণে, উৎসারণে নয়, এই তত্ত্ব জানবার পর ফেরার উপায় ছিল না। প্রকৃতির ভারসাম্যে এই বিধান জেনেও সে স্থিত হতে পারেনি। নিজের

ভারসাম্য বজায় রাখাই সমস্যা তখন,—শুধুই দিয়ে যাওয়া, বিনিময় নেই! অদিতি চলে গেল নিজ অবস্থানে, সন্তানের সবকিছু তারই দখলে, প্রণবেশের অংশভাগ নেই, তার দায়িত্ব শুধু প্রদানে। যদি সে বিনিময় চায়, সন্তানকে আড়াল করে অদিতি। প্রকৃতির এই আশ্চর্য বিধান মানতে পারে নি কোনোদিন।

সন্তান বড় হয়েছে ক্রমে। তার ভেতরে প্রতিফলক খুঁজতে গিয়ে, এ কেমন প্রসৃতি! মেলাতে পারে নি প্রণবেশ। এক আলাদা মানুষ, তবুও তারই প্রসৃতি! তবে কি প্রতিফলকেই গোলমাল ঘটে গেছে? তার অন্তঃসার ঢেকে রাখে যে প্রতিফলক, সেখানে অদিতির কোনো ভূমিকা আছে নাকি! সন্তান আরো বড় হতে হতে ব্যবধান বেড়েছে ক্রমশ, প্রণবেশের নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনো প্রতিদান ছাড়া নিজের বৃত্তে চলে গেছে, ওর জন্যে কোনো অবলম্বন না রেখেই। অদিতি কি জানে, যেদিন ওরও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, অবলম্বনহীন হবে সে-ও। প্রসৃতির দ্যাখা পাবে বিভ্রমে, শুধু মরীচিকায়।

এভাবে সেই গ্রন্থি পার হয়ে মুখোমুখি বসে থাকে প্রণবেশ ও অদিতি। প্রসৃতি শুধু প্রতীক হয়ে, অদিতির সঙ্গে যোগাযোগের সেতুটিও নিশ্চিহ্ন, আছে স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী, স্মৃতিরোমন্থনে উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস।

কেন এমন হল। কেন এমন হয়! অথচ তার তো অন্য পৃথিবী গড়ে তোলার কথা ছিল। এ কি সেই পৃথিবী!

একথাও স্পষ্ট ছিল প্রণবেশের বোধে, তাকে শিল্পী হতে হবে। তার জীবনবোধ শিল্পী-সত্তায় জারিত হয়ে গঠন করবে সেই পৃথিবী। তবু তাকে সমাজে তো বাস করতে হবে, অতএব সামাজিক সত্তা-ও থাকবে। সেখানে আপস করতে হবে, দায়বদ্ধ থাকতে হবে, পরাধীনতার শর্ত কিছু কিছু মানতে হবে। এর ফলে শিল্পী-সত্তার সঙ্গে যদি বিরোধ ঘটে, প্রণবেশ তাই প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সমান্তরাল থাকবে এই দুটি সত্তা। এমন এক জীবিকায় থাকবে সে, যার সঙ্গে শিল্পী-সত্তার সম্পর্ক নেই।

ভালই শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে মনে হত, জীবিকা হলেও সেখানে শুধুই পরাধীনতা নয়, কিছু কিছু সৃজনশীলতাও আছে। মনে হয়েছিল, শিল্পী-সত্তার সঙ্গে ও মেলবন্ধন ঘটে যাবে যেন। অথচ তার অভিজ্ঞতা এই প্রান্তসীমায় এসে মনকে ধবস্ত করেছে শুধু। ক্রমশ কিভাবে ব্যবহৃত হতে হতে তার শিল্পী-সত্তা আশ্রয় নিল এক নির্জন দ্বীপে, হদিস নেই তার কাছে। এটুকু বুঝেছে, প্রতিষ্ঠানের সৃজনশীলতা নেই, ব্যক্তিকে ব্যবহার করায় তার সার্থকতা এবং অন্য আরো যারা এর অন্তর্ভূত, ব্যবহৃত ও সার্থক হওয়া ছাড়া অন্য লক্ষ্য তাদের থাকে না। ফলে জন্ম নেয় প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হিংসা, আরো অন্যান্য কিছু যা তার মূল্যবোধকে ক্রমাগত পীড়িত করে গেছে।

ব্যবহৃত হতে হতে প্রণবেশ জানত, সেভাবে প্রস্তুতিও ছিল, কিন্তু জানত না যে, তার মূল্যবোধও আহত হতে পারে। বিশ্লেষণ করে দেখেছে, এর প্রয়োজন ছিল না, অস্মিতার পরিপোষণ ছাড়া এসব অবান্তর, অনিবার্য তো নয়ই! তার অন্তঃসার বিপর্যস্ত হবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি, তাই সামাজিক-সত্তাকে নির্জন সেই দ্বীপে আশ্রয় দিয়ে শিল্পী-সত্তাকে প্রধান অস্তিত্বে ফিরিয়ে এনেছে। সেখানে এখন তার বসবাস, নির্বাসনে আছে সামাজিক সত্তা। সম্পূর্ণই নিজের অস্তিত্বে যাবার জন্যে এখন শুধু অবসর নেবার প্রতীক্ষায়।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, সামাজিক মানুষ, কেমন আছ তুমি? যে নির্জন দ্বীপে তাকে রেখে এসেছে, সেখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল কথাগুলো। অনেকক্ষণ উত্তর আসে না। প্রণবেশকে যেতে হল সেখানে, গিয়ে দ্যাখে, নির্জন দ্বীপে শুধু কোলাহল। নির্বিকার, উদাসীন, তবু তাকে ঘিরে অনেক দাবী। সে বলল, এভাবেই আছে, কেমন আছে জানে না। সবাই শৃংখল পরাতে চায়, কেন, বুঝতে পারছে না। কোলাহলের দাবী, সামাজিক মানুষের দায়িত্ব অনেক, পালন না করে উপায় নেই। অথচ সামাজিক মানুষ কি তা হতে চেয়েছিল? সমাজে জন্মেছে তাই সামাজিক, কোনো দেশে জন্মালে যেভাবে আপনা থেকেই ব্যক্তিটি সে দেশের নাগরিক হয়ে যায়। কোনো কৃতকর্মের জন্যে জন্মেছে কিনা জানে না, পুনর্জন্মের তত্ত্বটি আজও স্বচ্ছ নয় তার কাছে, তবু প্রণবেশ জন্মেছে যখন দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, এটাই কোলাহলের দাবী।-- রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সচল থাকতে হবে, আর্থিক বিপন্নতা জানতে হবে, সমাজের নিয়মকানুন মানতে হবে, দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে, সমাজের যারা স্বয়ং-প্রভু তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বিনিময়ে সমাজের কাছে নিরাপত্তা চাইতেই পারে, পারিবারিক বা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ, তা-ও। এটুকুই সে পারে, আর কিছু নয়। নিরাপত্তা বা স্বাচ্ছন্দ কে দেবে বা দিতে পারে হদিস নেই তার কাছে। যেমন এখন তার প্রকৃতই কোনো নিরাপত্তা নেই। হদিস যদি পেয়েছে কখনো, অপেক্ষা করে করে ব্যর্থ হবার অধিকারটুকু মাত্র অর্জন করতে পেরেছে। এখন তাই কোলাহলে নির্বিকার থেকে স্বচ্ছন্দ হতে চায়, উদাসীন থেকে মুক্তির স্বাদ পাবার কথা ভাবে।

প্রণবেশ ভাবছে, সে কি ভুল করল কোথাও! যে তার অপরাধ জানে না, যাকে প্রার্থনাও করতে দেখেনি কখনো, আগ্রাসী না হয়ে নির্বিকার, উদাসীন থাকার ফলশ্রুতি শুধুই নিষ্পেষিত হওয়া! এ তত্ত্বটা বোঝেনি প্রণবেশ, তাকে ঐ নির্জন দ্বীপে নির্বান্ধব পাঠানো ভুলই হয়েছে। ভুল হলেও এছাড়া উপায় ছিল না, শিল্পী-সত্তাকে মুক্তি দিতে এভাবে বিশ্লিষ্ট করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে নি। কেননা খুবই দ্রুত ধারণবৃত্তে চলে গেল অদিতি, শুধুই গ্রহণ, কোনো উৎসারণ নেই, আর ওদের স্বপ্ননির্মাণে যে সন্তান, সেই প্রসৃতির আশ্বাস শুধু মরীচিকা, প্রসারণে প্রসারণে আরো দূরে চলে যাওয়া, প্রণবেশের অভ্যন্তর লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছিল;এভাবে ভারসাম্য থাকবে না বুঝতে পেরে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছিল তাকে।

শিল্পী-সত্তাটি তবে কেমন আছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল, যেখানে এখন তার প্রথম অস্তিত্ব।

উত্তর আসেনি। প্রণবেশের কাছে এটা অস্বাভাবিক না। সে জানে, উত্তর দিতে শিল্পীরা তৎপর হয় না। যেভাবে রাজনীতিকরা তৎপর, প্রতিযোগিতাই যাদের অবলম্বন, তারাও, কিন্তু শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। উত্তর দিতে উপরিতল থেকে গভীরে যেতে হয় তাদের। প্রণবেশ ধীরে ধীরে শিল্পী-সত্তাকে ছোঁয়, দ্যাখে, মগ্ন হয়ে আছে। সে বলে, এত শক্ত প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিই বলতো। উত্তর দেবারও মানে হয় না। চারিদিকে এত অসমঞ্জস, তার মূল সূত্র আবিষ্কার করতে হবে, তারপর সৃজনকর্মে। অবশেষে নির্মাণকর্মেই আমার উত্তর, আদৌ যদি তা উত্তর হয়।

প্রণবেশকে মিশে যেতে হয় শিল্পী-সত্তার সঙ্গে। দ্যাখে, সত্যিই তো, কোনো মানুষই স্বস্তিতে নেই, এত বিড়ম্বনার ভেতরে নিজেদের হারিয়ে ফেলছে ক্রমাগত। সবকিছু ঠিক ঠিক

বুঝে নেবার জন্য নিরপেক্ষ দর্শক হতে হবে। তারপর অন্য গড়ন! কিন্তু নিরপেক্ষ বলা যত সহজ, ততটা সহজ নয় এই অবস্থানে পৌঁছনো। এটাই শিল্পীর প্রাথমিক লড়াই এবং তীব্র। নানাদিক থেকে চাপ আসে, স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, বিভিন্ন দায়িত্বের কথা স্মরণ করানো হয়। এসব অগ্রাহ্য করে প্রকৃত দায়িত্বে সচেতন থাকতে হবে।

শিল্পী প্রণবেশ এই নিষ্ঠায় অবিচল, তবু মাঝে মাঝেই নির্জন দ্বীপ থেকে সামাজিক সত্তা চলে আসে, ওর অসহায়তার কথা বলে, এইরকম জীবন-নির্বাহের প্রয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তোলে বারবার। ওকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, শিল্পী-সত্তা বিমূঢ় হয়ে পড়ে, কখনো কখনো সামাজিক-সত্তার সঙ্গে যৌগে চলে যেতে বাধ্য হয়। আর তখনই প্রণবেশের মনে সেই গূঢ় অভিমুখের সন্ধান অনিবার্য হয়ে পড়ে। —কোন সে গূঢ় অভিমুখ যা তাকে এই নিয়তি-সর্বস্বতার পথে নিয়ে যেতে চায়!

অথচ নিষ্ঠাই যদি বজায় রাখতে না পারে, সামাজিক সত্তা বারবার এসে ব্যাহত করে যায়, কিভাবে সেই সন্ধানে এগোবে? সে-সন্ধান যদি না-ই পাওয়া গেল কিভাবেই বা ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হবে! নিজের ইতিহাস না জেনে কিভাবে বুঝে নেবে পারম্পরিক ইতিহাস? নতুন এক ইতিহাস রচনা, সে তো অনেক পরের কথা।

আসলে এটা কোনো সমস্যা নয়, এ এক অদ্ভুত রহস্য। সত্তাদুটি পৃথক অস্তিত্বে থেকে যদি আলাদা সন্ধানে, তবে হয়তো কোনো কোনোটা সমস্যায় পরিণত করা যেত, কিন্তু মাঝে মাঝে যৌগে চলে গিয়ে বিভ্রান্ত করছে তাকে। এই সংকটে যার কাছেই গেছে কেউ সমস্যা বলে ভাবে নি, রহস্য ধরতে না পেরে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। রহস্যের যে সমাধান হয় না, নিবিড় অনুশীলনই একমাত্র উপায়, এ তত্ত্বটা প্রণবেশ জানল অনেক পরে।

স্ত্রী-কে একদিন বলেছিল কথাটা। জীবনযাপনের মানে ধরতে না পেরেই এমন অসহায় অবস্থা হয়েছে তার। স্ত্রী উত্তর দিয়েছে, জীবনযাপনের মানে তুমি বুঝবে কি করে? সংসারের কোন দায়িত্বটা পালন কর শুনি? ক'মাস বাদে রিটায়ার করবে, তাই এসব বাহানা শুরু করেছ। বুঝি না আমি? এরপর কত কত অজানা দায়িত্বের কথা পরপর শুনে গেল প্রণবেশ।

শুনে বুঝল, সামাজিক সত্তাকে নির্জন দ্বীপে রাখা যাবে না। মাঝে মাঝে সে যে উঁকি দিচ্ছে, তাকে আসতে দিতে হবে। তাকে সঙ্গে করেই চলতে হবে। অবশেষে বাকি জীবন ধরে এত এত দায়িত্ব পালনের কথা ভাবতে ভাবতে হয়রান হয়ে গেল। ছেলে বাড়ি ফিরে মা-র কাছে সব শুনেছে। প্রণবেশের কাছে এসে বলল, ছ'মাস বাদে তোমার রিটায়ারমেন্ট। এরপর কী করবে, ভেবেছ কিছু?

ভাবব আবার কী? চাকরি জীবনে অন্যের দায়িত্ব পালন করেছি। এতদিন নিজের জন্য যা করা হয়নি, এবার তাই করব।

সংসারের কথাও তো ভাবতে হবে। মা-র শরীর ভাল না, আমিও এখানে কতদিন থাকব, ঠিক নেই। বাইরে চাকরির চেষ্টা করছি, পেলে চলে যাব। একটা কিছু কাজ জোগাড় করে নাও, বসে বসে তোমার শরীরও খারাপ হলে মা-কে দেখবে কে? তোমাকে কতদিন বলেছি মর্নিং ওয়ার্ক শুরু কর। চেক আপগুলিও করাচ্ছ না।

এসব ঠিক আছে, সময়মত হবে। জীবনে আমারও তো কিছু করার ছিল, তা নিয়ে ভাবা অনেক বেশি জরুরি। নাহলে অনর্থক এই জীবনযাপন।

ভেবে কী করবে, কাজের মধ্যে থাকলেই মন ভাল থাকবে, শরীরও ভাল থাকবে।

এইসব কথায় প্রণবেশের মনে হয়, যখন সে সত্যিই একা ছিল, নির্দিষ্ট অভিমুখ ছিল তার। অদিতির সঙ্গে দ্যাখা হবার পর অন্য পথে চালিত হল। কেন! ভেতরে ভেতরে সেই গূঢ় অভিমুখ কবে দিকবদল ঘটাল, টের পায়নি তো। এই জীবন চায়নি সে, অনর্থক এইসব দায়িত্ব পালন, যে সন্তান হতে পারত তার প্রসৃতি, সে-ই পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎই একদিন বিকেলে অমরেশদা এলেন। দীর্ঘকাল আসেন নি তিনি, তবু এ বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি সবসময় টের পাওয়া যায়। অদিতি ও ছেলে প্রায় প্রতিদিনই ওর প্রসঙ্গ তোলে, ওরা খুব প্রশংসা করে অমরেশদার। অবসর নেবার পর আজও কেমন সক্রিয়। কত কাজ করেন, ছোটাছুটি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কাজে তাঁর ডাক পড়ে। এটাই তো জীবনের সার্থকতা।

অমরেশদাকে দেখে জীবনে সার্থকতার সন্ধান করছে প্রণবেশ। একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন অমরেশদা?

বেশ ভাল আছি। চুটিয়ে দেশসেবা করছি।

দেশসেবা! সে কিরকম?

সেবাই তো। তুমি তো জান, ভূতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করেছি বিস্তর। চাকরিজীবন তো এই নিয়ে কাটল, অভিজ্ঞতাও কম হল না। ফলে এখন আমি একজন বিশেষজ্ঞ। পৃথিবীর মানে যখন ভূ, সবজায়গায় এই তত্ত্বের প্রয়োগ আছে। নানা জায়গা থেকে ডাকে, চলে যাই। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া কোনো খরচ নেই। দুপুরে বাড়িতে থাকলে ঘুম পায়, ঘুমোলে রাত্রে ঘুম আসে না। খাওয়া-দাওয়া করে রোজই বেরিয়ে পড়ি লাইব্রেরি বা অন্য কোথাও। সময় ভাল কেটে যায়।

প্রণবেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সময় কাটাবার জন্যে এত পরিশ্রম!

সেটা কম নাকি। সারাদিনে এত সময়, সে এক ভয়ংকর ব্যাপার! তাকে পার করতে পারা কম কথা নাকি? রিটায়ার কর, নিজেই বুঝতে পারবে। এছাড়া গ্রামেগঞ্জে লোকজনের একটু সেবাও হয়।

প্রণবেশ জানতে চাইল, এই যে এত পরিশ্রম করছেন, মাসে রোজগার কত হয়?

রোজগার? বল কি? বললাম যে দেশসেবা করছি। যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার স্বাচ্ছন্দ থাকে, এইটুকুই, আর সব তো উপলক্ষ্য মাত্র। একই কথা বারবার বলতে বলতে, ওখানে আর কোনো সুখ নেই। সবচেয়ে বড় লাভ, বাড়ি আর সময় থেকে পালানো যায়। তার জন্যে ঐ কষ্টটা মেনে নিই।

প্রণবেশ বিভ্রান্ত। সময় থেকে পালাচ্ছেন কেন! একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না?

জোরে হেসে উঠলেন অমরেশদা, কে একজন বলেছিল না, সময় হচ্ছে টেকো বুড়ো, ধরতে হলে ওকে পেরিয়ে যেতে হবে। নাহলে ওকে ধরতেই পারবে না, ক্রমাগত তোমার ওপর চাপ তৈরি করে যাবে।

অমরেশদা চলে গেছেন। তাঁর কথাগুলি যে জাল তৈরি করল তার ভেতরে আটকে গেছে প্রণবেশ।—তাহলে এই সময়টাই রহস্য! তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ওখানেই সক্রিয়

সেই গূঢ় অভিমুখ, যার সন্ধান করছে প্রণবেশ? অমরেশদা বললেন, বেশ আছেন। এ কেমন বেশ থাকা! নিজের কাছ থেকে ক্রমাগত পালিয়ে বেড়ানো।

নাঃ, ঐ কথার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বোঝা গেছে, আসল রহস্য সময়ের ভেতরেই। কখন সে জীবনের অভিমুখ বদলে দেয়, মানুষ টের পায় না। পরে যখন বুঝতে পারে, নিরুপায়। অতএব সময়ই উদ্দিষ্ট এখন।

অথচ সময়ের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আরো রহস্যের ভেতরেই ক্রমাগত। প্রণবেশ লক্ষ্য করছে, স্থির স্থবিরতাকে জীবনমুখী করেছে এই সময়। কিন্তু জীবনের ভেতরে থেকে তাকে শিল্প করে তোলার কথা মনে হয়নি কখনো। কেননা এই সমাজ, সমাজের অন্তর্গত জীবন তাকে আঘাতই করেছে শুধু। সামাজিক সত্তাকে তাই নির্জন দ্বীপে পাঠাতে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, অন্য যে পৃথিবী গড়ে তার ভেতরে আশ্রয় নেবার জন্যে সময়ের প্রতিস্পর্ধী হয়ে তাকে অগ্রাহ্য করেছিল, সেই অন্য পৃথিবী, যেখানে অন্য সময়, তার জীবনবোধ কতটুকু! বরং প্রচল সময়কে নিয়ে জীবন-শিল্পী হতে পারত যদি, আঘাত সহ্য করেও, তবে হয়ত সময়ের অন্য ব্যবহার সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রণবেশ তার জন্যে সক্রিয় হয়নি, জীবনবিমুখ হয়েছে তার শিল্পীসত্তা। জীবনকে বাদ দিয়ে অন্য এক জীবন, এমন এক আশ্চর্য সম্ভাবনার কথাই মনে হল তার! ফলে সময় যে স্বয়ম্ভু, তাকে সৃষ্টি করা যায় না, এ সত্যটি না জেনে জীবনের ভেতরে অন্য জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সময়ের প্রতিস্পর্ধী হওয়া কল্পনায় থেকে গেছে। সময় তার কাছে অধরাই থেকে গেল।

প্রণবেশ বুঝতে পারছে, জীবনকে বাদ দিয়ে অন্য পৃথিবী গড়া যায়, তাতে সাময়িক আশ্রয় নেয়া হয়ত সম্ভব, কিন্তু অন্য জীবন কিছুতেই গড়া যায় না। জীবনের মূল সূত্র যেহেতু সময়, তার প্রতিস্পর্ধী হলে জীবন রুদ্ধ হয়ে যায়, বরং এই সময়-নিষিক্ত জীবনকেই অন্য ব্যবহারে অন্য জীবনে রূপান্তর ঘটাতে পারলে হয়ত সেই গূঢ় অভিমুখ জানা যেত, যার সন্ধানে প্রণবেশ এতদিন ধরে।

এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রণবেশ নিশ্চিত নয়, কী করণীয় এখন। যে জীবন তাকে আঘাত করেছে, তার কাছে যাবে, নাকি শিল্পী-সত্তার কাছে, যে তাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়েছে। সে জানে, গূঢ় অভিমুখ না জানতে পারলে এই জীবনে শুধু ব্যর্থতাই। এ-ও বুঝতে পারছে, শিল্পী-সত্তা তাকে দিতে পারে শুধুই আশ্বাস। আশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে, না হলে জীবনের গতি থাকে না, কিন্তু সেই আশ্বাসে কল্পনা আছে, জীবনবোধ নেই, যে বোধ অস্তিত্বে নির্যাস হয়ে থাকে। এটাও সঠিক কিনা প্রণবেশ জানে না, শিল্পী-সত্তা যদি সামাজিক সত্তার কাছে পৌঁছে যায়, দুয়ের সমন্বয়ে যদি তখন সে জীবন-শিল্পী, আশ্বাস ও ব্যর্থতা মিলে এমন এক অবস্থান কি সে খুঁজে পাবে যেখানে সৃজনশৈলী সক্রিয় থাকবে?

প্রণবেশ নিশ্চিত নয়। নিশ্চিত নয় যে, সেই ঘটনাও তার গূঢ় অভিমুখের সন্ধান দিতে পারবে। প্রণবেশ ভাবছে, ভেবেই চলেছে, হয়ত অনন্তকাল এইভাবে ভেবে যেতে হবে।

# শূন্যতার খোঁজে

সর্বেশ্বর এক নতুন জীবন বেছে নিয়েছেন।—সংসার থেকে দূরবর্তী, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, আশ্রয় শুধু নিরালম্ব আকাশ। কয়েকবছর হল এমনই এক পৃথিবীতে তাঁর বসবাস। শুধুমাত্র বয়েসের কারণেই নয়, আগ্রহের অভাবেও। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, শ্রবণক্ষমতা কম, স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শের তারতম্যও স্পষ্ট নয় তেমন। অন্যের চোখে তাঁর এই অবস্থান অর্থে উদাসীনতা, কিন্তু তিনি চরম আসক্ত তাঁর নিজের পৃথিবীতে,—তাঁর প্রতিটি অণু-পরমাণু পরখ করা চাই, নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে নিতে চান নির্জন মুহূর্তগুলি, এবং এভাবেই সেখানে একচ্ছত্র সম্রাট তিনি।

তবু এইসব ঘটনা কি বিশ্বাস করা যায়? আজও সংসারী মানুষ তিনি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আছে, তাদেরও স্ত্রী-সন্তানেরা,—ভরপুর সংসার। এত বছর দক্ষতার সঙ্গে সংসার-নৌকাটি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, অনেক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশের ভেতর দিয়ে, সেখানে নির্জনতা ঢুকে পড়বে এমন অবকাশ কোথায়? এছাড়া, সামাজিক মানুষ তিনি নন, এ কথাও বলা যাবে না।—গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁর শিক্ষকজীবন অতিকথায় পরিণত আজ, তাঁর অনেক ছাত্র দেশ-বিদেশে সম্মানিত হয়েছে, এর নেপথ্যে তাঁরই প্রধান ভূমিকা, এ কথাও একবাক্যে সবাই স্বীকার করে।

কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, সর্বেশ্বর তাঁর নিজের বিশ্বাসে স্থিত থাকতে চান। তাঁর এই নতুন জীবনে অতীতের ছায়াপাত ঘটতে দেন না, তার কোলাহল দূরশ্রবণের মত, তার যাবতীয় স্বাদ-বর্ণ-দৃশ্য পেছনে রেখে নিজের অনুভব নির্মল রাখতে চান,—ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় যে অনুভব, তার মত।

কিন্তু চাইলেই ঠিক তেমন-তেমন ঘটবে, এ হয় না। এর জন্যে অনেক কাটাকুটি খেলতে হয়েছে,—যোগচিহ্ন এলে তার মুখোমুখি বিয়োগচিহ্ন সাজাতে হয়েছে, তবু রহস্য এই, কিছুতেই শূন্যে পৌঁছয় না, কিছু একটা থেকে যায় বোধের ভেতরে। তার ওপর নিয়ত তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়, বিশ্লেষণ করেন, তা আর নতুন কোনো যোগচিহ্নের জন্ম দেয় কিনা। এই কাটাকুটি খেলাতেই দিনপাত হয়ে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে হতাশা আসে, উপায় নেই, তাঁকে এই খেলা খেলতেই হবে। এর জন্যে পাশাপাশি অনেক বিদ্যাভ্যাস, তবু বিদ্যা অর্জন আর সেই বিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো এক কথা নয়। একসময় বিদ্যাও তাঁকে ভারী করে, তা থেকেও মুক্তি চান। বিদ্যা ও চিন্তা থেকে মুক্তি নিয়ে নির্মল আকাশের মুখোমুখি হতে গিয়ে, সেই আকাশও মেঘমুক্ত নয়, চিন্তা আলোড়িত করে, মেঘেরা ঘন হয়, ছড়াতে থাকে, ফলে আবার কাটাকুটি খেলার ভেতরে—

মাঝে মাঝে তাঁর কাছে সংসারের, সমাজের সংবাদ এসে পৌঁছয়। যেমন, বেশ কিছুকাল

আগে তাঁর স্ত্রী এসে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, ছেলেটা দুদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছে, অফিস কামাই হচ্ছে, অফিস থেকে বারবার ফোন আসছে, আর উনি বাড়িতে বসে আছেন, কোনো হেলদোল নেই। এই খবর কিছুটা হলেও তাঁকে বিচলিত করেছিল, তখন তাঁর আকাশে বিবর্ণ রঙ, কিন্তু কী করার আছে তাঁর? তবু ছেলের কাছে গেলেন, ডাক্তার দেখেছে কিনা, ওষুধপত্র ঠিকঠাক পড়ল কিনা, এসব খবরের ভেতর দিয়ে সংসার আবার উঁকি দিল, উপায় নেই, এসব তাঁকে মানতেই হয়েছে। যাই হোক, দিনসাতেক টানাপোড়েনের ভেতরে কিছুটা কার্যকরী ভূমিকা তাঁকেও নিতে হয়েছে। তারপর ছেলেটা সুস্থ হয়ে অফিসে গেল, সর্বেশ্বর ফিরে এলেন নিজের জীবনে। বিবর্ণ আকাশ আবার নতুন করে পরিষ্কার করতে হয়েছে, তার জন্যে অনুশীলন, কাটাকুটি খেলা। আকাঙ্ক্ষিত আকাশের ধারাবাহিকতায় এইভাবে ছেদ পড়লে তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়। সর্বেশ্বর নিরুপায়, এসব মেনে নিতেই হল।

এরপরই বজ্রপাতের মত সংবাদটা।—প্রথমে আভাসে, একটি শিশুর চিৎকার মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলেন। দিন দুই এভাবে, তারপর বিচলিত সর্বেশ্বর খোঁজ নিতে গিয়ে অবাক, পুরনো সংসারের দৃশ্যপট একেবারেই বদলে গিয়ে, সর্বেশ্বরের চোখে সবটাই অচেনা। ওরা নতুন রঙে দীপ্ত, শিশুটির নিষ্কলুষ আচরণ সবাইকে আশ্চর্য বদলে দিয়েছে, এমনকি স্ত্রীর কর্কশতাও নমনীয় অনেক। পরিহাসচ্ছলে স্ত্রী তাঁকে বললেন, তুমি ঘুমোও শুধু, আমাদের নতুন অতিথি এসেছে, দেখে এসো একবার।

দেখতে গিয়ে অবাক সর্বেশ্বর, তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম আরো একধাপ এগিয়ে গেল! শিশুটিকে দেখে মুগ্ধ তিনি, হুবহু তাঁর প্রার্থিত নির্মল আকাশ! দূর থেকে দেখেই ফিরে এলেন নিজস্ব জীবনে, এখন শিশুটিকে তাঁর নিজস্ব আকাশে স্থাপন করতে হবে এবং সেটা করতে করতে নিজের সংকট নিজেই ডেকে আনলেন। ধীরে ধীরে পুরনো সংসার ছদ্মবেশে তাঁর জীবনে ঢুকে পড়ল, কিভাবে, কখন, তার হদিসই করতে পারলেন না। যেদিন বুঝলেন, তাঁর আকাশ হারিয়ে গেছে, তার উদ্ধারে অনেক পরিশ্রম, আরো অনুশীলন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে সবকিছু।

অতএব বাইরের জগতের প্রতি নিদারুণ নির্মমতা রেখে নিজেকে গুহাবন্দী করলেন। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার থাকল না, নতুন মোড়কে মুখগুলি, শিশুটি সম্পর্কে তাদের মোহময় কথাবার্তাও নিষিদ্ধ, এমনকি শিশুটির চিৎকারও পৌঁছতে দিলেন না গুহার ভেতরে।

এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও অনুশীলন ক্রমশ স্পষ্ট করছে তার নিজস্ব আকাশ। যখন স্থিতি প্রায় ফিরে এসে স্বস্তিতে ফিরছেন, সহসাই তাঁর আকাশে আঁচড়ের পর আঁচড় পড়তে পড়তে সেই শিশুটির মুখ—তার ব্যাদিত মুখে অসহায় আর্তনাদভঙ্গি,—এই পৃথিবীতে এসে বিপন্ন সে, বড় করুণ সেই মুখ। সর্বেশ্বর বিভ্রান্ত হয়ে দেখলেন, শিশুটি কখন তাঁর জীবনের ভেতরেই চলে এসেছে! তাঁর নির্জনতা চুরমার করে বলছে, তোমাকে প্রসারিত করতেই তো এসেছি আমি, তুমি থামতে পারো না, আমার ভেতর দিয়েই তোমাকে আরো এগিয়ে যেতে

হবে।—অলৌকিক এসব অনুভব করে দিশাহারা সর্বেশ্বর ভাবছেন, তাঁর এত পরিশ্রম, এত অনুশীলন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে! তবু ভেতরে ভেতরে দৃঢ়বদ্ধ তিনি, হার মানতে রাজি নন,—আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, কিন্তু কোথায় তার ফলশ্রুতি!

এতদিনের অনুশীলন যে ব্যর্থ হবার নয় অবশেষে বুঝলেন, যখন স্বতোৎসারিত হয়েছে তাঁর অন্য অনুভব।—প্রাচীন ঋষির মত দীর্ঘবাহু তুলে শিশুটির দিকে আশীর্বাদভঙ্গি করে তিনি বললেন, এতদিনে আমার যা-কিছু সুকৃতি, আর যা-কিছু অল্পতা, কোনোটার প্রতি এখন আগ্রহ নেই। অল্পতা নিয়ো না, যা কিছু সুকৃতি তা নিয়ে প্রসারণে যাও। আমার গভীর অন্তর্দেশে যে সূক্ষ্ম স্রোত প্রবাহিত, কোনোদিন যদি তা ছুঁতে পার তবেই দ্যাখা হবে বোধের ভেতরে। আমাকে একা থাকতে দাও আমার নিজস্ব জীবনে।

এরপর সর্বেশ্বর গভীর অনুশীলনে ডুবে গেলেন।

এখন এই অপ্রাকৃত জীবনে সময়ের নির্দিষ্টতা নেই। তাঁর ধারণায় নেই, কত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।—তারই মধ্যে একদিন তাঁর স্ত্রী উপস্থিত হলেন।

সর্বেশ্বর চিনতে পারলেও গুহাবন্দী জীবন থেকে দূরবর্তী রেখেই তাঁকে দেখলেন। মুখ অপ্রসন্ন, তবু দীপ্তিময়। একটা কার্ড তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার খোঁজ রাখ? সবই এ কান দিয়ে ঢুকে ওকান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার ভাই বোনেরাই তো সব ব্যবস্থা করল, কার্ডটাও বড়দার নামে করব ভেবেছিলাম, কিন্তু মেয়ের শখ, তোমার নামে করতে হবে। দ্যাখ, পড়ে দ্যাখ, ঠিকঠাক লেখা হয়েছে কিনা।

এসব কথাও তাঁর এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেল কিন্তু ভাসিয়ে দিয়েছে কিছু ছবি। ছবিগুলি ঠিকঠাক পড়া যাচ্ছে না, শুধুমাত্র আভাসে—সেই ছোট্ট মেয়ে এখন যুবতী! আরো ছবি যেন প্রতীক্ষায়—তার অবস্থানবদল হয়ে একটা শূন্যতা। এই শূন্যতাই কি সর্বেশ্বর চেয়েছিলেন? তবে তা ধূসর কেন! সেই ধূসর শূন্যতা তাঁর জীবনে প্রবেশ করে ভারী করে তুলেছে!—সর্বেশ্বর বিভ্রান্ত। তাঁর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, লক্ষ্য দিকভ্রষ্ট হচ্ছে। প্রায় তৎক্ষণাৎ সামনে নিলেন তিনি, এছাড়া উপায় নেই। এতদিনের পরিশ্রম, অনুশীলন ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না।

কার্ডটা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন, কোনো কথা বললেন না। এরপর কিছু কিছু অনিবার্য দৃশ্য, দেখতেই হল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি,—অবস্থান বদলের, বিদায়ের দৃশ্য, যা সেই ধূসর শূন্যতার পথে চলে যাচ্ছে। একসময় তাঁর নিজস্ব জীবনে ফিরে এসে আকাশের মুখোমুখি, যা নির্মল করার জন্যে এতদিন এত প্রাণপণ অথচ এখন ধূসরে লিপ্ত হয়ে আছে।

যথারীতি আবার শুরু হল নিয়ত পরিশ্রম, নিবিড় অনুশীলন। কিছুটা যেন ক্লান্ত সর্বেশ্বর, সেই শূন্যতার খোঁজে বারবার এই কাটাকুটি—এ যেন এক অনিঃশেষ খেলা। একদা যে স্নেহ ছড়ানো ছিল, যে মোক্ষণ তাঁকে তৃপ্ত করত একদিন, তারও দাবী আছে তাঁর কাছে, তাঁকে পূরণ করতে হবে। সমস্ত জীবন ধরে এইসব যাবতীয় মোক্ষণের প্রতিদান দিতে হবে

নাকি। কতকাল এই কাটাকুটি খেলে যেতে হবে তাকে? তার যেন নিস্তার নেই, অথচ লক্ষ্যপথ থেকে ফিরে আসবে, তারও উপায় নেই। তাঁর শূন্যতার প্রতি অভিযানের মত এটাও যেন নিয়তি।

সর্বেশ্বর লক্ষ্য করছেন, এক একটা অভিঘাতে তাঁর পরিশ্রম, যাবতীয় অনুশীলন বেড়েই যাচ্ছে। নিজস্ব জীবনে গচ্ছিত করছে কিছু না কিছু অবশেষ। কোথায় গিয়ে জমছে তারা! হদিস করতে পারছেন না। তারা কি গোপনে গোপনে অন্যতর জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি করে, —মনে মনে সন্ত্রস্ত সর্বেশ্বর, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে তাঁর স্নায়ুশিরা, এরা যদি তছনছ করে দেয় সব—যত্নে গড়ে-তোলা শূন্য-ইমারত? নাকি এক চক্রব্যূহে সামিল হয়ে পড়েছেন তিনি, আলো-আঁধারি থেকে মুক্তি নেই হয়ত। নাঃ, এ হতে দেওয়া যায় না, আরো বেশী আত্মস্থ হওয়া প্রয়োজন, আরো বেশী নিজস্ব নির্মাণের ভেতরে যেতে হবে তাঁকে।

প্রবল আত্মনিষ্ঠায় এই কর্ষণক্ষেত্রেই সহসা ছেলে এসে উপস্থিত—একেবারে মুখোমুখি। সযত্নে গড়ে তোলা দূরবর্তীতা ভেদ করতে চায় সে। স্বস্থিতি আঁকড়ে থেকে তার দিকে নিস্পৃহ দেখলেন।

ছেলে কথা বলছে, তাতে কিছুটা অভিমান, তুলনায় বেশী রূঢ়তা, অনেকটাই অপমানকর। —তোমাকে বলা না-বলা সমান। মা-র কাছে শুনেছি, নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনোদিন কিছু ভাব নি, কর-ও নি, আমিও তো তাই দেখছি। এ ব্যাপারে বলার কিছু নেই, বলতেও আসি নি, তোমার মত তুমি থাক। যাকগে, যে-কথা বলতে এসেছি, আমি বদলী হয়ে পরশু বাঙ্গালোর চলে যাচ্ছি। এমনিতেই তুমি আমাদের কোনো খবর রাখছ না আজকাল, এ-খবরেও তোমার কোনো আগ্রহ নেই জানি, তবু কর্তব্যবোধে তোমায় জানালাম। নতুন সংসার, তার ওপর ছেলে একেবারেই শিশু, তাই মা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, দু-তিনমাসও থাকতে পারে। তোমার জন্য মা ব্যবস্থা রেখে যাচ্ছে,—রান্না করার লোক, জামা-কাপড় কাচার লোক।

কথায় কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তারপরই বলল, কিছু বলবে?

অকস্মাৎ একটানা এইসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে, কী বলবেন সর্বেশ্বর ভেবে পাচ্ছেন না। শুধু অনুভব করলেন, তাঁর ভেতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। কেমন এক শূন্যতার ভেতরে চলে গিয়ে, যে শূন্যতার জন্যে তাঁর এত পরিশ্রম, এত অনুশীলন, এই শূন্যতা তার থেকে অন্যরকম, এক অসহ্য পীড়ন। সেই পীড়নের ভেতরে থাকতে থাকতেই লক্ষ্য করলেন, ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে থেকে সরে গেল, যেন তাঁকে নিষ্কৃতি দিতেই, গভীর ভাবনার ভেতরে তলিয়ে যাবার অবকাশ দিতেই যেন।

কী ভাবছেন সর্বেশ্বর?— এ ভাবনার শেষ নেই। নির্মল আকাশে ঝঞ্ঝা-উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে যাবতীয় অতীত-স্মৃতি। সময়ের ধারাবাহিকতা না মেনে সেই স্মৃতি তোলপাড় করে দিচ্ছে ওর নিজস্ব জীবন।

এখন কী করবেন সর্বেশ্বর?—প্রার্থিত শূন্যতার সঙ্গে এই অন্য-শূন্যতার কাটাকুটি খেলা হবে নাকি? সে তো এক ব্যাপক বিস্তার, এর জন্যে সমস্ত অতীত কর্ষণ করতে হবে।—তা

করেও বা কী লাভ? কোনো ফলাফল তিনি চাননি তো, অথচ এই একতরফা অন্যায়-অভিমান তাঁর জীবন মেনেও নিতে পারছে না। এই গ্লানি দূর না হলে কিভাবে আবার তিনি সেই শূন্যতার মুখোমুখি হবেন?—সেই নির্মল আকাশের মুখোমুখি?

তাঁর সন্তান,—তাঁরই প্রসৃতি তাঁকে জানিয়ে গেল, স্বার্থ ছাড়া কোনোদিন কিছু করেন নি, ভাবেনও নি। তার মা এই কথা তাকে বলেছিল, তার প্রমাণ সে পেয়েছে। তার এই অভিযোগ কিভাবে কাটবেন তিনি?—কত স্বপ্ন বুকে ধরে রেখে সেই স্বপ্নের ভেতরেই সন্তানকে বড় করেছেন, এতটুকু আঁচড় লাগতে দেননি কখনো। আর সেই সন্তানের মনে হয়েছে তিনি শুধু স্বার্থ-সন্ধানী!—পরক্ষণেই মনে হল, ভুল বলে নি তো? সন্তান তো তাঁরই প্রসারণ, সে-অর্থে ওর স্বার্থ নিজেরই স্বার্থ—কথাটা ভুল বলে নি। তবে কেন এত অভিমান তার? ও বাঙ্গালোর চলে যাবে, সর্বেশ্বরের কাছে তাতে কীই বা তফাৎ—বর্তমান দূরত্ব থেকে কতটাই বা অতিরিক্ত? তাঁকে খবর দিতে আসার অর্থ অভিমানটুকু জানানো, তাতে সর্বেশ্বরের বিচলিত হবার কথা নয়। ওর জন্যে সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন ওর স্ত্রী, এতে কি সন্তানের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, যোগসূত্রটা এখনো রয়ে গেছে?—মনে মনে হাসলেন সর্বেশ্বর, তাঁর জীবনের কোনো খোঁজই রাখে না ওরা। এ-ও জানে না, মেয়ে এখান থেকে চলে গেছে অন্য জীবনের দিকে, সন্তান চলে যাচ্ছে অন্য অবস্থানে, সেই অবস্থান গড়ে দিতে স্ত্রী যাচ্ছেন ওর সঙ্গে,—নিজের জীবনের স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় সহযোগ আর কী হতে পারে।

ক্রমে স্বস্তিতে ফিরছেন সর্বেশ্বর। কাটাকুটি খেলার শেষে নিজের অবস্থানভূমি চিনতে পারছেন যেন। সেখানে নিজেকে স্থিত রেখে দেখছেন, সামনের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী যে শূন্যতা রেখে গেল ওর জন্যে, তাঁর প্রার্থিত শূন্যের প্রতিযোগী নয় ওরা। চূড়ান্ত এই কাটাকুটি-খেলার শেষে হয়ত এবারই তাঁর পরিশ্রমের, যাবতীয় অনুশীলনের অবসান।

এই স্বস্তির ভেতর সর্বেশ্বর স্থির হয়ে বসে আছেন। জগৎ-সংসারের ওপরে স্থায়ী হচ্ছে তাঁর আসন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন আগেই, সংসারও দূরবর্তী হল। কোনো পরিপার্শ্ব নেই, এখন সামনে অবারিত আকাশ, সেখানে স্থাপিত হবে তাঁর প্রার্থিত শূন্যতা।

সেই শূন্যতার খোঁজে অনন্ত সময় শুধু প্রবহমান। পরিশ্রম ও অনুশীলনের পর্ব শেষ হয়েছে, আর কোনো কাটাকুটি খেলা নেই, স্বচ্ছন্দে আকাশ তাই নির্ভার হয়ে উঠতে পারে, তাঁর একেবারেই নিজস্ব জীবনের ভেতরে এখন গড়ে উঠবে শূন্য-নির্মাণ।

সর্বেশ্বর অপেক্ষায় আছেন।—কত সময় পার হয়ে গেছে, হিসেব নেই। আগ্রহ-ও নেই তাতে। এখন শুধু সবকিছুর ভেতরে না-কে আবিষ্কার করা, —ফেলে-আসা পৃথিবীর যাবতীয় গ্রহণ তাঁকে সম্পন্ন করে নি, বিনিময়ে শুধুই আঘাত, এ-সবই বস্তুত তাঁকে শূন্যতার দিকে নির্দেশ করেছে। তার হদিস পান নি আজও,—যাবতীয় পরিশ্রম, অনুশীলন, এই পরিপার্শ্বের

শূন্যতা কিছু হদিস দিয়েছে তাঁকে, তাই অপেক্ষায় থাকা। শুধু পর্যবেক্ষণ, সময়ের প্রবহমানতায় নিজেকে নিশ্চেষ্ট রেখে গড়ে তোলা শূন্য-নির্মাণ। এমনই সে-নির্মাণ, যে কোনো নির্মাণের প্রতিপক্ষ হলে,—লৌকিক নয়, এ এক অলৌকিক কাটাকুটি খেলা। ক্রমাগত এই খেলায় নির্মাণ-বিনির্মাণ অনিঃশেষ ঘটেই চলেছে। এর কি শেষ নেই!—শূন্য কি তবে অলীক প্রস্তাব!—ভাবছেন তিনি। ভাবতে ভাবতেই দেখছেন, একটা অবশেষ থেকেই যাচ্ছে, কাটাকুটি তাকে বাড়তে দিচ্ছে না শুধু। খেলা থামলেই এগিয়ে যায় বিস্তারে দিকে। অতএব এই খেলা খেলেই যেতে হবে তাঁকে।—কিন্তু কতকাল!—আর কেনই বা!

# অভিমুখ কোথায়!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সহসাই মনে হল, এবার কোথায়!

যখন বাড়ির ভেতরে, কিছু একটা সমস্যা ছিল। তা এতটাই তীব্র, সমাধান খোঁজার জন্য বেরিয়ে যাবার অনিবার্যতায় অন্য কোনো ভাবনা ছিল না। বাইরে আসার পর সেই সমস্যা হারিয়ে গেছে, নতুন সমস্যায় আক্রান্ত আমি—এবার কোথায়?

মনে হচ্ছে পুরনো সমস্যার চেয়ে বর্তমান সমস্যা অনেক বেশী জটিল। সমাধানের অভিমুখ যেভাবেই হোক তৈরী হয়েছিল, যে-কারণে অনিবার্য বেরিয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবার?

ভাবতে ভাবতে যেন এক নিরালম্ব অবস্থানে। আমার অতীত বিস্মরণে গেছে, ভবিষ্যতের দিকে অভিমুখ ঠিক করা যায়নি, মধ্যবর্তী এই অলৌকিক বর্তমান,—বুঝতে পারছি, অতীত ও ভবিষ্যৎ না থাকলে পরম্পরাহীন এই বর্তমান-অবস্থান কোনোভাবেই লৌকিক হবে না, তাই যোগসূত্রহীন নিরালম্ব আমি, পরম্পরার সন্ধানে আমাকে যেতেই হচ্ছে। অতীত থেকে শুরু করতে হবে, সেই সূত্রে বর্তমানে এসে, এরপর ভবিষ্যতের জন্যে কিছু একটা,—এভাবে পরম্পরা তৈরী হতে পারে।

অতীতে কী হয়েছিল? সেখানে কোন সমস্যায় আক্রান্ত ছিলাম! চারদিকে ছড়ানো এলোমেলো চিন্তাগুলি, তা থেকে গঠিত স্থির ভাবনাটা লেজার রশ্মির মত সময় ভেদ করে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে, গুহায়িত অন্ধকারে দৃশ্যগুলি খুঁজে নেবার জন্যে, যার সমবায়ে সমস্যাটি তৈরী হয়েছিল, সমাধানের জন্যে প্রেরিত করেছিল। অবশেষে বাড়ির বাইরে এখন নিরালম্ব দাঁড়িয়ে আছি।

অতীতের গুহায় কিছু কিছু দৃশ্য, জ্বলে উঠে চকিতে নিভে যাচ্ছে, দু-চারটে শব্দও ছিটকে আসছে এপাশ ওপাশ থেকে। স্থিরদৃশ্য কিছু নয়, দৃঢ় ভাবনাটা চেষ্টা করছে যদি কোনো চলচ্চিত্র গড়ে তোলা যায়।—'অসহ্য এই দিনযাপন', বাক্যটি ছিটকে এল কোনো একদিক থেকে, একই সঙ্গে মুহূর্তে আলোকিত এক মূর্তি। স্পষ্ট চেনা গেল না, তবুও আমার বোধে একটা সংস্কার, ছিটকে-আসা বাক্যটি সেখানে যুক্ত হয়ে কিছু একটা যেন, কিছুতেই আমি তাকে লৌকিক করতে পারছি না।—'আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব, কী ভেবেছ?' দীর্ঘায়িত এই বাক্যটি অন্য একদিক থেকে, তার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত অন্য এক মূর্তি, অনেকটাই বিবর্তিত। এবারও স্পষ্ট চেনা গেল না,—সংস্কৃত নতুন এক বোধ, ছিটকে-আসা বাক্যটি সমন্বিত হয়ে এবার একটু বেশীই উগ্র, যদিও লৌকিক নয় এখনও।—'এক্ষুণি বেরোও, নইলে—', বাক্যটি সম্পূর্ণ হবার আগেই আমার অভিমুখ নির্দিষ্ট হয়েছিল। ফলে আমার অবস্থান এখন বাড়ির বাইরে, নিরালম্ব। সম্পূর্ণ নিরালম্ব হয়ত নয়, একটা সন্ত্রস্তভাব বোধের ভেতরে। আমি এখন এ-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে অতীতের দিকে কিছুতেই আমার অভিমুখ হতে পারে না।

অতএব এই মুহূর্ত-বর্তমান ভবিষ্যতের দিকেই চোখ রেখেছে—এবার কোথায়? আমার অভিমুখ ভবিষ্যতের কোন দিকে?

সামনে তিন দিক খোলা, যেদিকে খুশী যেতে পারি। এছাড়া পেছনের দিকে যেহেতু কিছুতেই আর না—ওপরে বা নিচে। নিচে আমি যেতে পারি না, ওপরের দিকে শুধু চোখ যেতে পারে, খুঁজে নিতে পারে কিছু অবকাশ। সেটুকু যথেষ্ট নয়, আমাকে যেতে হবে সামনে তিনদিকের যে কোনো একটি দিকে।

চোখ বরাবর সোজা চলে গেলে অনিতার বাড়ি। আমি সেইদিকে গেলাম।

অনিতা বাড়িতেই ছিল। আমাকে দেখে সামান্য হেসে অভ্যর্থনা জানাল—এসো, অনেকদিন পর এলে।

একটু বসব তোমার এখানে। অনেক কথা আছে।

বাবা বসার ঘরে আছেন। ওখানেই বোসো, গল্প কর, আমি চা করে আনছি।

কেমন আছেন মেসোমশাই? শরীর ভাল?

এই বয়েসে যতটা ভাল থাকে। তোমার খবর কি? প্রমোশন পেয়েছ শুনলাম।

প্রমোশন! একটু ভেবে নিয়ে, তা পেয়েছি একটা।

দীপক তো বাঙ্গালোরেই অন্য চাকরিতে জয়েন করল। মাইনে আগের চেয়ে বেশী।

অনিতা ট্রে-তে চা নিয়ে এসে মেসোমশাইয়ের দিকে এক কাপ এগিয়ে দিল। দু'কাপ টেবিলে রেখে এদিকের মুখোমুখি দুটি চেয়ারে দুজনে বসেছি। মেসোমশাই আর খবরের কাগজ, আমি আর অনিতা, এভাবে দু'টি ঘর তৈরী হয়ে মাঝখানে অদৃশ্য দেয়াল। শব্দের উচ্চতা নামিয়ে, যেন দেয়াল টপকাতে না পেরে সেইভাবে কথার্বাতা শুরু হল।

কি হয়েছে অমল?

দুঃসহ অবস্থা। তোমাকে বোঝাই কি করে, নিজেই বুঝতে পারছি না।

কেন এমন হল?

কেন যে এমন হয় বুঝি না।

দাদাকে ফোন করেছ?

দীপক এতদূর থেকে কী করবে!

তবে আর কী করবে বল, ফিরে যাও। একসময় ঠিক হয়ে যাবে। সন্ধেবেলায় যাব তোমার বাড়ি।

যেও না, তাহলে আরো গোলমাল।

তবে?

তাইতো, দেখি কী করা যায়। চলে এলাম অনিতার বাড়ি থেকে।

যেখান থেকে সামনের দিকে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি বাড়িটা স্থির হয়ে আছে। যেন কত শতাব্দী-প্রাচীন, ভেতরটায় পা পড়েনি কতকাল! কিন্তু সেদিকে অভিমুখ নেই। ডানদিকে বাঁদিকে আরো দুটো দিক এখনো খোলা আছে।

ডানদিকে গেলে অচিন্ত্য-র বাড়ি। আমি সেইদিকে গেলাম।

অচিন্ত্য-র বাড়ি যেতে, দুটো রাস্তা পেরিয়ে তারপর ডানদিকে গেলে প্রথম বাঁদিকের

রাস্তায় তৃতীয় বাড়িটা। বাঁদিকের মোড়ে পৌঁছেই কোলাহলটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে তীব্র হয়েছে। দরজা বন্ধ থাকলেও জানালাগুলি খোলা, পর্দাগুলি কাঁপছে, শব্দ নাকি হাওয়ার জন্যে বোঝা গেল না। মনে হল যেন বাড়িটাই কাঁপছে। স্তম্ভিত অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে! কী করা যায় ভাবতে ভাবতে, অভিমুখ এখন আর পাল্টানো যাবে না, মরিয়া হয়ে কলিং বেলটা বাজিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ সব। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বিধবস্ত অচিন্ত্য বেরিয়ে এসেছে। মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল, মুখচোখের বিকৃতিগুলি এখনো মুছতে পারেনি। তাই নিয়েই ডাকল, আয়।

ঘরের ভেতরে ঢুকে, ঘরটা অগোছালো এখনো, সোফার একপাশে গিয়ে বসলাম। অসময়ে এসে পড়েছি নাকি, অচিন্ত্য?

অগোছালো সবকিছু কিছুটা এধার ওধার করতে করতে অচিন্ত্য বলল, সময় আর অসময়। এভাবেই থাকা, থাকবো, অনেকদিন আসিস নি তুই?

হ্যা, আসা হচ্ছে না। কি করছিলি? খুব ব্যস্ত?

না, কিছু করছি না তো! তুই কি বাড়ি থেকে?

বাড়ি থেকে! ভাবতে সময় নিলাম, হ্যা বাড়ি থেকেই। না না, অন্য এক জায়গা থেকে আসছি।

চা খাবি তো?

সেটা জরুরি নয়। ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে কথা বলে হাল্কা হব। মনে হচ্ছে, তোর নিজেরই অবস্থাই—

অঞ্জনা ট্রে-তে দু'কাপ চা সাজিয়ে এনেছে, সঙ্গে মিষ্টি আর বিস্কুট। ওর চোখমুখেও হাসিটা বসানো, চুল অবিন্যস্ত, মোছার চেষ্টা হয়েছে তবু নাকের পাশে ঘাম লেগে আছে। গলার স্বর পাল্টে নিয়ে, সর্বাণী কেমন আছে, এদিকে আসার নাম নেই।

কিছু বলতে পারলাম না। আমার হাসিটাও স্বাভাবিক নয়।

অঞ্জনা চলে গেছে। অচিন্ত্য বলল, চা যখন এসেই গেল খেয়ে নিয়ে বাইরে বেরোই চল। তুইও ঝামেলায় আছিস বুঝতে পারছি। বাইরে গিয়ে শুনব।

বাইরে বেরিয়ে এসে, কি কথা কিভাবে বলব, কেন বলব, এসব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। বললাম, তোর বাড়িতেও দেখছি ঝড়, বাইরে থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

আর বলিস না, সবকিছুরই একটা সীমা আছে। আমি কি ফালতু নাকি, ঠিক সময়ে বেলটা বাজিয়েছিলি, নইলে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।

আমার সমস্ত কথা হারিয়ে যাচ্ছে। বললাম, আমি আজ চলি বুঝলি, মাথা গরম করিস না। করে লাভ কি বল?

আমার কথা বাদ দে, যা হবার হবে। তুই কিছু বলতে এসেছিলি, বললি না তো!

না থাক। আর একদিন বলব।

ফিরে এসেছি পুরনো অবস্থানে। বাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে, তেমনি স্থির। আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে না। ওর ভেতরটাও স্থির, হয়ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে। বাঁদিকে এখনো খোলা, যেতে পারি আমি। এটাই কি নির্দিষ্ট করবে আমার অভিমুখ!

বাঁদিকে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। অনেক সময়, অভিমুখ সম্পর্কে নিশ্চি ত হবার জন্যে। এই পথ পেরোতে পেরোতে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে, এরপর বাস ধরতে হবে। বাসস্টপে নেমে রাস্তা পার হওয়া, ডানদিকে কিছুটা গেলে বাঁদিকের রাস্তায় আরো কিছুটা পথ। প্রথম যে রাস্তা পড়বে তার মোড়ে সন্দীপের বাড়ি।

সন্দীপের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, মনের এই অবস্থা সত্ত্বেও বাড়ির স্থাপত্য আমাকে আকর্ষণ করল। দোতলার বারান্দায় সন্দীপ আর কল্পনা দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে। আশ্চর্য, আমাকে ওরা দেখতে পেল না, স্থির কোনো ভাবনায় মগ্ন। অগত্যা বেল বাজাতে হল, তক্ষুনি সন্দীপ উঠে দাঁড়িয়ে, আরে অমল! দাঁড়া নামছি।

সন্দীপ ওকে একতলার বসার ঘরে নিয়ে গেল। ফ্যানের সুইচ টিপে, আমাকে বসতে বলে নিজেও পাশে বসল। কি ব্যাপার, এই ভরদুপুরে!

সন্দীপের প্রশান্ত মুখে বিস্ময়ের ছিটে পড়ে সুন্দর দ্যাখাচ্ছে। একটু কৌতূহলের রঙ-ও সেই মুখে। নিজেকে স্বার্থঃপর মনে হল, ওদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম? কিন্তু উপায় ছিল না, আমি প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছি।

ইতিমধ্যে কল্পনাও নেমে এসেছে। মুখে সামান্য হাসি ছড়িয়ে, সুডোল মুখে মানানসই।

কল্পনা বলল, কি ব্যাপার অমল? উদ্ভ্রান্ত লাগছে তোমাকে! কোথা থেকে আসছ? বিপদ হয়নি তো কিছু?

বিপদ! আমতা আমতা করছি আমি। বিপদ মানে সে অর্থে তেমন নয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। তোমাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটল তো।

সেটা কিছু না, খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বসেছিলাম। তোমার খাওয়া হয়েছে?

খাওয়া, মানে এখন কটা বাজে?

দুটো বাজে। কোথা থেকে আসছ?

কোথা থেকে! এই দু চারজায়গায় ঘুরে এলাম। ছি ছি, তোমাদের অনর্থক বিব্রত করছি।

সর্বাণী কোথায়? ভাল আছে তো?

বাড়িতেই হবে, আর কোথায়। ও ভালই আছে।

বুঝতে পারছি, আবার শুরু হয়েছে। সর্বাণী পারেও বটে। খাওয়া না হলে এখানে খেয়ে যাও।

না না। আমি চলি।

সন্দীপ বলল, তোমাদের ঐ একটাই ভাবনা, ওর তো অন্য সমস্যাও থাকতে পারে। যাক গে, কোনো দরকারে এসেছিলি? বল, কী হয়েছে?

কী বলব! আমার অভিমুখ হারিয়ে গেছে, ওদের স্বাচ্ছন্দে আমার ভেদশক্তি কাজ করছে না। অগত্যা বললাম, পরে বলব, চলি আমি।

বেরিয়ে এলাম। যেতে যেতে শুনছি কল্পনা বলছে, বিকেলে বাড়ি আছ তো? আমরা যাব।

ফিরে এসেছি আমি, নিজের বাড়ির দিকেই অভিমুখ। বাড়িটা সেই পুরনো অবস্থানে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে তিনটি অভিমুখ তখনো ছিল, এখন রুদ্ধ হয়ে, ওপরের দিকে চোখ রেখেও কোনো অবকাশ নেই সেখানে।

কি করব এখন? কী করতে পারি আমি। মানুষের একা-অবস্থান বিপন্ন যখন, খুঁজে নিতে হয় অন্য অভিমুখ। অন্য-অবস্থান পাওয়া যাবে এই আশ্বাসেই তো সমাজ গড়ে ওঠা, একা মানুষ যেন সামাজিক অবস্থানে যেতে পারে। অথচ অভিমুখগুলি রুদ্ধ হয়ে, সহযোগের ভান সাজিয়ে তারা, আসলে যোগাযোগ-প্রক্রিয়ায় এমন দুরূহ জটিলতা, ভেদশক্তি কাজ করে না। অতএব প্রতিপন্ন হল তো, সামাজিক অবস্থান এক অতিকথা। মানুষকে তার একা-অবস্থানেই ফিরে যেতে হয়। যে অভিমুখ বিপন্ন জেনে অনিবার্য আমার বেরিয়ে পড়া, সেখানেই ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। এটাই তো আজ সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা! সারাৎসার,— সামাজিক নামক অলীক অবস্থানটি নিরাপদ কোনো আশ্রয় নয়। বস্তুত, নিরাপত্তা কোথাও নেই। নিজেকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, একাকী-অবস্থান সুরক্ষিত করে দুর্ভেদ্য করতে হবে, যার ভেতরে একা-মানুষ তার নিজস্ব পৃথিবী গড়বে, প্রতিরোধ চূর্ণ হলে তা ভাঙবে, এছাড়া অন্য বিকল্প নেই আর।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে এইসব তত্ত্ব বোঝার পর অভিমুখ বদলে দিলাম। দরজা বন্ধ থাকলেও সেই অভিমুখে স্বচ্ছন্দে যেতে পারি আমি। যে যাবে সে অন্য আমি, এই পৃথিবীর ভেতরে সেই একা-মানুষটি তার চারপাশে দুর্ভেদ্য বলয়, সেখানে তার নিজস্ব পৃথিবী অন্য পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। সমস্ত পৃথিবী এখন আমার মুখোমুখি, বিনিময়ের প্রত্যাশা নেই, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। দরজায় কলিং বেলের সুইচে হাত দিয়ে চাপ দিলাম।

অপেক্ষায় আছি, যে কোনো মুহূর্তে বিজয়ীর মত প্রবেশ করব, একা-অবস্থান চিহ্নিত করে দখল নেব তার।

চতুর্থ বর্গ

# স্থায়ী ঠিকানা

ওরা তিনজন তিনরকম। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। একটাই মিল, ওদের কারো কাছেই ঠিকানা ছিল না।

গৌরীশংকর, মণিশংকর আর শিবশংকর। ওদের বাবা শুভশংকর সব ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। স্ত্রী মারা যাবার পর ছেলেদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করা, তিনতলা একটা বাড়ি। বড় ছেলে গৌরীশংকরকে একতলায়, মেজছেলে মণিশংকরকে দোতলায়, ছোটছেলে শিবশংকরকে তিনতলায় থাকতে বলেছেন। যার যার যোগ্যতা ও মনোভাব অনুযায়ী, তাঁর পরামর্শেই বড়ছেলে জীবন বীমার দালাল, মেজোছেলে ইংরিজীর অধ্যাপক, ছোটছেলে ব্যাঙ্কের কেরানী। প্রত্যেকের কাছে একমাস করে থেকে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নানা উপদেশ দিয়েছেন। সবাইকে বলেছেন, নিজের নিজের ঠিকানা প্রত্যেকের জানা উচিত। খুঁজে নিতে হবে, এর জন্যে হয়ত সমস্ত জীবনটাই ক্ষয় হয়ে যায়, উপায় নেই, খুঁজতে হবে, নাহলে জীবন অর্থহীন। নিজের সঞ্চয় যা কিছু ছিল, পোস্টাফিসে, ইউনিটে, শেয়ারে, সব ভাঙিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে একদিন ছেলেদের ডাকলেন, তিনভাগ করে হিসেব বুঝিয়ে দিলেন। এরপর কাউকে যন্ত্রণা না দিয়ে একদিন রাত্রে তিনি মারা গেলেন।

বাবা মারা যাবার পর তিনজনই বুঝল, ওদের ঠিকানা নেই। মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেছে, এখন রোদ জল ঝড় থেকে বাঁচবার জন্য ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে।

গৌরীশংকর নিজের সম্পর্কে আবিষ্কার করেছে,—হাঁটতে খুব ভালবাসে। নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে। অনেকদূর হাঁটতে হবে, ভাবলেই আনন্দ হয়। খাওয়া, ঘুমনোর সময় ছাড়া সবসময় সে হাঁটছে। সকালে অনেকটা পথ হেঁটে আসে, তারপর দুধ আনতে যায়, বাজার করে, লোকের বাড়ি বাড়ি যায়, অফিসেও বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বিকেলে বাড়ি ফিরে, চা জলখাবার খেয়ে, আবার কিছুটা পথ হেঁটে আসে। কখনো কখনো পরিচিত লোকের বাড়ি যায়, বেশীক্ষণ বসে না। সংসারের টুকিটাকি জিনিস আনতে হলে, কিছু কাজ পড়লে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে। রাত্রে খাওয়ার পরও একটু হেঁটে আসে।

স্ত্রী বলে, এত বাইরে বাইরে ঘুরছ, বাড়িতে বসতে পার না? ছেলেকেও তো একটু পড়াতে পার।

গৌরীশংকর শুধু হাসে। স্ত্রী জানে না, কেন তাকে এত হাঁটতে হয়। বসে থাকতে ভাল লাগে না, হাঁটতে ভাল লাগে, তাই হাঁটে। হাঁটলে শরীর স্বচ্ছন্দ হয়, মন ভাল থাকে। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশের বাড়িঘর, পার্ক, দোকান পেছন দিকে চলে যায়, চলেই যায়, এটুকু মাত্র, বোধ ওকে এর বেশী কিছু দেয় না।

মণিশংকর অন্যরকম ভাবে। মানুষের নানা ভাবনাচিন্তা, মানুষের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, কত কিছু জানার আছে। এসব জানতে হবে। অনর্থক ছোটাছুটি করে লাভ কী, বাড়িতে বসে বরং বইপত্র নিয়ে থাকা ভাল। মন ভাল থাকে, তৃপ্তি পাওয়া যায়। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে

খেতে খবরের কাগজ নিয়ে বসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিভিন্ন খবর, দেশের হাল হকিকৎ, কার কী মতামত, নানাধরনের লেখা থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, এমনকি বিজ্ঞাপন পড়লেও অনেক কিছু জানা যায়। তারপর দর্শনের বই, সাহিত্যের বই, ইতিহাসের বই, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, কোনোকিছুই বাদ দেয়া যায় না, সমস্ত জীবন ধরে পড়ে গেলেও সামান্যই জানতে পারা যাবে, তবু যতটা সম্ভব জানতে হবে। চাকরি করতে যেতে হয়, তাই কলেজে যাওয়া, কয়েকটা ক্লাশ সেরেই বাড়ি ফিরে আসে, আবার বইয়ের ভেতরে।

স্ত্রী রীতিমত বিরক্ত মণিশংকরের ওপর।—কেমন এক লোককে বিয়ে করলাম আমি। সখ আহ্লাদ নেই, রসকষ নেই। সিনেমা থিয়েটারেও যায় না লোকটা, সারাদিন কেবল বাড়িতে বসে থাকে।

মণিশংকর বলে, আমি আমার মত। তুমি তোমার মত থাক। সিনেমা থিয়েটারে যাও, বন্ধুদের বাড়ি যাও।

এটা কোনো কথা হল? বাড়িতে পুরুষমানুষ বই মুখে বসে থাকবে, আর আমি টো টো করে ঘুরে বেড়াব। মেয়েটাও তোমার মতই হয়েছে। সখ আহ্লাদ নেই, শুধু বই আর বই। তোমার না হয় দিন কাটছে, ওকে পরের সংসারে যেতে হবে।

মণিশংকর বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। শুধু বলে, তুমিও এস, কত কিছু জানার আছে, আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

ওদের কথাবার্তা এরপর আর এগোয় না।

মাঝে মাঝে অন্যরকম ভাবে মণিশংকর। কত কিছু জানা যাচ্ছে ঠিকই, আনন্দও পায়, কিন্তু তারপর? একা-একা এভাবে আনন্দটা অসম্পূর্ণ। কত লোক ছুটছে, টিভি-তে খেলা দেখছে, আড্ডা মারছে, সিনেমা যাচ্ছে, যেন সবাই খুব মজায় আছে। কী যে মজা, মণিশংকর বুঝতে পারে না, অন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে কিছু কি গড়ে ওঠে? তার কাছে হদিশ নেই। মেয়েটাও পড়তে চায় খুব, ও আর কতটুকু বোঝে। একা-একা এইভাবে সব জানতে জানতে, কোনো বিনিময় ছাড়াই, কোন সার্থকতা আসবে তার জীবনে? একদিন মরে যাবে, পৃথিবীর কী এসে যায়, মণিশংকরেরই বা কী লাভ হবে? তবু তাকে পড়াশোনা করে যেতে হয়, অন্য কিছুর হদিশ তার কাছে নেই।

শিবশংকরও নিজের মত। যতক্ষণ পারে শুয়ে থাকে, ঘুমের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও। ঘুম থেকে দেরী করে ওঠে, বাথরুম স্নান খাওয়া সেরে অফিসে যেতে এমনিতেই দেরী হয়ে যায়, খবরের কাগজের হেডিং-ও প্রতিদিন দ্যাখা হয় না, বাজার করার সময় কোথায়? বাড়ির সামনে সব্জি-অলা, ফল-অলা, মাছ-অলারা আসে, ওর স্ত্রী যাকিছু কেনাকাটা ওদের কাছ থেকে সেরে নেয়।

অফিসে যায় কিন্তু কাজ করতে ভাল লাগে না। এত কাগজ ঘেঁটে কী হবে। আবেদনপত্র, টাকাপয়সা, কত ধরনের সমস্যা, এসব ঘাঁটাঘাঁটি একদম ভাল লাগে না। তার চেয়ে চা খেয়ে গল্প করে সময় কাটে ভাল, একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে হত, এত হৈ হল্লায় ঘুমও হয় না। মাঝে মাঝে কেউ এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে বকুনি খেয়েছে কয়েকবার। মাঝে মাঝে তাই ক্যান্টিনে গিয়ে ঘুম সেরে নেয়। যাই হোক, অফিস থেকে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত, চা জলখাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে।

এত ঘুম দেখে, বিরক্ত ওর বৌ। বলে, অফিসে এত কী কাজ কর, এসেই শুয়ে পড়তে হয়!

সে তুমি বুঝবে না। জেগে থেকে লাভ কী? ঘুমের মত শান্তি কোথায় পাবে? তুমিও ঘুমিয়ে পড়।

বৌ অবাক, কী বলছ তুমি? এই সন্ধেবেলায় শুয়ে পড়ব, রান্নাবান্না করবে কে?

ঠিক আছে, তাই কর। রান্না হলে ডেকো।

খেয়ে আবার শুয়ে পড়বে, তাই তো?

শিবশংকর কথা বাড়ায় না। শুয়ে ঘুম না এলেও ভাবতে ভাল লাগে। চারদিকে এত কথা, হৈ হুল্লোড়, বিশেষ করে নানারকম সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘুম বেশ ভাল আড়াল। যতক্ষণ জেগে থাকতে হয়, জেগে জেগে ক্লান্তি আসে, তখন ঘুম, ঘুমোতে ঘুমোতে ক্লান্ত হয়, তখন জেগে উঠে ক্লান্তিতে আবার ঘুম। ঘুমের ভেতরে থেকে পৃথিবীটা চারপাশ দিয়ে চলে যায়, নিরালম্ব শিবশংকর নিজেকে এই অবস্থানে রেখে স্বস্তি পায়। বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না, বিছানার স্বাদ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বৌ তবু ছাড়তে চায় না। বলে, বাপের বাড়ি যাই না অনেকদিন, ঝুনুকাকা কতবার বলেছে যেতে, বিয়ের পর যাবার সময়ই হল না। শেফালী, ঝুমা, কৃষ্ণারা কত কি বলে, কিন্তু ওরা যদি জানত, ঘুমের ভেতরেই তুমি থাক। অফিস থেকে তাড়াতাড়িই তো ফেরো, কোথাও যেতে পারি আমরা।

কী হবে গিয়ে বলতো? সেই এক প্যানর প্যানর।

আমার সঙ্গেও তোমার কোনো কথা নেই?

সে তো এক কথা, কলেজ-জীবনে কী মজা করেছ, বাবা-মার কথা, বন্ধুদের কথা। নতুন আর কী? আমার ভাল লাগে না, তার চেয়ে এই বেশ আছি।

এমন আশ্চর্য লোক দেখি নি আমি। পড়াশোনা নেই, কাগজটাও পড় না, বেড়ানো নেই, সিনেমা-থিয়েটার নেই, আড্ডা মার না, তাস খেল না, টিভি দ্যাখ না, খেলাধূলোয় আগ্রহ নেই। কী আছে তোমার? বৌ বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

তিন ভাইয়ের এইরকম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, ফলে ওদের মধ্যে দ্যাখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয় না। কিন্তু ওদের স্ত্রী কল্যাণী, অর্পিতা ও ষোড়শী, প্রায়ই নিজেদের সুখদুঃখ নিয়ে আলোচনা করে, যন্ত্রণার কথা বলে, কোনো সুরাহা হয় না। কল্যাণী বলে, কী যে এত বাইরে বাইরে, আমার কথা বাদ দাও, সংসার, মেয়ে নিয়েও কিছু ভাবে না, এমন উদাসীন। অর্পিতা বলে, শুধু বই মুখে দিয়ে কি করে যে জীবন কাটায়, কোন ধাতুতে গড়া বুঝতে পারি না, মেয়েটাও একই রকম হয়েছে। ষোড়শী বলে, তোমাদের তো একরকম, ওর তো বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই জীবনে। এবং তিনজনই একমত, ওদের সংসার না করাই উচিত ছিল। বাবা যে কী পরামর্শ দিয়ে গেলেন !

একদিন গৌরীশংকরের বাড়িতে টেলিফোন বাজল। বাড়িতে নেই শুনে, কখন পাওয়া যাবে জেনে, সেই সময় আবার টেলিফোন বাজল। গৌরীশংকর ফোন ধরেছে, ওপার থেকে কথা ভেসে এল—আমাকে তুমি চিনবে না বাবা, ছোটবেলায় দেখেছ, তোমার বাবার অভিন্ন-

হৃদয় বন্ধু ছিলাম। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে, কখন গেলে দ্যাখা হবে? একটা দিন ও সময় ঠিক করে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই মণিশংকরের ঘরে ফোন বাজল। তাকেও একই কথা বলে একই দিন ও সময় ঠিক করে নিলেন। শিবশংকরের ঘরে ফোন বাজতে খুবই বিরক্ত। ষোড়শীর অনেক অনুরোধের পর ফোন ধরল। তাকেও একই কথা বলতে আবার বিরক্ত। আমাকে আবার কেন, ওসব আলোচনা টালোচনা আমার ভাল লাগে না। ভদ্রলোক আবার অনুরোধ করলে নিমরাজি হয়েছে, ঠিক আছে, আসুন, দ্যাখা যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ভদ্রলোক এলেন। গৌরীশংকরের ঘরে বসার ব্যবস্থা হল। মণিশংকর ও শিবশংকরকেও ওখানে ডাকা হয়েছে। ওদের মনোভাবে স্বাচ্ছন্দের অভাব ও কৌতূহল মেশানো ছিল। ওদের স্ত্রীরাও এসেছে। গৌরীশংকরের স্ত্রী চা ইত্যাদি ব্যবস্থা করার উদ্যোগ করলে তিনি বললেন, ওসব খুব জরুরি নয়, আলোচনার সময় তোমাদের উপস্থিতিটা বরং বেশী জরুরি।

ভদ্রলোক সুরু করলেন এভাবে—ছোটবেলায় তোমরা আমায় দেখেছ, মনে করতে পারছ কিনা জানি না। ওরা কেউ মনে করতে পারল না। যাক, সেটা খুব জরুরি নয়, আর আমার নাম জানাটাও এখানে প্রসঙ্গ নয়, বরং আমি যা বলতে এসেছি সেটা অনেক জরুরি। শুভশংকর আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিল, ছোটবেলা থেকে আমাদের অনেক ভাবনা-বিনিময় হয়েছে। অনেক সিদ্ধান্ত আমরা দুজনে মিলে নিয়েছি। আমার কোনো সন্তান নেই, কিন্তু তোমাদের জন্ম হওয়া, তোমাদের ছোটবেলা আমি জানি। তোমাদের আমি নিজের সন্তানের মতই মনে করি। এরপর বহুদিন আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি কিন্তু তাতে মানসিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটেনি। এসব কথায় তোমাদের উৎসাহ থাকার কথা নয়, উৎসাহ যে নেই মুখচোখ দেখেই বুঝতে পারছি। তাই মূল কথায় সরাসরি চলে আসি।

অগোছালো ভাবটা গুছিয়ে নিয়ে ওরা মনোযোগী হলে, গলার স্বর পাল্টে তিনি বলতে থাকলেন—বছরখানেক আগে তোমাদের বাবা মারা যান, তার আগে স্বাচ্ছন্দের জন্যে যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করে গেছেন। পাশাপাশি কিছু কথাও তোমাদের বলেছেন, যার কিছু হয়ত শুনেছ, কিছু শোন নি, শুনলেও বুঝতে পার নি। এ সন্দেহটা তাঁর মনেও ছিল, তাই আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন, যেন সেইসব কথা স্মরণ করিয়ে দিই। বস্তুত এইজন্য আজ তোমাদের কাছে আসা।

নতুন কিছু শোনবার জন্য তিনজনে আরো মনোযোগী হল।

দ্যাখ, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্থায়ী এবং নিজস্ব ঠিকানা থাকে। আমরা তার জন্যে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে সন্ধান করে চলি সমস্ত জীবন ধরে। কেউ তার আভাসমাত্র পায়, কেউ কেউ সহসাই পেয়ে যায়, অনেকে তার হদিশই পায় না। তোমাদের বাবা এই কথাগুলি বলেছিলেন, মনে আছে তো?

কেউ মনে করতে পারল না। কিন্তু তিনজনই বলল, এই বাড়িটাই তো আমাদের স্থায়ী ঠিকানা। এবং এই কথাটুকু জানাবার জন্যে এতদিন পরে ভদ্রলোক ঘটা করে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন ভেবে ওরা আশ্চর্য হল।

ভদ্রলোক হাসলেন। বুঝতে পারছি, শুভশংকরের কথা মোটেও তোমরা বুঝতে পার নি। এই যে বাড়ি, তোমাদের স্ত্রী, সন্তান, এসব কোনোটাই স্থায়ী ঠিকানা নয়। তোমরা সকলেই কিছু না কিছু খুঁজছ যে যার নিজের মত করে, স্থায়ী ঠিকানাটাই খুঁজছ, কিন্তু খোঁজাটা যে ঠিকমতো হচ্ছে, এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত কিনা, এটা মনে করিয়ে দেয়াই আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। শুভশংকর তাই চেয়েছিল।

গৌরীশংকর অনেক ভেবে বলল, বাবা তো কত কথাই বলতেন, অনেক কথার মানে আমরা বুঝতাম না। গভীরভাবে ভেবেও দেখি নি। একবার মনে হয় এমন বলেছিলেন, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের ভেতরে আসল মানুষটাকে খুঁজে বেড়াই, খুঁজে পাই না বলে কষ্ট পাই, মাঝে মাঝে হঠাৎ দ্যাখা পেলে খুশী হই, তারপরই আবার লুকিয়ে পড়ে আমাদের দুঃখের ভেতরে ঠেলে দেয়। কথাটা শুনেছি, গুরুত্ব দিই নি। সংসারের জোয়াল টানতে টানতে এই লুকোচুরি খেলার সময় কোথায়?

মণিশংকরও ভাবছিল। বলল, বাবা বোধহয় এরকম বলেছিলেন আবছা মনে পড়ছে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ইতিহাস আছে। জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যে পৃথিবীটা গড়ে তুলি তা অন্য ইতিহাস, বাধ্য হয়েই তা গড়ে তুলি, কিন্তু নিজস্ব ইতিহাসটা জানতে হবে সবার আগে। কথাটার তাৎপর্য আজো স্পষ্ট হয় নি, দিনরাত যে সব ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছি, তা অন্যদের ইতিহাস, দূর থেকে দেখি, নিজেকে সেখানে সামিল করতে চেষ্টা করেও পারি না। নিজের ইতিহাস কিভাবে গড়তে হবে, তার কোনো হদিশ নেই আমার কাছে।

শিবশংকর এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। বলল, বাবা কত কথা বলতেন, আমার কিছু মনে নেই। তবে প্রায়ই বলতেন, কোনো কাজ কর না তুমি, খালি পড়ে পড়ে ঘুমোও। বিয়ে দিলাম তোমার, এবার জাগো, স্ত্রী সন্তান নিয়ে পৃথিবীতে জেগে ওঠো। বাবা কেন যে বিয়ে দিলেন, বেশ ছিলাম। জাগতে একদম ইচ্ছে করে না, যেটুকু, তা-ও বাধ্য হয়ে। বাবা বলেছিলেন, তোমার ভেতরটা জাগলে বুঝতে পারবে, ঘুমটাকেও ঠিকমত নির্মাণ করতে হয়। বলুন তো, এসব কথার কোনো মানে হয়? ঘুমিয়ে পড়ব, ঘুমোলে শান্তি, ব্যস, তার আবার নির্মাণ কি?

অনেকক্ষণ ওরা তিনজনই গভীর আত্মমগ্ন, তাদের আবিষ্কার-করা কথাগুলির ভেতরে তাৎপর্য অনুসন্ধান করছিল, একসময় জিজ্ঞাসু হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাতে গিয়ে অবাক,—ভদ্রলোক নেই, চেয়ার শূন্য। কল্যাণী, অর্পিতা ও ষোড়শী সেই চেয়ার ঘিরে দাঁড়িয়ে, বলল, উনি চলে গেছেন।

গৌরীশংকর অবাক, আমাদের কিছু না বলে! মণিশংকর বিভ্রান্ত, আমার তো কিছু প্রশ্ন করার ছিল। উনি এলেন আবার না বলে চলে গেলেন। শিবশংকর যেন স্বস্তিতে, যাক বাবা, বাঁচা গেছে। ঘুমের অনেকটাই ব্যাঘাত হল, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। গেছে, ভালই হল, কিন্তু এভাবে ঘুম ভাঙানোর অর্থটা কী? এটা জানার দরকার ছিল। ওরা তিনজনই বিরক্ত হয়ে,—তোমরা দেখলে চলে গেলেন, আমাদের বললে না?

কল্যাণী বলল, উনি দেখলেন, তোমরা খুব ভাবছ। বললেন, এটাই চেয়েছিলাম, এবার ওরা নিজের কাজ নিজেরাই করবে।

অর্পিতা বলল, চা খেতে বললাম, রাজি হলেন না, যদি তোমাদের ভাবনার ব্যাঘাত হয়।

ষোড়শী হেসে বলল, তোমাকে দেখিয়ে খুব মজা করলেন। বললেন, দেখি এবার বাছাধনের ঘুমের বহর।

গৌরীশংকর মণিশংকর শিবশংকর যে যার নিজ-অবস্থানে থেকে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অনেকক্ষণ। সেখানে কিছুই খুঁজে না পেয়ে যে যার নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। —মুখগুলি যেন অলৌকিক, ওরা কি প্রতিফলক হয়ে গেছে!

# মৃত্যুর দেয়াল

অমর, অমৃত, অমিতাভ ও অক্ষয় একদা এই পৃথিবীর ভেতরেই বসবাস করত। এখনো বসবাস করছে সুব্রত, সুবীর ও সুজয়। যখন এই সাতজন পারস্পরিক ছিল, কখনো হয়তো সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এরপর আবার সংহত হয়ে ফিরে গেছে পুরনো বৃত্তে। মাঝখানে মৃত্যুর দেয়াল এসে চারজনকে সরিয়ে নিয়ে গেল ওপারে, এখন তিনজন দেয়ালের এপারে, ওদের বৃত্ত ছোট তবু পারস্পরিক, সংহত।

অমর জোরে জোরে হাসত। সামান্য কথাতেই ওর হাসি, তারপর সেই হাসি অন্যমাত্রায় ছড়িয়ে, সবকিছু ছাপিয়ে যেত, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা যেমন, 'তুই যা বলেছিস, দারুণ', অথবা 'এমন হয় নাকি, যাঃ', হাসি তখন আরো উপছে পড়ত। অন্যে হাসবে এমন কথা ও বলত না, কিন্তু অন্যের যে কোনো কথায় হেসে উঠতে পারত। একদিন সব হাসি থামিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। খবর পেয়ে বাকি সবাই পৌঁছে, কেউ কোনো কথা বলল না, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, ওকে হাসাবার মত কথা তখন খুঁজে পায়নি ওরা। বাড়ির সবাই সেদিন ঘুম থেকে উঠে, ওর জন্য চা এল, কোনো আগ্রহ নেই, নড়ল না চড়ল না, হাসি মুখ নিয়ে আর জেগে উঠল না। অনেক ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কি, ডাক্তার এসেও ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে পারল না। সমস্ত হাসি নিজের ভেতরে জমা করে, মৃত্যুর দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে।—দেয়ালটা এত স্বচ্ছ, মগ্ন বিস্ময়ে একথাই শুধু ভাবছিল সবাই। অমরের শ্রাদ্ধ বাসরে গান গেয়েছিল অমৃত, 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই।' সবার মনই তখন আর্দ্র হয়ে শান্ত, গম্ভীর পরিবেশ।

ওদের আসর যেদিন একঘেয়ে পুনরাবর্তনে, অমৃত সহসাই গান গেয়ে উঠত। যে কোনো গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের অথবা শ্যামাসঙ্গীত। অমৃত-র ভরাট গলা, গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে ডান হাত তুলে, সেই হাত তোলায় সবাই নড়ে চড়ে বসত। আড্ডায় বসে সাধারণত কথা বলত না, শুধু শুনত, ওকে কিছু বলতে বললে, আজকাল শোনার লোক এত কম, আমি সেই শ্রোতার দলে। যা বলার গান গেয়ে বলব, বলেই গান ধরত। একদিন সেই গানও থেমে গেল, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, সবাই ওকে নিয়ে নার্সিং-হোমে, খবর পেয়ে অমিতাভ-রা ছুটে গেছে। আই.সি. ইউ-তে সমস্ত শরীর-নাক-মুখ-হাত অন্যভাবে সজ্জিত, যেন অন্য এক গান বেজে উঠেছে সেই শরীরে, তা-ও থেমে গেল একসময়। ওর পুরনো শরীর ফিরে এসেছে আবার, কত সহজেই মৃত্যুর দেয়াল ভেদ করে যাওয়া যায়, ভাবল সবাই। শ্রাদ্ধের দিন সুব্রত বলেছিল, অমৃত কথা বলত কম, ওর সুর ছিল, সেই পৃথিবীর ভেতরেই চলে গেছে, যেখানে কথারা সুর হয়ে ভাসে। ওর মৃত্যু নেই, ও অমর, আগে ওকে চিনতে পারি নি, এখন আর ভুল হবে না।

অমিতাভ প্রতিদিনই নতুন খবর নিয়ে আড্ডায় আসত। সেই খবরের সূত্র ধরে

সবাই মিলে বিচিত্র সব গল্প। গল্পগুলি কোথায় কোথায় যে ঠিকানা খুঁজে নিত, কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অবশেষে যখন বাঁধনহারা, অমিতাভ হেসে বলত, খবরটা ওর বানানো। তাতে অবশ্য কিছুই এসে যেত না, গল্পগুলি গড়ে উঠেছে, এর সূত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? বাধ্য হয়ে খবরের সত্যতা নিয়ে ভাবত না কেউ, গল্পগুলি আরো পল্লবিত করার কাজে অমিতাভ লেগে যেত। সেই অমিতাভ নিজেই একদিন খবর হয়ে গেল। নানা সূত্রে বিচিত্র সব গল্প তৈরি হয়েছে। কারা যেন বলল, বালিগঞ্জে বিজন সেতুতে ওঠার মুখে একটা স্কুটার-ট্যাক্সি অমিতাভকে ধাক্কা মারে, ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথার পেছনটায় এমনভাবে লেগেছে, হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মারা গেল। কেউ খবর দিল, স্কুটার-ট্যাক্সিতেই ছিল, একটা প্রাইভেট গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে জোরে বেরোবার মুখে লরী পিষে দিয়ে যায়, অমিতাভ ডানদিকে বসে ছিল। এমনও কেউ বলল, চলতি একটা বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়, পাশ দিয়ে স্কুটার-ট্যাক্সিটা সামলাতে না পেরে জোরে ওর মাথায় আঘাত করে।—খবর পেয়ে সবাই যখন হাসপাতালে, তার আগেই ওর শরীর পোষ্ট-মর্টেমে চলে গেছে। কেউ ঠিক ঘটনা জানে না, স্কুটার-ট্যাক্সির বেপরোয়া চলাচল নিয়ে শুধু আলোচনা করছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন ফিরেছে অমিতাভ, এমনভাবে মাথা-মুখ ঢাকা, চিনতেই পারা গেল না। একটা বিদ্রোহীভাব সমস্ত শরীরে, মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর কোনো ঘটনা এইসব গল্পের সূত্র হতে পারে না, জীবনের গল্পই বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার উপায় নেই এখন। সুজয় স্কুলজীবন থেকে ওর সহপাঠী, শ্রাদ্ধের দিন স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে শুধু অমিতাভ-র গল্প, তার জীবনের স্রোত, যেখানে মৃত্যুর কোনো ভাবনাচিন্তা ছিল না। অথচ এখন ওর মৃত্যুকে ঘিরে এত আয়োজন, এই জমায়েত, অলক্ষ্যে থেকে অপছন্দ করছে অমিতাভ। মৃত্যুর এই দেয়াল কোনোদিন স্বীকার করে নি সে।

বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অক্ষয়ের দার্শনিক মানসিকতা ছিল। প্রায়ই মৃত্যুর কথা টেনে আনত। মৃত্যু যে জীবনের উৎসভূমি, বারবার একথাই প্রচার করেছে। কথা বলত কম, যখন বলত, বেশ তীব্র। হাসত না একদমই, যখন হাসত, ঠোঁটের কোণে এমন লেগে থাকত, তারও উৎসভূমি মৃত্যু, সবাই টের পেত। অমিতাভ-র সঙ্গে তর্ক হত তার, জোরগলায় বলত, অমিতাভ-র জীবনবোধ ফাঁপা, যেহেতু মৃত্যুবোধে পরিশীলিত নয়। অমিতাভ মারা যাবার দিনকয় আগেই অক্ষয়ের নাকমুখ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে রক্তক্ষরণ হয়। ওকে দেখতে হাসপাতালে সবাই গিয়েছিল, অমিতাভ-ও। ফুসফুসে ক্যানসার, শেষ পর্যায়ে, যে কদিন বাঁচে বাঁচবে, নিশ্চয়তা নেই, ডাক্তারের কাছে একথা শুনে অমিতাভ-র মুখচোখ গম্ভীর হয়ে গেল। অক্ষয়ের হাতদুটো ধরে গভীর প্রত্যয়ে বলতে চেষ্টা করেছিল, কোনো ভয় নেই, খুব শিগগির ভালো হয়ে উঠবি। অক্ষয়ের ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটা লেগে ছিল। ভয় কিসের, তফাত শুধু এই, তোরা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিস, আমি যুদ্ধে নেমে পড়েছি। সবাই চুপ করে গিয়েছিল, অমিতাভ-ও। অমিতাভ মারা যাবার পাঁচদিন পরে অক্ষয় মারা যায়। ওর ঠোঁটে সেই হাসিটা তখনো, কারণ মৃত্যুর দেয়াল আগেই চিনতে পেরেছিল। শ্রাদ্ধের দিন অমিতাভ ও অক্ষয়ের জীবন-দর্শনের পার্থক্য নিয়ে সুবীর অনেক আলোচনা করল। মৃত্যুকে সহজভাবেই নিতে পেরেছে অক্ষয়, এটা ওর কাছে একটা ঘটনা মাত্র। মৃত্যুর দেয়াল প্রায় একই সঙ্গে পার হয়েছে অমিতাভ ও অক্ষয়, এখন ওরা পারস্পরিক কিনা অথবা পুরনো তর্কই চলছে, এইসব কথাবার্তা উপস্থিত সকলের মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল।

এইসব ঘটনার আগে ওরা সাতজন নিয়মিত যোগাযোগের ভেতরে ছিল, নিয়ম করে প্রত্যেকের বাড়িতে একবার করে আড্ডায় বসত, বৃত্তের মত। এখনো ওরা তিনজন তেমনভাবেই আড্ডায় বসে, বৃত্ত শুধু ছোট হয়েছে। দেয়ালের ওপারে যারা, কেমনভাবে কোথায় এখন, এসবের যদিও হদিস নেই, তবু ওদের আড্ডায় এই তিনজনের পাশাপাশি বা মাঝামাঝি বাকি চারজন হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়ে। সেই অস্তিত্বের হয়ত বিবর্তন ঘটছে না কিন্তু প্রায়শ নতুনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে তিনজনের সৃষ্টিকর্মে পরিণত হয়। এই চারজনের মৃত্যু, দেয়ালের ওপারে ওদের অলৌকিক অবস্থান, বাকি তিনজন দেয়ালের এপারে, এখনো পার্থিব মোড়কে থেকে মৃত্যুর দেয়াল সম্পর্কে আশ্চর্য বোধে ওরা প্রাণিত, কেননা এই অদৃশ্য দেয়াল, তার প্রাতিস্বিকতা ছুঁতে না পারলেও, একদিন ওপারে পৌঁছে ওদের অলৌকিক অবস্থান ঠিকঠাক বুঝে নেবে, নিজেদের এইরকম আশ্বাসে প্রেরিত করে।

সুব্রত-র বাড়িতে আড্ডা বসেছে। সুব্রত-র স্ত্রী ওদের সামনে চায়ের ট্রে-নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে দিল। পুরুষকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে! সুব্রত-র স্ত্রী-র এইরকম আচরণে কোনো একটা সূত্র কাজ করছে, তিনজনেই মনে মনে নিঃসংশয়। এই গানগুলি অমৃত বিশেষভাবে পছন্দ করত, অধিকাংশ দিন গাইত। অমৃত যখন গান করত, বন্ধুরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে অভিনন্দন জানালেও প্রকৃতই উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ত বন্ধুর স্ত্রী-রা, কেউ কেউ গলা মিলিয়ে ওর সঙ্গে গাইতেও শুরু করে দিত, অমৃত তাতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে, ওর মুখে দিব্য হাসি, শরীরের অপ্রাকৃত দোলায়মানতা, সব মিলিয়ে ঘরের ভেতরে যেন অন্য ঘটনা, অন্য দৃশ্যের জন্ম হত। অমৃত সশরীরে এখানে নেই, তবু প্রবলভাবেই উপস্থিত এখন, সবার স্মৃতির ভেতর থেকে রশ্মিগুলি ছেদবিন্দুতে এসে যেন সেই পুরনো দৃশ্যগুলির, ঘটনাগুলির নতুন করে জন্ম হচ্ছে। অলৌকিক রং লেগে থাকায় তা একই সঙ্গে অনির্বচনীয়।

অনেকক্ষণ এইভাবে মগ্ন থেকে, গান শেষ হয়ে যাবার পর সম্মোহ থেকে ফিরে এসে সুবীর বলল, আসলে মৃত্যু কিছুই ছিনিয়ে নিতে পারে না। অমৃতকে ঠিকঠাকই উদ্ধার করলাম আমরা। কী নিতে পেরেছে মৃত্যু?—ওর স্থূলশরীর, স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি। সে তো নিমিত্ত মাত্র, একজন প্রকৃতই বেঁচে থাকে সূক্ষ্মশরীর আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে। ওদের ছিনিয়ে নেবে, মৃত্যুর হাত এত লম্বা নয়।

সুব্রত বলল, একইসঙ্গে অমরকেও পেয়ে গেলাম আমরা। ওরা দুজন একপাড়ায় পাশাপাশি থাকত, আড্ডাতেও আসত একই সঙ্গে। হঠাৎ হঠাৎ হাসিতে আজ চমকে উঠিনি বটে, কিন্তু হাসিটা স্পষ্ট দেখেছি কখনো ঝরণার মত, কখনো উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-য়ের মত। অমৃত গান সুরু করলে ওর হাসি থামত। আজ ক্যাসেটে গান হচ্ছে, অমরের হাসি থেমে যাওয়ার ছবি স্পষ্ট ভাসছে, একটু অন্যরকম, বিরক্ত করছে না।

সুজয় বলল, গানগুলি শুনে বার বার মনে হচ্ছে, অমৃত এর থেকে অনেক ভাল গাইত। ওকে কতবার বলেছি ক্যাসেট করতে, করল না, ঐতো অমরের হাসি শোনা যাচ্ছে, অমৃতকে উসকে দিতে বলছে, কত মেয়ে ওর গান শুনে—। একটি মেয়ে তো ক্যাসেট করার জন্যে টাকা দিতে রাজি। অমৃতের সুন্দর মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবাই।

সুবীর গম্ভীর হয়ে বলল, মৃত্যু কিছুই নিতে পারে না, বরং কিছুটা দেয়। অমর বা অমৃতকে

একইরকম পেয়ে যাচ্ছি, অতিরিক্ত যা পাচ্ছি সামান্য দুঃখবোধ, ওদের স্থূলশরীর বা স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকার কারণে। এই দুঃখবোধ দিয়েই ওদের আরো সুন্দর আরো অলৌকিক করে গড়ে তুলছি আমরা।

সুজয়ের বাড়িতে যেদিন আড্ডা বসল, অমিতাভ-র কথাই বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। স্কুলে যখন পড়ত, প্রায়ই অমিতাভ নতুন নতুন গল্প হাজির করত। এমনভাবে বলত, বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। বাবা কাকা মাসী পিসীদের নিয়ে গল্প, তাঁদের অদ্ভুত সব ঘটনা। সবাই যখন বেশ মজে গিয়েছে তখনই গল্পটা ভেঙে দিয়ে বলত, এসব বানানো, অথচ প্রতিবারই সবাইকে নতুন করে বিশ্বাস করতে হত। কলেজে পড়ার সময় সেই অদ্ভুত গল্পগুলিই নিজেকে নিয়ে নতুন করে তৈরী করত, নানা রোমহর্ষক সব ঘটনা। সুজয় স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে, অমিতাভ মনে মনে জীবনটাকে পাল্টে পাল্টে দেখত, যা নয়, তাই হতে চাইত, কিন্তু পারেনি। সাধারণ জীবন ওর পছন্দের ছিল না।

সুজয়ের স্ত্রী চা দিতে এসে কথাগুলি শুনল। —অমিতাভদাকে দেখে আমার তো তেমন মনে হত না। বেশ মজার মানুষ ছিলেন তিনি। এখন ওইসব ব্যর্থতার কথা কেন আলোচনা করছি আমরা!

সুবীর বলল, ঠিকই বলেছ। আসলে আমরা সকলেই অন্য এক উত্তরণ চাই। এই চেনাজানা পৃথিবীর ভেতরে অন্য এক পৃথিবী গড়ে সেখানে বাস করতে চাই। স্থূলশরীর আর স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তা হতে দেয় না! এই দুঃখবোধে আমরা সবাই জর্জরিত, হয়ত ওর মৃত্যু এর থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে, দেয়ালের ওপারে গিয়ে আরো স্বচ্ছন্দে গড়ে নিচ্ছে ওর নিজস্ব পৃথিবী।

সুব্রত বলল, এসব নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায়? মৃত্যুর ওপারে গিয়ে. যদি তেমন কোনো জগৎ থাকে, শুধুই কি কল্পনার জগৎ?

সুব্রত-র কথা সুজয় অস্বীকার করল না।— নিশ্চিত করে অবশ্যই কিছু বলা যায় না, তবু অমিতাভ যে-সমস্ত জগৎ মনে মনে সৃষ্টি করত, এই স্থূলজীবন অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছে যাওয়া আশ্চর্যের নয়, কেননা এখন কোনো বাধা নেই, অতএব কল্পনার প্রসারণ যথেষ্টই হতে পারে। আমি তো বিশ্বাস করতে চাই, এই কল্পনার জগৎগুলিই আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঠিক এইসময় অমর হেসে উঠত। তারপর হাসি থামিয়ে বলত, ওপারে কী আছে কেউ জানে না, ভেবে কি লাভ? অমিতাভ কিন্তু দারুণ জমিয়ে দিতে পারে। চালিয়ে যা।—অমরের এইরকম উপস্থিতি যেন সবার চোখের সামনে স্পষ্টচিত্রে ভেসে উঠেছে।

সুবীরের বাড়িতে খুব বেশী করে অক্ষয়ের প্রসঙ্গ এসেছে।—মৃত্যুর দেয়াল ও চিনত, জীবনের নানা পরম্পরার ভেতরে থেকেও দেয়ালের ওপারে অবলীলায় পৌঁছে যেতে পারত, তখনই ঠোটে ওর রহস্যময় হাসি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়, সুবীরের স্ত্রী চায়ের ট্রে সেন্টার-টেবিলে রেখে একটা চেয়ার টেনে বসল। সুবীরের কথা শুনে বলল, যাই বল, উনি অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। সবসময় কি এক ভাবনা নিয়ে, নিজের মনে মনেই যেন কথা বলতেন। সাধারণ বিষয় ওকে ছুঁতে পারত না।

সুবীর বলল, আমরা ওকে সত্যিই বুঝতে পারি নি, এখন সেইসব রহস্য প্রকাশ হচ্ছে। অমিতাভ-র যেমন সবটাই কল্পনা, অক্ষয় কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে পেত। এই জীবনের যুদ্ধ ক্ষেত্র ওকে তাই বিমর্ষ করে নি, যুদ্ধ শেষে স্বভূমিতে ফিরবে, এটা ওর জানাই ছিল।

সুজয় বলল, আমারও তাই মনে হয়। অমিতাভ যুদ্ধ ক্ষেত্র চিনতে পারে নি, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে, যুদ্ধে নামতেই পারল না। মৃত্যুর দেয়াল অক্ষয় যেমন খুব সহজে পেরিয়েছে, অমিতাভ কি তেমনি সহজে পারল?

সুব্রত বলল, এসব নেহাৎই অনুমান। জীবনের ভেতরে থেকে মৃত্যু সম্পর্কে ঠিকমত ধারণা করা যায় না। আমরাও কি পেরেছি? অক্ষয়ের ধারণাও নেহাৎই অনুমান।

এইসময় অমরের হেসে ওঠার কথা। বলত, অক্ষয়ের কথা বাদ দে। ওপারে গিয়েও হয়ত আরো ওপারের কথাই ভাবছে, কিংবা এপারের কথা। আমি ওপারে গেলে অমিতাভকেই খুঁজে নেব।

সুবীর হেসে বলল, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তবু মানতে হবে, জীবনের গভীরে গভীর অন্বেষণে গেলে তবেই মৃত্যুর কিছুটা হদিস পেলেও পাওয়া যেতে পারে। জীবনের উৎসভূমি মৃত্যু, একথা অক্ষয় বুঝতে পেরেছিল, অমিতাভ বুঝতে পারে নি। তাই মৃত্যু তাড়া করেছে অমিতাভকে, অক্ষয় মৃত্যুকে বরণ করেছে। আমাদের কাছেও ইঙ্গিত রেখেছে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামার কথাই বলেছে।

এইভাবে মৃত্যুর দেয়াল যারা এখনো পেরোয় নি, সেই তিনজনের জীবনে, যারা পেরিয়ে গেছে সেই চারজন আজও ওতপ্রোত, তাদের নানা ভঙ্গি, ভাবনাসমেত। এরই মধ্যে একদিন সুব্রত-র বাড়িতে সুবীর এসেছে। বেশ কিছুদিন বাদে এল, তবু আড্ডার মেজাজে নেই। ওর মুখে-চোখে উদ্বেল ভাব, হাসি একটু ঘোলাটে।

বোস, চা করতে বলি। সুব্রত বলল।

নারে, তাড়া আছে, অনেক কাজ, চটপট গোছাতে হবে, সময় নেই একদম।

সুব্রত অবাক হয়ে বলল, ব্যাপারটা কি? কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিস? নাকি নতুন কোনো এ্যাসাইনমেন্ট!

ঠিকই ধরেছিস। আমিও ভাবি নি, এত তাড়াতাড়ি অফারটা পেয়ে যাব। ব্যস্ত ছিলাম বলেই তোর সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারি নি।

কোথায় যাচ্ছিস?

*স্টেট্‌স-এ। দিন সাতেক আগে একটা সফ্‌টওয়্যার কোম্পানীতে ইন্টারভিয়ু দিয়েছিলাম।* পাশপোর্ট করা আছে ওরা জানত, তাই বোধ হয় অফারটা তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছি। দেশে চাকরি করব ভেবে ইন্টারভিয়ু দিলাম, এক্ষুনি বিদেশ যেতে হবে শুনে একটু দ্বিধাও ছিল। পরে ভেবে দেখলাম, 'বীট এ্যারাউণ্ড দি বুশ' করে লাভ নেই, সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়াই ভাল। দ্যাখা যাক। টিকিট, ভিসা এসব প্রায় মিটিয়ে এনেছি। দিন সাতেকের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

সুব্রত গম্ভীর।

সুবীর বলল, কী ভাবছিস? তোর কি মনে হচ্ছে ঠিক করিনি?

ব্যাপারটা ঠিক-বেঠিকের নয়। তুই তো বললি যুদ্ধে নেমে পড়ছিস, এর ভেতরে অন্য কথা আসে না। আমি ভাবছি অন্য কিছু,— আড্ডা ভেঙে গেল।

কেন? সুজয় তো আছে।

দুজনে কি বৃত্ত হয়? দুটো বিন্দুতে বড়জোর সরলরেখা, ওয়ান টু ওয়ান। বৃত্তের জন্যে একটা কল্পিত মধ্যবিন্দু দরকার।

ঠিক এইসময় সুজয় এসে পড়ল। আরে সুবীর যে! কী সব শুনলাম, তুই স্টেট্‌সে যাচ্ছিস?

সুবীর হাসল। সে কথাই হচ্ছিল, দিন সাতেকের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

আমারও একটা অফার আছে, বাঙ্গালোরে পোস্টিং। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, জয়েন করব। পশ্চি মবঙ্গে বসে রগড়ানোর মানে হয় না। একমাসের নোটিস দিয়ে দিয়েছি।

সুব্রত হাসল, তবে তো বিন্দুতে এসে দাঁড়াল।

সুজয় বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছে। সুবীর বলল, আমাদের আড্ডার যে দশা হল, সে কথা বলছে।

সুবীর ও সুজয়ের তাড়া ছিল, তবু ভেবে দেখল, সত্যিই একটা আড্ডার বিষয় তৈরী হয়েছে। সেটা বুঝে তিনজন তিনটে চেয়ারে মুখোমুখি বসল।

সুব্রতই শুরু করেছে, অবশেষে আমাদের প্রত্যেকের সামনেই একটা করে দেয়াল তৈরী হল।

সুজয়ের কথায় কৈফিয়তের সুর, এভাবে দেখছিস কেন? আমি অন্তত ভারতবর্ষে আছি, যে কোনো সময় আমাদের দ্যাখা হতে পারে।

সুবীরও যোগ দিল, এখন আমরা গ্লোবাল ভিলেজে বাস করি, দূরত্ব অনেক কমে এসেছে।

সুব্রত ম্লান হাসল। তা না হয় হল, কিন্তু স্বচ্ছ মুখোমুখি তো হতে পারব না, চিঠিতে বা টেলিফোনে হয়ত অর্দ্ধস্বচ্ছ যোগাযোগ হবে। তার মানে এক ধরনের দেয়াল অবশ্যই। আচ্ছা সুজয়, বাঙ্গালোর যেতে কত সময় লাগে?

প্রায় দেড়দিন।

সে তো ট্রেনে। খুব তাড়াতাড়ি যেতে হলে অর্থাৎ প্লেনে?

দু'ঘণ্টার মত।

অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি হলেও দুঘণ্টার দূরত্ব। তার মানে, তোর আমার মাঝের দেয়াল পেরোতে দু'ঘণ্টা সময়। স্টেট্‌সে কোথায় যাচ্ছিস সুবীর?

ক্যালিফোর্নিয়া।

জার্নি টাইম কত?

প্রায় একদিন লাগবে।

অর্থাৎ তোর আর আমার মাঝে দেয়াল অন্তত একদিনের দূরত্ব তৈরী করবে।

সুজয় ও সুবীর দুজনেই স্বীকার করল, এটা ঘটনা।

সুব্রত-র হাসি এখন রহস্যময়। আচ্ছা বলতো, আমাদের বন্ধুরা যারা মৃত্যুর দেয়াল পেরিয়ে গেছে, কত সময় লেগেছিল ওদের?

এবার অন্য দু'জন বেশ বিভ্রান্ত।

সুবীর কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, বলতে পারিস প্রায় মুহূর্তের মধ্যে। তুই কী বোঝাতে চাইছিস?

বোঝাতে নয়, বুঝতে চাইছি। অথচ দ্যাখ সেই দেয়াল একেবারেই অস্বচ্ছ। ঘটনা এই, ওরা অনন্ত সময় বা শূন্য সময়ের ভেতরে চলে গেছে, অন্তত আমাদের থেকে অন্য এক সময়-মাত্রায়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা তিনজন যদিও একই জাগতিক মাত্রায় থাকব তবু প্রকৃত অর্থে সময়ের নিরিখ আমাদের এক থাকছে না। অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্নতার ভেতরে চলে যাচ্ছি।

সুজয় বলল, তুই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিস। এভাবে ভাবলে আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা সময়-নিরিখ, এমনকি পাশাপাশি থাকলেও।

আমিও এই মৌলিক সূত্রটাই ধরতে চাইছি। আবেগ থেকে নয়, অনুভূতি থেকেই বলছি, পুরনো অবস্থানে থেকে একমাত্র আমিই আমাদের পারস্পরিকতার মৌলিক সময়নিরিখে নিজেকে স্থাপন করেছি। আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। যেভাবে এতদিন আমরা তিনজন অমর, অমৃত, অমিতাভ ও অক্ষয়কে নিজেদের সময় দিয়ে সৃষ্টি করছিলাম, সাজাচ্ছিলাম, এবার সে কাজ আমাকে একাই করতে হবে, এর সঙ্গে যুক্ত হল, তোদেরও সৃষ্টি করা। অবশ্য কিছু কিছু অর্দ্ধস্বচ্ছ সূত্র পেয়ে যাব, তবে সৃষ্টিতে আমার একারই স্বাধীনতা, এবার থেকে একমাত্র আমিই ঈশ্বর। এই নির্জন পৃথিবীতে একাকী ঈশ্বরের ভূমিকা যে কী দুঃসহ, আমি তা অনুভব করছি।

সুবীর বা সুজয়ের কিছু বলার ছিল না। অবাক বিস্ময়ে সুব্রতকে দেখছে। আশ্চর্য এক রহস্যময় ধূসরতায় ওরা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

# শতাব্দী-মঞ্চ ও বিতংসের দ্বার

আজ ঘুম থেকে উঠে সবকিছু অন্যরকম। সকালের রোদে অন্য আলো। একশ বছর পার করে, যেন এরই প্রতীক্ষায় এতদিন, সামনের দিকে খাঁচার দরজাটা খোলা। উন্মুখ থেকে উন্মুক্তি—যে কোনো দিকেই উড়ে যেতে পারে, যেমন খুশী। একশটা বছর কম সময় নয়, এত সময় ধরে বুনতে বুনতে খাঁচাটা বেশ মজবুত। কত ঘটনার বিচিত্র বিন্যাসে, কত চরিত্রের যাওয়া-আসায়, অসংখ্য গ্রন্থির সমাবেশে এর গঠনশৈলী চমৎকার স্থাপত্যে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলা থাকলেই কি যাওয়া যায়! উন্মুখ কি এতটাই নির্মোহ যে উন্মুক্তির পথে চলে যাবে?

বারান্দা সামনে রেখে ঘরের ভেতরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া প্যারীমোহন। তাঁর পেছনে একশ বছরের অতীত-স্মৃতি, সামনে খাঁচার দরজাটা খোলা। যতদিন উন্মুখ ছিল, টান-টান ঋজু শরীর, এখনো দুরন্ত মন, আজ সকালে এই সবল গ্রন্থির মুখোমুখি হয়ে এরা কি দুর্বল হয়ে পড়ছে! বিশ শতকের গোড়া থেকে যাত্রা শুরু, এই একুশ শতকের গোড়ায় পৌঁছে মনে হচ্ছে নাকি যে এবার থেমে যাওয়া ভাল? অথবা গতি মন্থর করে আরো কিছুটা এগোবেন তিনি। অনন্ত সময়ের ভেতরে এই অসংখ্য গ্রন্থির কী তাৎপর্য! গ্রন্থি মুছে দিয়ে সেই পাল্লার ভেতরে চলে গেলে, তবে তো অনন্তকাল ভেসে থাকা যায়! তাই যাবেন নাকি?

*ভাবছেন প্যারীমোহন। ভাবনার ভেতরে ননীবালা এসে পড়লেন। এখনো বসে আছ!* ওরা সব এসে পড়বে, নানারকম অনুষ্ঠান নাকি করবে। তুমি তৈরী হয়ে নাও, পরে সময় পাবে না।

ননীবালা চলে গেলেন। এই ননীবালা পৃথিবীর সময়ের ভেতরে দশ বছর পরে এসেছেন, তারও পনের বছর পর প্যারীমোহনের খাঁচায়।

কী বলে গেল ননীবালা! কারা সব আসবে? কিসের অনুষ্ঠান! তৈরী হতে বলল। তৈরী তো হয়েই আছে এই একশ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে। ননীবালা ছাড়া এই খাঁচার ভেতরে আরো অনেকে আছে নাকি! সাজানো আছে সময়ের পরতে পরতে? সমুদ্রের মত জনরাশি ঢেউ তুলে তুলে একশ বছরের আকাশ জুড়ে কোন বন্দনাগান গাইবে ওরা? অতীত স্মৃতি-মন্থনে ঝড় ওঠে যদি, জীর্ণ খাঁচা সেই ভার সহ্য করতে পারবে তো! এই ভয় তাঁর শিরা-স্নায়ুতে প্রবেশ করে অস্থির করে তুলছে। বেশ তো ছিল, খাঁচাটা খোলা আছে সামনে, তারপর অন্য আকাশ, নতুন কিছু। কি লাভ এই স্মৃতি রোমন্থনে? ননীবালা কেন যে এসব করতে চলেছে।

ননীবালা আবার এসে পড়লেন। কই ওঠো, বাথরুমে গরম জল দেয়া হয়েছে। স্নান সেরে নাও। জোর করে প্যারীমোহনকে তুলে বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে, সামনে সমুদ্র না হলেও নদীস্রোত। একে একে অনেকে এসে প্রণাম করে যাচ্ছে, স্ত্রী পুরুষ বাচ্চারা। চোখে আজকাল ভাল দেখতে পান না। সমবেত ধ্বনি উঠছে, হ্যাপী সেন্টিনারী, হ্যাপী সেন্টিনারী। ওর কিছু বলার নেই, শুধু শুনে যাচ্ছেন, শুধুই ধ্বনি। ননীবালা হাত নেড়ে নেড়ে, এই যে প্রতিভা, ওর বর প্রদীপ। ওদের ছেলেমেয়ে শোভন,

টিংকু, লতিকা। শোভনের পাশে ওর বৌ..., টিংকুর পাশে..., আর ও হল লতিকার বর....। এই যে দুষ্টু সোনা, এদিকে এস, প্রণাম কর, তোমার দিদার বাবা। কমলারাও এসে গেছে, ভাল করে কমলাকে দ্যাখ, চিনতে পারছ? কেমন বুড়ি হয়ে গেছে, ওর বর সমীর তোমায় প্রণাম করছে, আশীর্বাদ কর। এদিকে এস তোমরা, ওরা কমলার ছেলে কমল, কমলের বৌ..., মেয়ে অতসী, অতসীর বর....। ওর নাম আমরা পাল্টে দিয়েছিলাম, প্রতিভার বড় ছেলের নামের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ছে? ও আমাদের বিভাস।

প্যারীমোহন কিছু শুনছেন, কিছু শুনছেন না। কিছু কিছু মনে পড়ছে। সব কথা শুনতে পান না, মাঝে মাঝে কথাগুলো হারিয়ে যায়। শুধু দেখছেন, ওর খাঁচাটা বড় হতে হতে কেমন আকাশ হয়ে যাচ্ছে।

কমলা বলল, বাবা সবে বাথরুম থেকে বেরোল, ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে দাও আগে।

ননীবালা বললেন, শোবার ঘরে খাটের ওপর ধুতি পাঞ্জাবী রাখা আছে, কমলা তুই যা, ঠিক করে পরিয়ে দে। একটু আগে বিশাখা ফোন করল, ওরা এখুনি আসছে।

প্রতিভা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বসল। তুমি এত বয়েসেও দিব্যি চলাফেরা করছ, আর আমায় দ্যাখ, বাতে কাবু, কি সব যেন অসুখের নাম। দাদা কেমন আছে মা? ছ'মাস তো হয়ে গেল, ঠিকমত কথা বলতে পারছে? ওরা কি আজ আসবে?

ননীবালার বেশ উৎসাহ। সবাই আসবে। সত্য এখন অনেক ভাল। কথা সামান্য জড়িয়ে যায়, আর সব ঠিক আছে। ছোট ছেলেটা মারা গেল, তারপরই এই স্ট্রোক। নাহলে ভালই ছিল।

প্রতিভা উদ্বিগ্ন। সব খবর সময়মত পাই না, শরীরও ভাল না। তোমার জামাই চলে যাবার পর একা হয়ে গেছি। লতিকা বাঙ্গালোরে চাকরি নিয়ে চলে গেল, চন্দনও ওখানেই চাকরি করে।

শোভন বিলেত থেকে ফিরবে না?

বিলেত না, ও তো আমেরিকায় থাকে। মাঝে মাঝে ফোন করে, ফিরবে বলে মনে হয় না। অখিলেশের কী এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল মা?

এ্যাকসিডেন্ট না, কোন জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে কি একটা ম্যালেরিয়া হল, দুদিনের মধ্যে মরে গেল। বাইরে গাড়ির শব্দ হতেই বলে উঠলেন ননীবালা, বলতে বলতে সত্য এসে পড়ল।

সত্যব্রত নয়, তৃষ্ণা আর প্রকাশকে নিয়ে সৌম্যব্রত এসেছে। ওদের দেখে প্রতিভা বলে উঠল, রাজধানীতে এলি? খুব আরাম, নারে?

মন্দ না, ধকলটা কম হয়।

তা না হয় হল, কিন্তু ছেলেটাকে একা করে রেখেছিস, বিয়ে দিচ্ছিস না কেন? রাগ করে বড়টার মত সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবে দেখিস।

সৌম্য হেসে বলল, দিদির ঐ এক কথা। তৃষ্ণাও মেয়ের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েদের এছাড়া আর কিছু ভাববার নেই। পড়াশোনা শেষ করে সবে তো চাকরিতে ঢুকল। একটু থিতু হোক।

বিয়ে করলেই থিতু হবে। কদিন বাঁচব তার ঠিক আছে? বিয়েটা দেখব না?

বড়রা ধরাধরি করে, চারপাশে ছোটরা হৈ চৈ করতে করতে দুপাশে চওড়া হাতল দেয়া ভারী ইজিচেয়ারটা হলঘরের মাঝখানে এনে রাখা হল। কমলা হাত ধরে প্যারীমোহনকে নিয়ে আসছে, সাবধানে ইজিচেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে বসে বসে দ্যাখ, কত লোক এসেছে, আরো আসছে, কত তোমার সৈন্যসামন্ত।

প্যারীমোহন হাসলেন। এতদিন কোথায় ছিল ওরা! এখন এসে এই যে পাহারায় বসল, এই একশ বছর সে অরক্ষিত ছিল নাকি? সবাইকে চেনা-চেনা লাগছে, কেউ কেউ খুব স্পষ্ট চেনা, কে যে কার ছেলে কার মেয়ে কিছুদিন আগেও ঠিকঠিক বোঝার চেষ্টা করত, এখন গোলমাল হয়ে যায়, আর চেষ্টা করে না। এই চেনা-অচেনার ভিড় অলৌকিক হয়ে, একদা ওদের ছোটবেলায় সবাই লৌকিক ছিল, তারপর কিভাবে যেন শরীরে বয়েস চাপিয়ে বড় হতে হতে প্যারীমোহনকে এই একশ বছরের সীমায় ঠেলে দিয়েছে ওরা। যেন এক অলৌকিক ঘটনা, শূন্য ঘরের ভেতরে কোন যাদুবলে জেগে উঠেছে এই কোলাহল, তার কেন্দ্রে প্যারীমোহন এক আশ্চর্য নীরবতার ভেতরে, সামনে দেখছেন খাঁচার দরজাটা খোলা—সে কি যাবে, নাকি কেউ আসবে, অথবা সেখানে ভেসে উঠবে কোনো চোখ! প্যারীমোহন জানেন না।

সত্যব্রত-র হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকছে বড় ছেলে প্রণবেশ। পেছনে পেছনে সত্যব্রত-র স্ত্রী সুমিত্রা। মেজ ছেলে মনীশ, ওদের স্ত্রীরা, নাতি নাতনী শুভ্র, স্বপ্না। অখিলেশের বিধবা স্ত্রী মনিকাও এসেছে।

সত্যব্রত বাবার পায়ের কাছে বসল। কথা বলছে না, মুখের বাঁদিকটা সামান্য বাঁকা এখনো, দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামছে। প্যারীমোহন সামান্য সোজা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে কিছু বলতে চাইলেন, অস্পষ্ট শোনা গেল—কাঁদিস না বড় খোকা। কেউ জানে না, ঈশ্বরের কী ইচ্ছা। প্রতিভা সত্যব্রত-র চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ দাদা, ওঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, আজকের দিনে কাঁদিস না। সত্যব্রতকে নিয়ে প্রতিভা অন্য ঘরে চলে গেল।

ননীবালা ওদের চিনিয়ে দিচ্ছেন, ঐ যে অখিলেশের বৌ মনিকা, চাকরি করছে এখন। এরা প্রণবেশের ছেলে শুভ্র, সতীশের মেয়ে স্বপ্না। সবাই একে একে প্রণাম করল। স্বপ্নার দিকে চোখ টিপে প্যারীমোহন বললেন, আমার মালা কই? স্বপ্না গম্ভীর মুখ করে বলল, অত ব্যস্ত কেন বাপু, সময়মত পাবে, ধৈর্য ধর। প্যারীমোহন ধৈর্য ধরে খাঁচার দরজার দিকে চেয়ে রইলেন।

বিশাখা এসে পড়তেই বাড়িতে হৈ চৈ সুরু হয়েছে। সঙ্গে প্রতাপ, ওদের ছেলে সুব্রতও কম যায় না। সবাই মিলে কথার পর কথার স্রোত। কোন কথাটা কার বোঝা যাচ্ছে না—বম্বে থেকে দিল্লী থেকে সব এসে পড়ল, আর কলকাতায় থেকে তুই—কাছের লোকই যে সবচেয়ে দূরে থাকে, এ্যাদ্দিন সংসার করেও তা বোঝনি? —সব ঐ চশমার দোষ, দূরে দ্যাখার লেন্স নিয়ে কি কাছের লোককে দ্যাখা যায়?—ঐ সুরু হল কথার ফুলঝুরি। সেই সকালের পর এখনো পর্যন্ত এক কাপ চা কারো জোটেনি। বিশাখা এসে গেছিস, চায়ের জলটা বসিয়ে দে।

প্যারীমোহন কিছু একটা বলছেন, প্রতিভা ওর মুখের কাছে এসে শুনল, তারপর ডাকল, এই বিশাখা, বাবা তোকে ডাকছে। বিশাখা তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ারের পাশে এসে বসলে প্যারীমোহন ওর মাথায় হাত রাখলেন। তুই তোর ময়নার গল্প বলেছিলি, মনে আছে?

বাবার অস্ফুট কথা বিশাখা ঠিক বুঝতে পারে। বলল, মনে আছে। কেন বাবা?

খাঁচার দরজা অনেকদিন খোলা ছিল, একদিন দেখলি, ময়না নেই।

বিশাখা বিস্মিত। হঠাৎ এই গল্পটা তোমার মনে এল!

জানিস তো, আমার খাঁচাটাও অনেকদিন খোলা।

প্যারীমোহনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বিশাখা বলল, দুষ্টুমি হচ্ছে? দাঁড়াও, দ্যাখাচ্ছি মজা। আমরা সবাই এসে পড়েছি না? খাঁচা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্যারীমোহনের মুখমণ্ডল এক অপার্থিব হাসিতে ভরে উঠেছে। বিশাখা কেমন এক ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে বাবার হাতটা ইজিচেয়ারের হাতলে রেখে উঠে পড়ল, দাঁড়াও, আগে চা করে নিয়ে আসি।

রান্নাঘর থেকেই বিশাখা শুনতে পেল, প্রিয়ব্রত এসেছে, ইন্দ্রাণী কমলেশও, সেভাবে চায়ের জল দিবি কিন্তু।

কমলা ঠাট্টা করছে, কলকাতা ছেড়ে কেন যে বর্ধমানে বাড়ি করলি ছোড়দা। মফঃস্বলীদের সঙ্গে সেইজন্যেই আমাদের মিলছে না। প্রিয়ব্রত চুপ করে আছে।

ইন্দ্রাণী একটু উষ্ণ হয়ে বলল, মা-র একদম ইচ্ছে ছিলনা, আমাকে অনেকবার বলেছে। এই দ্যাখ না, আমরা কলকাতা থেকে গিয়ে বাবাকে ধরে আনলাম। এদিকে বাবা নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। অথচ বাড়ি করার সময় মা-র কথা শুনলই না। শেষদিন পর্যন্ত মা-র মনে দুঃখ ছিল। প্রিযব্রত আরো গম্ভীর হয়ে গেছে।

প্রতিভা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, আজ আর ওসব কথা কেন? বাবাকে প্রণাম করেছিস প্রিয়?

প্রিয়ব্রত প্যারীমোহনের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখছেন প্যারীমোহন, ধীরে ধীরে অতীত স্বচ্ছ হচ্ছে—ভাল ফুটবল খেলত প্রিয়। কোথায় কোথায় খেলতে যেত, দুশ্চিন্তা হত ওর জন্য। বড়-মেজ-র মত পড়াশোনাটা হলনা, হাঁটুতে চোট পেয়ে খেলাটাও বন্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে চাকরিটা হয়ে, তবু মন্দের ভাল।

প্রিয়কে কি একটা জিজ্ঞেস করছেন প্যারিমোহন। দুতিনবার কান পেতে শোনার চেষ্টা করে বুঝল, ওর হাঁটুর কথা জিজ্ঞেস করছেন। হেসে ফেলল, তোমার এখনো মনে আছে? ঠিকই আছে বাবা। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, ও কিছু না। তুমি কেমন আছ?

হাত দুটো ওপরে তুলে মাথা নেড়ে জানালেন, ভাল আছেন।

পায়ের কাছ থেকে কখন সরে গেছে প্রিয়ব্রত, বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ খেয়াল হতে দেখলেন, তাঁর নাগালের ভেতর কেউ নেই আর। কিছুটা ভারমুক্ত যেন। স্বচ্ছন্দে শরীরটা ভাসিয়ে রেখে প্যারীমোহন দেখছেন, তাঁকে বৃত্ত করে একটা জনস্রোত কেবলই পাক খাচ্ছে। তার ভেতরে ননীবালাও, সামান্য কুঁজো হয়ে, প্রিয়ব্রত হাঁটছে কিছুটা থমকে থমকে, প্রতিভা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কমলা এর কাছে যাচ্ছে ওর কাছে যাচ্ছে, বিশাখা ছটফট করছে খুব। সৌম্যব্রত দেখতে সুন্দর ছিল, আজও, প্রসন্ন হাসিতে ওর চলাচল গম্ভীর, প্রিয়ব্রত এদের মধ্যে বেমানান যেন, তবু যোগ দিয়েছে সাধ্যমত! ঐ ছেলেটা প্রণবেশ না? বড় নাতি। বড় হয়েছে তবু চেনা যাচ্ছে। ওটা লতিকা না? বড় নাতনিটা কি সুন্দর ফুটফুটে ছিল, এখন যেন বয়েসের ছাপ

পড়েছে, তবু ওর গালের তিলটা দেখে চেনা যায়। আরো সব ছেলেমেয়েরা, নানা বয়সের, এক সময় চিনতেন ওদের, এখনো চেষ্টা করলে চেনা যায়, উৎসাহ পাচ্ছেন না, স্মৃতি উসকে দিতে ইচ্ছে করে না আর। এই চেনা-অচেনার ভিড় তবু যেন ভাল, এই ভিড়ের ভেতর একা থেকে, দর্শক হয়ে। হঠাৎ ওকে চমকে দিয়ে একটা অল্পবয়সী মেয়ে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিল। ওর হাতটা ধরে ফেলেছেন প্যারীমোহন, মেজ মেয়ের নাতি স্বপ্না না? লজ্জা পেয়েছে মেয়েটা, তবু হাত ছাড়লেন না, হাসছেন প্যারীমোহন, কিছু বলছেন না, একসময় হাত ছেড়ে দিলে পালিয়ে গেল স্বপ্না।

সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে, নানা রঙের কাগজ। তাই দিয়ে মালা তৈরী করে, ফুল দিয়ে লম্বা ঘরটা সাজানো হচ্ছে। সবাই যে যার পছন্দমত কাজ নিয়ে, প্রণবেশ, মণীশ, মাধুরী, লতিকা, প্রকাশ, ইন্দ্রাণী, অতসী, সুব্রত, মন্দিরা, এরাই এই সাজানোর প্রধান কারিগর, শুভ্র, স্বপ্না ওদের জোগান দিয়ে যাচ্ছে। এদের কাজে তত্ত্বাবধান করছে প্রতিভা, সৌম্য, সুমিত্রা, কমলা, বিশাখা। উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে উঠছে নামছে, সাজানো হচ্ছে, বদলানো হচ্ছে, স্রোত পাল্টাচ্ছে, একটা মহোৎসবে মেতে উঠেছে সবাই। ননীবালা মাঝে মাঝে ওদের মাঝখানে এসে বলছেন, একটু আস্তে কথা বল, দুষ্টুমি করে না লক্ষ্মীটি।

কে কার কথা শোনে। স্রোত যেমন চলছিল, চলতে থাকছে। প্রণবেশ বলছে, দাদান একশ বছর পেরোল, ভাবা যায়? মাধুরী বলল, এই বুড়োবয়েসেও কেমন সুন্দর দেখতে। মণীশ বলে উঠল, দিদাই-এর একশ বছরও এভাবেই পালন করব আমরা, কি বল সবাই? সবাই সমস্বরে সায় দিয়ে উঠলে ননীবালা দু'হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন, চুপ চুপ, তার অনেক দেরী, মেয়েমানুষ এতদিন বাঁচে নাকি?

লতিকা বলল, মেয়েমানুষ ফ্যালনা বুঝি? তোমাকে বাঁচতেই হবে। ইন্দ্রাণী, অতসী, মন্দিরা একযোগে, আমাদের দিদাই জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। প্রকাশ, সুব্রত হাসতে হাসতে বলল, আরো জমজমাট হবে অনুষ্ঠান। এখন থেকেই পরিকল্পনা সুরু করে দাও। শুভ্র, স্বপ্নারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এইসব কথা শুনছে, মাঝে মাঝে সায় দিয়ে হাততালি দিচ্ছে। শুভ্র বলছে, দাদান কতকিছু দেখেছে নারে? দু-দুটো যুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা। এত বছর ধরে পৃথিবীটা দ্যাখা, দারুণ। স্বপ্না বলল, দাদানের কাছে এসব ছবির মত। ছবিতে সবকিছু সুন্দর দ্যাখায়।

প্যারীমোহন শুনছেন, দেখছেন, ওর খাঁচাটা ভেতরে ভেতরে উত্তাল হয়ে উঠছে যেন। খাঁচার দরজাটা কই! খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল। ওখানে কে যেন আসবে, অপেক্ষায় আছেন প্যারীমোহন। কে আসবে!

সত্যব্রত, প্রতিভারা এর ভেতরেই নিজেরা নিজেরা, সত্যব্রত-র কথা স্পষ্ট হচ্ছে না, তবু বলতে চেষ্টা করল, বাবা আমাকে খুব মারতো। প্রতিভা বলল, যা দুষ্টু ছিলি, না মারলে পড়াশোনায় ভাল হতে পারতি? সৌম্য বলল, আমায় কিন্তু কখনো মারে নি।—তোকে মারবে কেন, নিজের মত পড়াশোনা করতি, দুষ্টু ছিলি না, আর আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। বৌ মারা যাবার পর প্রিয়ব্রত হাসে না, কথা কম বলে, তবু সোচ্চার হল, আমি তো দেখতে ভাল ছিলাম না, দুষ্টু ছিলাম, তবু বাবা আমায় মারে নি। কমলা বলল, বাবা তোকে খেলোয়াড় করতে চেয়েছিল। তোর হাঁটু ভাঙ্গার পর আমাকে ব্যাডমিন্টন খেলায় উৎসাহ দিত। আমার

দ্বারাও কিছু হল না। বাবার মনে ঐ এক দুঃখ ছিল। সত্যব্রত কিছু বলতে চেষ্টা করছে, মুখে হাসি ফুটেছে। আমি বড় ছিলাম তো, সব মার আমার উপর দিয়ে গেছে। আর আমি?— বিশাখা বলে উঠল। প্রতিভা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, তোর কথা বলিস না। সবচেয়ে পাজী ছিলি, মা-বাবার প্রশ্রয় পেয়ে গোল্লায় গিয়েছিলি। প্রতাপের হাতে পড়ে তবু কিছুটা মানুষ হয়েছিস।—আমাকে মানুষ করেছে না আমি ওকে মানুষ করেছি? বিয়ের আগে ও কেমন ছিল জানিস? প্রতাপ একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে দেখে ননীবালা বলে উঠলেন, আজ আবার ঝগড়া কেন? তোরা সবাই খুব ভাল ছিলি, আমাদের খুব আদরের। বৌ-জামাইরা, নাতি-নাতনিরাও ভাল।

প্যারীমোহন দেখছেন, সামনের জনসমুদ্রে মাঝে মাঝেই উত্তাল ঢেউ। দু'হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি করে শান্ত হতে বলছেন। তবুও এর মধ্যে নানা স্রোতের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গি, নানা বর্ণের সমারোহে বয়ে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। সামনে প্রবীণদের স্রোত মন্থর, উদ্বেল অথচ শান্ত গাম্ভীর্যে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায়। প্যারীমোহনকে ওরাই বেশী অভিভূত করছে, মনের ভেতরে স্মৃতির উচ্ছ্বাস। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ওদের বালক, কিশোর, যুবক বয়েসের মুখগুলি। ওদের দুষ্টুমি, ঝগড়া, মান-অভিমান নানা স্পর্শে শব্দে আলোড়িত হয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই বর্ণময় দিনগুলি। যুদ্ধের সময় বোমাতঙ্কে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়া সন্ত্রস্ত মুখগুলি, দাঙ্গার সময় সত্যব্রত বাড়ি ফিরল না এখনো, এইসব দুশ্চিন্তায়, স্বাধীনতা-উৎসবে সকাল সকাল প্রভাত-ফেরীতে বেরিয়ে পড়া, ব্যাণ্ডপার্টিতে সৌম্য-র অন্য পোষাকে ব্যাণ্ড বাজানো, ফুটবল-বিজয়ীর কাপ-হাতে প্রিয়ব্রত-র ঘরে ফেরা, উৎসব উল্লাস। প্রতিভা-র বিয়ে হয়ে গেল, সত্যটা কাঁদল সবচেয়ে বেশী, কমলার বিয়ের সময় সৌম্য কষ্ট পেয়েছিল আর বিশাখার বিয়েতে সবাই দূর দূর থেকে এসে, সেবার যেন এক মহোৎসব! অথচ প্যারীমোহনের বুকটা খালি হয়ে গেল, আজও বিশাখাকে দেখলে কি এক আনন্দে ভরে ওঠে বুক। ওরা সবাই এখন ওর সামনে বসে রূপকথার গল্প জুড়ে দিয়েছে, দূর থেকে দেখছেন প্যারীমোহন, খাঁচার পরিধি ছোট হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে মনে হয় এক প্রাচীন বটগাছ, বিন্যস্ত শাখাগুলি প্রসারিত হচ্ছে।

একটু দূরে প্রশাখাগুলি অন্য এক স্রোতের ভেতর। সবকিছু স্পষ্ট হয় না। অখিলেশ, বিকাশ হারিয়ে গেছে, তবু ওদেরই মুখচ্ছবি স্পষ্ট। মণীশ, লতিকা, অতসী, ওদের পুরনো আব্দারগুলি নিয়ে আজো তাঁকে স্মৃতির প্রসারণে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুব্রত, কোনোদিন কি ভেবেছিল, এত বড় হয়ে যাবে, এত দূরে সরে যাবে ওর কাছ থেকে! অন্য আরো যারা, সময়কে নিজেদের করে নিয়ে ছড়িয়ে গেল কোথায় কোথায়, প্যারীমোহনের সময়কে দূর প্রসারণে ঠেলে দিয়ে। খাঁচাটা আবার বড় হয়ে, নিজের নিয়ন্ত্রণেই যেন থাকবে না আর, নাগাল ছাড়িয়ে চলে যেতে চায়। প্যারীমোহন দেখছেন, প্রশাখাগুলি থেকে অন্য এক স্রোত আরো কিছুটা দূরে, একেবারে অপরিচিত বিন্যাসে। সত্য-র ছেলে মণীশ, তার মেয়ে স্বপ্না, এই ধারাবাহিকতা স্পষ্ট তাঁর কাছে, বাকি সবকিছু অস্পষ্ট, অচেনা। এদের সময় প্যারীমোহনের হিসেবের মধ্যে নেই, হিসেব করার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর, তবু তো এরা ঢুকে পড়ল ওরই খাঁচার ভেতরে কোনো ঘোষণা ছাড়াই! প্যারীমোহনের কিছু করার

নেই, খাঁচা এত বড় হয়ে যাচ্ছে, অস্থির হয়ে উঠেছে তার মন। এক অনাবিল আনন্দ, পাশাপাশি ভয়, এই মিশ্রণে উত্তাল ওর মন বারবার ওর দৃষ্টিকে নিয়ে যাচ্ছে খাঁচার দরজাটার দিকে। খাঁচা না বিতংস। কী ই বা তফাৎ, তবু শব্দটায় অন্য তাৎপর্য। কে যেন গান গেয়েছিল ওর চাকরি থেকে অবসর নেবার দিন—বিতংসের দ্বার খুলে দাও। সেইদিন থেকে এই দরজার কথা বারবার মনে হয়েছে ওর। এরপরও দীর্ঘদিন ধরে খাঁচাটাকেই মজবুত করতে করতে, আরো অনেক সময় তো পার হয়ে এলেন, কিন্তু এই খাঁচার ভেতরে থাকতে থাকতেই কবে থেকে এই দরজার খোঁজ, ঠিকঠিক মনে করতে পারছেন না তিনি।

তবুও প্যারীমোহনের মন আর অনুভূতি এখনো বেশ তীক্ষ্ণ। এই স্রোতগুলি শাখাপ্রশাখায়, তাদের কথা শুনতে শুনতে তাঁর খাঁচা প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী গড়ে ওঠা বিভিন্ন অঞ্চল আলোকিত হয়ে উঠছে যেন। বিস্তৃত খুঁটিনাটি, বেদনা, আনন্দ, আশা-নিরাশার ভেতর দিয়ে বয়ে আসা জীবনের যাবতীয় গ্রন্থিগুলি জেগে উঠবে নাকি! এই প্রত্যাবর্তন কি চেয়েছিলেন প্যারীমোহন! নতুন করে সবকিছু আবিষ্কার করা, নতুন আলোয় চিনে নেয়া। খাঁচাটা কি এতই রমনীয় এখন! তার দরজা খোলা। দ্যাখা যাচ্ছে। কার অপেক্ষায় বসে আছেন তিনি? কে এসে দাঁড়াবে ঐ দরজায়!

ইজিচেয়ারে নিজেকে আলতো রেখে নির্ভার হতে চান প্যারীমোহন। এই একশো বছরে তাঁর শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে, সেই শিকড় কেন্দ্র করে শাখা-প্রশাখাগুলি কতদূর বিস্তৃত, তাঁর ধারণায় ছিল না। আজ এই শতাব্দী-মঞ্চে বসে তার কিছু আভাস, নানা আন্দোলনে বিচিত্র স্তরবিন্যাসে ওরা। দীর্ঘ নিস্তরঙ্গে এতকাল থেকে, আজ এই অপূর্ব কোলাহলে ডুবে যেতে যেতে শিকড়-সন্ধানী হয়েছেন তিনি। শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের একটি বটগাছের কথা তিনি জানতেন, সেটিও শতাব্দী পার করেছে অনেক বছর আগেই, বহুদূর বিস্তারে সেই গাছের কাণ্ডটাই হারিয়ে গেছে, মূল শিকড়ের সন্ধান নেই। বটগাছ নিজেই কি হারিয়ে গেল শাখাপ্রশাখার জঙ্গলে! প্যারীমোহন কিভাবে সেই খবর পাবেন! কোন দূর ভাবনায় বটগাছটি আজও বসবাস করছে সে কথা জানার উপায় নেই, কিন্তু প্যারীমোহন সেই বটগাছ হতে চান না, তাঁর উদ্ভিন্ন সত্তা, যার উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন আজ সবাই মিলে, তার প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই তাঁর। সেই কোলাহল থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে করতে—

চারপাশ চলমান দৃশ্যপট মাত্র। সেখানে ধবনি নেই, রঙগুলি অপসৃত ক্রমে, এই শতাব্দী-মঞ্চে অবলীলায় নিস্পন্দ বসে আছেন তিনি। কোনো এক খোঁজে, সেই ছোটবেলা থেকে, কিশোর বয়েস থেকে, যুবকবয়েসে, প্রৌঢ়ের প্রান্তসীমায়, একান্তই নিজস্ব সময়ের ভেতরে যে খোঁজ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল আজীবন, অথচ সেই সন্ধান আজও পেলেন না তিনি, এই ব্যর্থতাকে আরো আরো সময় ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কি লাভ তার? তাঁরই খাঁচার ভেতরে বিভিন্ন মাত্রায় আন্দোলনে ওরা, আজ যে উৎসবে মেতেছে, সে কি তাঁর সেই চিরন্তন খোঁজ ব্যাহত করার জন্যে!

প্যারীমোহন নতুন করে বিভ্রান্ত হতে চান না। শাখাপ্রশাখারা যেভাবেই বিন্যস্ত থাক, খাঁচাটা যতদূরই বিস্তৃত হোক, প্যারীমোহন সেখানে থাকতে চান না। কাণ্ড তিনি খুঁজে নিয়েছেন, মূল শিকড়টাও, এখন নিরন্তর হবে সেই খোঁজ। বিতংসের দ্বার খোলা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

খাঁচার আন্দোলন যেমন খুশী হোক, প্যারীমোহনের দৃষ্টি সেই দ্বারপ্রান্তে। কিছু একটা ঘটবে সেখানে, ঘটতেই হবে, ঘটাতেই হবে তাঁকে। যদি কিছু না ঘটে, এত দীর্ঘ সময় পার করে সামনে আরো অনন্ত সময়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ার কি-ই বা অর্থ! প্যারীমোহন ফিরে আসছেন সংহরণের পথে।

বিতংসের দ্বার খোলা। তাঁর সংহরণ কিছু একটা গড়ে তুলছে সেখানে! যেন তাঁর দহরাকাশ স্থাপিত হয়ে অপূর্ব দুটি চোখ সেই দহরাকাশে। এই চোখ দুটি তাঁকে নির্ভার করেছে। সংহরণ থামতে জানে না, প্যারীমোহনকে নিয়ে চলেছে সেই চোখের দিকে। অবারিত বিতংসের দ্বার, সেখানে অলৌকিক ঈশ্বরীর চোখ। এই চোখই চেয়েছিলেন তিনি!—তাঁর স্বতোৎসারে যেন এমনই আভাস। শতাব্দী-মঞ্চে যে নাটক এতকাল, চলবে আরো অনেক অনেক সময় ধরে, সেখানে প্যারীমোহন নেই, অথবা রয়েছেন তাঁর দহরাকাশের কোনো প্রত্যন্ত প্রদেশে। সেখান থেকে ঈশ্বরীর চোখ দিয়ে দেখছেন তিনি, ছোট্ট আকাশ কিভাবে অনন্ত বিস্তার পেয়ে যায়, সেখানে ছড়ানো এই শতাব্দী-মঞ্চের মত আরো অনেক ছোট-বড় মঞ্চ, যাদের বৃত্তময় চলায় কোনো খোঁজ নেই। এতসব দেখছেন তিনি, কিন্তু নিজের মঞ্চটি সেখানে আর খুঁজে পাচ্ছেন না প্যারীমোহন।

# স্থবির সাক্ষী

দীর্ঘদিন ধরেই ধীরে ধীরে স্থিরতা গ্রাস করছিল তাঁকে। মোহময়ী কর্তৃত্ব থেকে স্থবির পাষাণ-মূর্তিতে। এখন প্রায় ছবি হয়ে বসে থাকেন ঘরের ভেতরে, খাটের ওপর পাতা বিছানার একপাশে। চোখদুটোর পাতা প্রায়-বোজা, ভাঙাচোরা মুখমণ্ডল, কাঁধ গোল হয়ে, হাত দুটো বেঁকে বৃত্তাকারে কোলের ওপর বিছিয়ে রাখা। হাঁটুদুটো ভাঁজ হয়ে থাকে, সোজা হয় না কিছুতেই, পায়ের পাতাদুটো বেঁকে গিয়ে মুখোমুখি। অনেক দিন হল সুপ্রভা এইরকম, বাড়ির সবাই এতে অভ্যস্ত হয়ে আছে। প্রিয়জনরা এলে তাঁর পাশে কিছুক্ষণ বসে, সর্বক্ষণের সাহায্যকারী সুবলবাবু তখন সুপ্রভাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিলে পুত্রবধূ কমলিকা এসে তাঁর ডানহাতটা ওদের মাথায় তুলে দেয়, হাতের আঙুলগুলো সামান্য নড়াচড়া করে, ঠোঁটদুটোও নড়ে, কোনো উচ্চারণ থাকে না, প্রায় বুজে-যাওয়া চোখের ভেতরে স্থির তারাদুটো একটু যেন উজ্জ্বল হয়। তারপর হাতটা নামিয়ে দিলে সবকিছু আবার আগের মত স্থির, প্রিয়জনরা উঠে যায়।

একদা এই সুপ্রভাই ছিলেন সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। দিনের প্রায় আট দশ ঘণ্টা ঠাকুরঘরে থাকলেও তাঁর নির্দেশেই সংসারের সবকিছু। ছেলেমেয়েদের বিবাহ-বার্ষিকী, নাতি-নাতনীসহ প্রত্যেকের জন্মদিন, সব দিনক্ষণ তাঁর নখদর্পণে। ঠিক সময়ে নির্দেশ চলে আসত, সেইমত সব ব্যবস্থা, তদারকি, আপ্যায়ন, আশীর্বাদ। কোনোদিন হেরফের হয়নি। হয়না আজও। ঠাকুরঘরে যাওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গুলি অচল, নির্দেশ দেবার ক্ষমতা নেই, তবু আজও তাঁর নির্দেশ অব্যাহত। কিভাবে যেন সুবলবাবু সেই সংকেত বুঝতে পারেন, বড় বৌমা কমলিকাও, নির্দেশ অনুযায়ী আগের মতই ব্যবস্থাদি। স্থবির সাক্ষী তিনি, তবু এখনো কর্ত্রী, সবাই অনুগত থাকে, ছাতার মত নিজেকে মেলে দিয়ে সবাইকে আশ্রয় দিচ্ছেন। এমন কি কোনো মৃত্যুঘটনায় তাঁর চোখে জল দ্যাখা যায়, কোনো অসুস্থতার সংবাদে মুখে বেদনার ছায়া ঘনায়।

বছর দুই হল, ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর পাশ থেকে সরে গেছেন। প্রায় ষাট বছরের সঙ্গী। শেষের দিকে বছরখানেক শয্যাশায়ী ছিলেন। খুব কথা বলতেন। মুখর ও মৌনে কথা চালাচালি হত। পাশাপাশি শুয়ে ঠাকুরের কথা, পুরনো স্মৃতি, কেমন অলৌকিক ছিল সেই আদান-প্রদান। খালি হয়ে গেছে একপাশটা। এখন আর সেই মুখরতা নেই, শুধুই মৌনস্তব্ধতা। সমস্ত বাড়ির মুখরতার ভেতরে একাকী মৌন বসে থাকেন, কোনো ইন্দ্রিয়-ব্যবহার নেই, শুধুমাত্র অনুভবের ভেতরে।

অথচ সকাল থেকে সুরু করে সমস্তদিন এ বাড়িতে তাঁর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন সুবলবাবু, সকাল সকাল তাঁকে বাথরুম থেকে স্নান করিয়ে আনেন। পরিচ্ছন্ন পোশাকে হুইল চেয়ারে আসীন হলে ঠাকুরঘরের সামনে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। তাঁর হাত ছুঁইয়ে ফুল বেলপাতা ঠাকুরকে অর্পণ করা, ঘণ্টাটিও তাঁর হাত স্পর্শ করে তবে

বাজে, দীর্ঘদিন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত স্তব দিয়েই তাঁর সামনে ঠাকুরের বন্দনা। তাঁর হয়ে কমলিকা এসব করে পরম নিষ্ঠায়। এরপর সুপ্রভার সামনে ফলমিষ্টি রেখে, তাঁকে খাইয়ে সংসারের কাজে চলে যায়।

বড় ছেলে কাজে বেরোবার আগে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে আসে। সুপ্রভা স্থবির বসে থাকেন। দেয়ালে টাঙানো গুরুজনের ফটোর সামনে যেভাবে প্রার্থনাপূরণ হয়, সেভাবেই আশীর্বাদ গ্রহণ করে প্রণব। দুপুরে খাওয়ার আগে কমলিকা তাঁর হয়ে ঠাকুর ও পূর্বপুরুষদের অন্ন উৎসর্গ করে নিজের হাতে শাশুড়ীকে খাওয়ায়। বিকেলে ছোট ছেলে তার বৌকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কাছেই থাকে ওরা, প্রতিদিন তাঁর শরীরের খবর, যদিও কোনো পরিবর্তন নেই, তবু নিতে হয় তাদের, প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। সন্ধের পর একইভাবে সন্ধ্যারতি, স্তবগান। তাঁর হয়ে, তাঁর বকলমে কমলিকা প্রতিদিন সমান আগ্রহে, নিষ্ঠায় সম্পন্ন করে। রাতে সামান্যই খান, খাওয়া হলে এরপর ঘুমোতে যাওয়া।

এইরকম নির্দিষ্ট দিনযাপনের মধ্যেও ব্যতিক্রমী যে ঘটনাগুলি, তারও নির্দিষ্ট বিধান আছে। কোনো বিবাহ-বার্ষিকী, জন্মদিনের অনুষ্ঠান, জামাইষষ্ঠী অন্য কোনো বাড়িতে হবে না, প্রতিটি হবে এই বাড়িতে, সুপ্রভার সামনে। এই নিয়ম চলছে দীর্ঘদিন, তাঁরই নিভৃত নির্দেশ মেনে। কেক কাটা হবে, আশীর্বাদ নেওয়া হবে, শুভেচ্ছা বিনিময় হবে, সবশেষে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার সূচীও সুপ্রভার নির্দেশে, যা কমলিকা কোন এক অলৌকিক উপায়ে জেনে যায়। সুপ্রভা মধ্যমণি হয়ে বসে থাকেন হুইলচেয়ারে, তাঁকে কেন্দ্র করে উৎসব, উৎসব-শেষে তাঁকে প্রণাম করে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

কারো সন্তান হয়েছে, সুপ্রভার কথা প্রথমে মনে পড়বে। তাঁর স্থবির হাত থেকে ফুল বেলপাতা পড়বে সেই সন্তানের মাথায়। মৃত্যুঘটনাতেও একই নিয়ম, মৃতদেহ আসবে এই বাড়িতে। আধবোজা চোখে শেষ যাত্রা দেখবেন তিনি, তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবে সেই বিদেহী আত্মা। স্বামী-স্ত্রীতে অথবা বাবা ও ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে, এমনিতে মিটে গেলে ভাল, নাহলে সালিশীর জন্যে তাঁর কাছেই আসতে হবে। তাঁর পায়ের কাছে বসবে বাদী-বিবাদী, যে যার মত অভিযোগ জানাবে, তিনি শুনবেন, বিধান দেবেন, সুপ্রভার হয়ে এই দৌত্য করে কমলিকা। সেই বিধান মনঃপূত হলে মিটে যায়। অধিকাংশ সময় মনঃপূত হয় না, মনঃপূত না হলে কমলিকা বলে, মেনে নাও, মা বলছেন, নাহলে তিনি কষ্ট পাবেন। কেউ তাঁকে কষ্ট দিতে চায় না, অসন্তোষ মনের ভেতরে রেখেই আপাতত তার সমাধান হয়ে যায়।

এই বাড়িতে নিয়মিত প্রাণচাঞ্চল্যের ভেতরে এভাবেই সুপ্রভা তাঁর ভূমিকা বজায় রেখেছেন স্থির-স্থবিরতা নিয়েও। কেন্দ্রগত এই সংসারটি, অন্য অন্য গ্রহ-উপগ্রহ সংসারগুলিও এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, ঈশ্বরীর ইচ্ছে নির্বিবাদে মেনে নেয়, কমলিকা দূতীর ভূমিকায়, অন্য সকলের ওপর তার প্রভাবও কম নয়।

এমন সুপ্রভা, তাঁর এমন স্থবিরতা হঠাৎ-ই একদিন আরো গভীর অন্তর্মুখে চলে গেলে, তখন তাঁর মননও কাজ করছে না, সুবলবাবু ও কমলিকা তা জেনে যাবার পর সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। গ্রহ-উপগ্রহসমেত কেন্দ্রীয় সংসারটি আবার একত্র সমাবেশে। এলোপ্যাথ ডাক্তার এল, হোমিওপ্যাথ এল, এমনকি কবিরাজও। সবাই মিলে যে যার সামর্থ্যমত চেষ্টায়, তবু

অন্তর্মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন না সুপ্রভা। উদ্বেগের ছায়া প্রসারিত হচ্ছে, যেন এক অচলায়তন ভেঙে পড়ার উপক্রম। এতদিনের নির্বিবাদ স্থাপত্যটি ভেঙে যায় যদি, এরপর কেন্দ্র থাকবে না, কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছাড়া কিভাবেই বা গ্রহ-উপগ্রহগুলি পারস্পরিক হবে। এইসব ভাবনায় সবাই যে যার মত দুশ্চি স্তায়। প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সেই অলৌকিক নির্দেশ ভিন্ন কিভাবে চালিত হবে প্রত্যহের যাবতীয় খুঁটিনাটি, যদি ভিতটাই ধসে যায়, উপরিতল নতুন কোন বিন্যাসে এরপর থেকে? এসব কিছুই ঠাহর করতে না পেরে মৌনমূক শোকস্তব্ধ হয়ে আছে।

অথচ কারো সাহায্য ছাড়াই, সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণে অলৌকিক প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। সুবলবাবু ও কমলিকা এই ঘটনা জেনে গিয়ে, অন্য সকলের মধ্যে তা প্রচারিত হলে সবাই স্বস্তিতে। সুপ্রভাকে মাঝখানে রেখে, তার চারপাশে নিজেদের সাজিয়ে, যেন পুরনো বিন্যাস ফিরে এসেছে আবার, অচলায়তনের ছাদ আরো অন্তত কিছুকাল সুরক্ষিত, এই বোধে আশ্বাসিত ওরা মেতে উঠল আনন্দ-উৎসবে।

তবুও যেন অন্তর্মুখ থেকে ঠিকঠাক ফেরেননি সুপ্রভা। চোখদুটো, মুখমণ্ডল আরো বেশী নিস্পৃহ, সবার উপস্থিতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভেতরে গভীর নির্বেদ নিয়ে বসে থাকলেন তিনি। কমলিকা এটা লক্ষ্য করেছে, তবু প্রত্যাবর্তনের কথা তার সূত্রে জেনেই অন্য সবাই সে বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন থাকল না, উৎসব-শেষে ফিরে গেল যে যার নিজ অবস্থানে। বস্তুত, পুরনো স্থবিরতা আর এই নতুন অন্তর্মুখি স্থবিরতার ভেতরে যে তফাৎ, এই অন্তরটুকু বোঝার মত মানসিকতা বা সময় বা অবকাশ এদের কারো ছিলই না।

গভীর সুষুপ্তি থেকে ফিরে এসে সুপ্রভার কাছেও সবকিছু অন্যরকম। আগে সবাইকে ঠিকঠাক চিনতেন তিনি, কারো কণ্ঠস্বর শুনে, কারোর হাতের স্পর্শে, কারো মাথা স্পর্শ করে, আধো-চাহনিতে কারো হাসি দেখে। তুমুল হৈচৈয়ের ভেতরেও প্রত্যেকের কার কতটুকু বদল হল ঠিক বুঝে নিতে পারতেন। কার জন্মদিনে কে কে এল না, তার হিসেব থাকত। কেন এল না, কোনো অভিমানে নাকি ব্যস্ততা, তা বুঝতেও অসুবিধে হত না তাঁর,—ব্যস্ততার ভেতরে একবারও আসার সময় হল না, ব্যস্ততা নাকি ভান, অভিমানই বা কেন হয়েছে, মেজো মেয়ের বিবাহ-বার্ষিকীতে মেয়ে-জামাই নিজেরাই এল না, কোথায় বেড়াতে চলে গেছে, অন্যদিন না গিয়ে আজই যাবার প্রয়োজন হল, এটা স্বাভাবিক না, অস্বাভাবিকের সূত্রগুলি কী কী, এসব ভাবতে ভাবতে গভীর থেকে স্মৃতিপরম্পরায় সূত্রগুলি তুলে এনে কখনো কখনো ঠিক ঠিক হদিশ পেয়ে যেতেন, কখনো পেতেন না। কমলিকা তখন কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করত, সুপ্রভা অনেক সময় তা মানতে পারেননি। বড়জামাই অনেকদিন কোনো অনুষ্ঠানে আসেনি, বড় মেয়ে মারা যাবার পর তার মনে হয়ত ক্ষোভ, কেন তা বোঝার চেষ্টা করতেন; তারপর কয়েকটা অনুষ্ঠানে এল, ক্ষোভ মিটে গিয়ে এসেছে, নাকি একাকিত্ব তাকে ফিরিয়ে দিল, এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে করতে একটা হদিস খুঁজে নিতেন। দীর্ঘ অবকাশ ছিল তাঁর, গ্রহণ ছিল, সে অর্থে বিনিময়-প্রতিদান ছিল না, ফলে সুদূর অতীত পর্যন্ত বিশ্লেষিত হবার সুযোগ ছিল। সুপ্রভা তাঁর নিজের জগৎ এভাবেই গড়ে নিয়েছিলেন, যেখানে গ্রহ-উপগ্রহরা তাঁর গড়নেই অবস্থান করত।

এখন সেই গঠন-স্থাপত্য আর নেই। উপর-কাঠামোটি বজায় থেকে ভেতরের বিন্যাস

চুরমার হয়ে গেছে। সময়ের হিসেবগুলি গোলমাল হয়ে কমলিকাও তাঁর নির্দেশ ঠাহর করতে পারে না। এখন কমলিকা, এতদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নিজে সে দায়িত্ব নিয়েছে। সুপ্রভা বুঝতে পারেন, সবকিছু একইরকম চলছে হয়ত, কোনো ত্রুটি থাকার কথা নয়, কিন্তু সেখানে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। এইভাবে উত্তরাধিকার নিয়ে কমলিকা যোগ্য হয়ে উঠছে, এটা সুপ্রভার কাছে স্বস্তির। এই অন্যরকম বিন্যাসে শুধু নীরব সাক্ষী তিনি, তাঁর হয়ে তাঁরই ভূমিকায় এখন কমলিকা, পুরোহিতের মত সুপ্রভাকে বিগ্রহ সাক্ষী রেখে সবকিছু নির্বাহ করে।

এখন তাঁর বোধে কমলিকাই শুধু স্পষ্টতর, অন্য যারা, আরো বেশী অস্পষ্ট হয়ে, গভীর অন্তর্দেশে ক্রমশ উন্মোচিত হতে হতে, গ্রহ-উপগ্রহরা কে কোন কক্ষ-বিন্যাসে, কখন সেই বিন্যাসের বদল হচ্ছে, এ সমস্ত শুধুই যেন মানসপটে আঁকা। সেখানে যুক্তিবিন্যাস নেই, কোনটা জন্মদিন, কোনটা বিবাহ-বার্ষিকী, এলোমেলো হয়ে যায়। কে এল, কে এল না, কোনো তফাৎ না, সবার মধ্যে বসে থেকেও, কখন উৎসব, কখন উৎসব না, সুপ্রভা আজকাল বুঝতে পারেন না। এমনকি স্বামী ব্রজেশ্বর পাশে নেই এটা জানলেও, কবে থেকে নেই তার হিসেব থাকে না।

সুপ্রভার সময় এখন প্রত্যাহারে যাচ্ছে। এই তো সেদিন, বিবাহ-বার্ষিকীর সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করল ওরা। সুপ্রভা আগের মত হাঁটতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যেতে সুরু করেছে। তবু তো হাঁটতে হাঁটতে, পাশাপাশি দুটো চেয়ার ফুল দিয়ে সাজানো ছিল, বাঁপাশের চেয়ারটায় ব্রজেশ্বর। ফিরে এসেছিল পঞ্চাশ বছর আগের দিনটা। ওরাই ফিরিয়ে দিয়েছিল উলুধবনি দিয়ে,মালা বদল করিয়ে, এমন কি ফুল দিয়ে সাজানো শোবার খাটটায় ফুলশয্যার ব্যবস্থাও ছিল। জড়ানো কথায় উচ্চারণ ছিল তাঁর, ছিছি, এসব কি করছিস তোরা, কি লজ্জা। একান্তে ব্রজেশ্বর বলেছিলেন, ওরা বেশ করল, এটাই তো পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ জয়ের প্রাপ্তি, কি বল? সুপ্রভা হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি, শুধু বলেছিলেন, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিদের সামনে কি লজ্জা। কিন্তু ভাল কি লাগেনি সুপ্রভার? ব্রজেশ্বর আরো বলেছিলেন, তোমার সে-অবস্থা থাকলে আমরা এই দিনটায় কোথাও বেড়িয়ে আসতাম, কি বল? সুপ্রভা উত্তর দেয়নি কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ ফিরে এসেছিল যৌবন বয়েসের, প্রৌঢ় বয়েসের দিনগুলি। পুরীতে বেড়াতে যাওয়া, দার্জিলিঙের ম্যালে হেঁটে বেড়ানো, প্রায়ই অশোক কুমার মধুবালার ছবি দেখতে যাওয়া, এমনকি প্রৌঢ়বয়েসেও উত্তম-সুচিত্রার বই দেখে নিজেদের রাঙিয়ে নেয়া। ছোট ছোট খুনসুটি, মাঝে মাঝে রাগ-অভিমান। সমস্ত অতীতটাই ভেসে ওঠে তাঁর সামনে।

সুপ্রভার মনে বাইরের জগতের কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই। ভেতরের জগতের অলৌকিক দহরাকাশে অন্য পৃথিবীর সমারোহ, সেই সব চরিত্রেরা ঘটনার পরম্পরায়, সময়ের ধূসর মেখে অলৌকিক বর্ণময় আজ। ছেলেমেয়েদের বড় হওয়া, তাদের বিয়ে, নাতি-নাতনী, তাদেরও বড় হওয়া যেন এক দীর্ঘায়িত চলচ্চিত্রে স্থাপিত হয়ে, সেই বর্ণময় পৃথিবীতে ন্যস্ত আছেন সুপ্রভা। এমনকি তাঁর কিশোর বয়েসের দিনগুলি, বাবা-মা, দেশের বাড়ি এসবও সেই চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত। এই পৃথিবীতেই স্বচ্ছন্দ তিনি, অন্য যে পৃথিবী, সেখানে যারা যারা, কে কোন বিন্যাসে, কিভাবে তাদের বিবর্তন, এসবে আর আগ্রহ নেই। নিজস্ব পৃথিবীর ভেতরেই আরো গভীরতর এক পৃথিবীর সন্ধানে আছেন, যার ভেতরে হয়ত বা আশ্রয় খুঁজে নিতে চান তিনি।

একটা সময় পর্যন্ত পুরনো পৃথিবী নিজ নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে নিয়ন্ত্রণ রেখে, সেই পৃথিবীর আবর্তন যথাযথ আছে জেনে, কোনো এক সময় নতুন পৃথিবীর সন্ধানে। সেখানে কি খুঁজছিলেন তিনি! ঠাকুর ঘরেই কাটত সারাদিন। যখনই তীর্থে গেছেন পছন্দমত বিগ্রহ সংগ্রহ করে ঠাকুরঘরে সাজিয়েছেন। পুজো, আরতি, স্তবপাঠ, গান এসবের মাধ্যমে সেই প্রতীকদের সঙ্গেই বসবাস করতেন, তাঁদের কাছে সন্তানের মঙ্গলকামনা ভিন্ন অন্য কিছু চাননি। তাঁর প্রত্যয় ছিল, ঠাকুরের আশীর্বাদ সন্তানের ওপর বর্ষিত হয়ে ছাতার মত নানা দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবে। সংসার সবাই যে যার মত করুক, ওদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে তিনি আছেন, এই দেবতাদের কাছে, তাঁদের প্রসন্ন করে আশীর্বাদ সঞ্চয়ের জন্যে। সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করারও নিয়ম করে দিয়েছিলেন। পরিবারের প্রত্যেকে দিনে একবার করে ঠাকুরঘরে আসবে, আশীর্বাদ গ্রহণ করে তারপর যে যার কাজে যাবে। এই আদেশ সবাই মেনেছে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আরো জেনে খুশী থেকেছেন, প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও, তাঁর নির্দেশমতই সংসারের সমস্ত কার্যধারা ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

আজ এই প্রত্যাহারে যেতে যেতে সেই পর্বে পৌঁছে মনে হচ্ছে, তিনি কি সত্যিই নিজের জন্য কিছু চাননি? বা খোঁজেন নি কিছু? নিশ্চিত হতে পারছেন না। স্থবিরতার যে খোলস তাঁকে এমন অন্তর্মুখী করেছে, সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে সেদিনই তো খোলসের প্রাথমিক সূচনা করেছিলেন, ধীরে ধীরে অবশেষে গাঢ় সেই খোলসটা। তাঁর ভেতরে প্রেরণা অবশ্যই ছিল, অন্তত অবচেতনে, একটা নিজস্ব আশ্রয় তাঁর দরকার। একটা সময় পর্যন্ত সবাইকে আশ্রয় দিয়ে আসার পর, নিজের জন্যও একান্ত আশ্রয় একটি দরকার, না হলে ভারসাম্যই থাকবে না।

সুপ্রভার বোধে এখন অন্য মাত্রা। অবচেতন উঁকি দিচ্ছে চেতন স্তরের সীমানায়। তাঁর দহরাকাশ প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। খোলসের ভেতরে নিশ্চিন্ত থেকে, বাইরের কোলাহল ছুঁতে পারছে না। দহরাকাশে প্রসারিত আছে যে আকাশ, সেখানে নির্মাণ হতে পারে তাঁর একান্ত আশ্রয়, যে আশ্রয়ের সন্ধান করে এসেছেন খোলস-নির্মাণের প্রাথমিক পর্ব থেকেই।

তাই সুপ্রভা এখন ঈশ্বরীর ভূমিকায়। ধীরে ধীরে নির্মাণ করতে চলেছেন তাঁর আশ্রয়স্থল। দেখতে দেখতে সবাই এসে জড়ো হয়েছে, তাঁকে কেন্দ্র করে বসে আছে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই—ছেলে-মেয়ে, বৌ, জামাই, নাতি-নাতনী, নাতবৌরা। হুইলচেয়ারে বসে উন্নত তাঁর মুখমণ্ডল, হাতে বরাভয়মুদ্রা। স্থবির খোলস ভেদ করে উঠে আসছে সেই দহরাকাশ, প্রসারিত হচ্ছে, প্রসারিত হতে হতে প্রায়-বোজা চোখ ভেদ করে জেগে উঠছে ঈশ্বরীর চোখ। স্থবির সাক্ষীর মুখে কোনো ভাষা নেই, সেই ভাষা সংহত হয়েছে ঈশ্বরীর চোখে। এই ভাষা বৈখরী নয়, পশ্যন্তী। এরপর পরা-অবস্থানে যাবার আগে এই ভাষা পড়ে নিতে হবে, গভীর সম্মোহে অপেক্ষা করছে সবাই।

# দিনযাপনের গল্প

প্রতিদিন ভোরে পরিষ্কার আকাশ দেখলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুমচোখের আকাশ স্বচ্ছ চোখ মেলে দ্যাখে, নিচে পড়ে থাকা রাস্তাগুলি নিজেরা নিজেরা কাটাকুটি করে কেমন অলসভাবে শুয়ে আছে। দু'একজন বিচ্ছিন্ন মানুষের পদপাত আর আমার, ঘুম ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট নয় যেন। একটা কাটাকুটিতে প্রবীরবাবুর সঙ্গে দ্যাখ্যা, ওর ছেলের অসুখের কথা দাঁড়িয়ে শুনি কিছুক্ষণ, মনটা খারাপ হয়, তারপর এগিয়ে যাই। কিছুটা এগিয়ে পথের ওপরেই মহিমবাবুর সঙ্গে দ্যাখা, তার ছেলের চাকরি পাওয়ার কথা শুনি কিছুটা সময়, মনটা প্রসন্ন হয়। এরপর খালের পাড় দিয়ে রাস্তাটা, চেনা লোক থাকার সম্ভাবনা কম যেখানে, সে-পথে অনেকক্ষণ হাঁটতে থাকি। রোদ চড়া হতে হতে, রাস্তার ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আকাশ ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে, আমার পরিক্রমা শেষ করে বাড়ি ফিরে আসি।

এভাবে আমার প্রত্যহের সূত্রপাত হয়। হাতমুখ ধুয়ে চায়ের কাপ সামনে রেখে ভাবনাগুলি বিন্যস্ত করি।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসা। জীবনের সুরুতে এই ভোর তো ছিল। সেই বালকবয়সের সময়। এইরকমই স্বল্পকালীন, প্রায় স্বপ্নের মত। এই যে প্রবীরবাবুর সঙ্গে দ্যাখা হল, দুঃখ পেলাম। তারপর মহিমবাবুর সঙ্গে দ্যাখ্যা, সেখানে প্রসন্ন হলাম। তারপরই প্রসন্নতা ও দুঃখকে এড়িয়ে খালপাড়ের রাস্তা ধরে হাঁটা, ছোটবেলায় সেইরকমই তো কাটিয়েছি। সুখ যেমন ছিল, দুঃখও ছিল, কোনোটাই তেমনভাবে গায়ে লাগেনি, সমস্ত যাপন ছিল অলৌকিক, এখন এমনই মনে হয়। তারপর কিশোরবয়েস, একটু একটু তাপ গায়ে লাগা, ঠিক এখন যেমন ভোরবেলার সেই অলৌকিক নেই। পড়াশোনা, পরীক্ষা, নিষেধ, এসবের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, —যেমন এইমাত্র মনে হল বাজারে যেতে হবে, স্ত্রী ফর্দটা রেখে গেছে। সাংসারিক কি কি কর্তব্য করছি না, যা শুনিয়ে গেল আমার স্ত্রী অভিযোগের তালিকাটা দীর্ঘায়িত করে। চায়ের কাপটা অবকাশের মাধ্যম নয় আর, ওটা চটপট শেষ করে উঠে পড়তে হবে।

আরও জানি, কিভাবে কিশোরবয়েস পেরিয়ে যৌবনে পা দিতেই দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অর্থাৎ অন্যের শাসনে আর নয়, নিজের মুখোমুখি হয়ে নিজেরই শাসনে, অর্থাৎ বাজার থেকে ফিরে এরপর নিজের আর্থিক দিকটা নিয়ে বসতে হবে। মেয়ের বিয়ে, তারপর ছেলের বিয়ে, পেনশনের ডি.এ. বাড়ছে না। পেনশনও যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সুদের হার ক্রমশ কমছে, জিনিসপত্রের দাম উর্দ্ধমুখী, সবদিক

সামলে বাকি জীবনটা কিভাবে! এইসব ভাবতে ভাবতে গাঢ় লৌকিকের ভেতরে চলে যেতে হবে।

জানি, এর কোনো সুরাহা নেই। দিন গড়াতে গড়াতে সন্ধের কাছাকাছি পৌঁছে, অদৃষ্ট, নিয়তি, এইসব শব্দের দ্যোতনা আমাকে আচ্ছন্ন করতে থাকবে। হাঁটতে বেরিয়ে ভোরের অলৌকিকে পৌঁছতে পারব না কিছুতেই, বাড়ি ফিরে আসব অবসাদ সঙ্গে করে; যেভাবে যৌবনের সমস্ত উৎসাহ জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতার চাপে পড়ে আস্তে আস্তে নিভে গেছে একদিন, অবসরও ফিরিয়ে দিতে পারেনি বালকবয়েসের মানসিকতা, সেখানেও তো সারাজীবনের ব্যর্থতারই ছায়া।

এরপর! এরপর কী হবে। সময়ের ভার বয়ে বয়ে রাত্রি গভীর হবে, ঘুমোতে চলে যাব আমি, আরো এক, অন্য এক ভোরের প্রত্যাশায়। যেমন মনে হয়, ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে যে-যার সংসার করতে চলে যাবে, বাকি জীবনটা দুঃসহ কাটতে কাটতে মৃত্যুর দিকে এগোনো। মৃত্যু যে আসবে, সেখানে কোন প্রত্যাশা? পুনর্জন্ম যদি, সে-ও-তো একই ক্লান্তিকর পুনরাবর্তনে। পৃথিবীর অধিকাংশ, যাদের কাছে পুনর্জন্ম শব্দটা কোনো অর্থই বহন করে না, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে কোন ভাবনা গ্রাস করে ওদের! আমি জানি না, পুনর্জন্ম মানি কি মানি না, তাও জানি না।

টেবিলে শব্দ করে কাপ রেখেছে কেউ, সেই শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি, টেবিলের ওপর বাজারের থলে। স্ত্রী বলল, কী ভাবছ বসে, শুনি? আগের চা-তো জল হয়ে গেল। নতুন চা দিলাম, গরম গরম খেয়ে বাজারে যাও। এরপর বাজারে গেলে যা আনবে তা আর খাওয়ার উপযুক্ত থাকবে না।

বুঝলাম, কিশোরকালেই আছি। চা খেয়ে বাজারে যাবার জন্য উঠলাম।

বাজারে পৌঁছতে তিনটে রাস্তার মোড় পার হতে হয়। দ্বিতীয় মোড়ে পৌঁছবার আগেই আচমকা এক ধাক্কায় পড়ে গেলাম। রাস্তায় পড়ে থেকে কিছুক্ষণ পর ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা স্পষ্ট হয়েছে। একটি লোক পালাচ্ছিল, আমি সামনে পড়ে যাওয়ায় ধাক্কা মারে। ঠিক তখনই সামনের রিক্সা থেকে একটি লোক নেমে ওর পেছনে ছুটতে থাকল, ওর হাতে রিভলবার। প্রায় তৎক্ষণাৎ ওরা দুজন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এরপর একটা গুলির আওয়াজ এবং একটা আর্তনাদ। দূরে কোথাও তুমুল কোলাহল।

রাস্তায় পড়ে আছি। কয়েকজন ধরাধরি করে তুলছে, কিন্তু অন্য কোথাও অন্য ঘটনা তীব্রতর মনে হওয়ায় ওদের কয়েকজন ওদিকে দৌড়ে গেল। দু'একজন কোনোরকমে আমাকে দাঁড় করিয়ে, 'দাদু, আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান,' বলে ওদিকেই ছুটে গেছে। একটা রিক্সা এদিকে আসছিল, দাঁড় করিয়ে তাতে উঠলাম। যেতে যেতে ওর কাছেই ঘটনার বাকিটা—যে আমাকে ধাক্কা মেরেছিল সে চোর, একটি লোকের টাকার থলে ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। যে ওকে তাড়া করল, সে সাদা পুলিশের লোক। ওর রিভলবারের গুলি রাস্তায় হাঁটতে-থাকা এক যুবকের গায়ে লেগেছে। রক্তারক্তি কান্ড, যাকে নিয়ে এতসব, সেই চোর যে কিভাবে কোথা দিয়ে পালাল, সবাই অবাক। যুবকটিকে কয়েকজন

হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, অন্যরা সাদা পুলিশের লোকটাকে ঘিরে ধরে, পুলিশের লোক বলে ওকে মানতেই চাইছে না। হাঙ্গামা বেঁধেছে খুব। এইসব দেখে রিক্সাওয়ালা ওখান থেকে চলে এসেছে।

বাড়ি ফিরে সব ঘটনা স্ত্রীকে বলতে ওর ব্যস্ততা বেড়ে গেল। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। ছেলের বন্ধু গৌতমকেও ডাকা হল, ছেলে দিল্লীতে যাবার পর গৌতমই আমাদের দ্যাখাশোনা করে। নানারকম পরীক্ষার পর কোনো গোলমাল পাওয়া যায়নি, তা সত্ত্বেও অনেক পরামর্শে যা সাব্যস্ত হল, আমার ওপর দিয়ে একটা ফাঁড়া গেছে, এটা একটা সতর্কীকরণ। এবার থেকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

আমাকে এই ঘটনা বিচলিত করেনি। বরং এর সূত্রে অন্য অনেক ঘটনা ঘটেছে। একজনের টাকা খোয়া গেল, চোর ধরা পড়েনি। একটি যুবক অকারণে আহত হয়েছে, পরে ওর মৃত্যুও হতে পারে। সাদা পোষাকের লোকটাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। ওকেও কি জনরোষ আহত করল? নাকি নিজেকে পুলিশ বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। বরং এইসব ঘটনায় বিচলিত না হয়ে কৌতূহলী আমি। একটা দার্শনিক বোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে।—একজনের টাকা অন্যজনের কাছে গেল, যার গেছে হয়ত তার অনেক থেকে কিছু গেছে, যার কাছে গেল তার হয়ত কিছু প্রাপ্তি, অন্য অনেকের সঙ্গে ভাগাভাগি করেও। অর্থাৎ এই যাওয়াটা নিম্নগামী, প্রকৃতির নিয়ম মেনেই, যদিও প্রচলিত নৈতিকতার বিরোধী, যার মর্মার্থ, চুরি করা অনুচিত। তবুও কেউ কেউ বলতে পারে, কারো কাছে টাকা থাকা, কারো কাছে টাকা না-থাকা কোন নৈতিকতা মেনে হয়?

খুবই জটিলতার ভেতরে চলে যাচ্ছি আমি। বরং অন্য দিকগুলি ভাবা যেতে পারে। যুবকটির জীবনে এমন ঘটবে, ও জানত না। কেউ জানত না, তবু ঘটেছে। অন্য কারো ক্ষেত্রে, এমনকি আমার ক্ষেত্রেও এটা ঘটতে পারত। ঘটেনি। এমন হয় কেন, কোন যুক্তিতে! অথচ যুক্তিহীন এইসব ঘটনায় কত জীবনের কত পরিবর্তন ঘটে যায়। এর কারণ বোঝা যায় না, অযৌক্তিক এসব ঘটনা থামানো যায় না কিছুতেই, যার অর্থ নিয়তিই চালকের ভূমিকায়। এই মুহূর্তে এর অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারছি না আমি। তবু সাদা পুলিশের লোকটা হত্যাকারী অবশ্যই। হোক অনিচ্ছায়, তবু রক্ষকই তো ভক্ষক হল। যদি পুলিশ সেখানে না থাকত, কী হত তাহলে? সমস্ত লোকজন একসঙ্গে কোনোদিন বলে ওঠে যদি, পুলিশকে আমরা মানছি না, পুলিশের কী করার থাকে! রাষ্ট্র, পুলিশ এসব তো অতিকথা। সবাই মানে বলেই এদের অস্তিত্ব। যে লোকটির এত টাকা খোয়া গেল, সে অবশ্যই অর্থবলে বলীয়ান, নিজের প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল কি ছিল না, তার থেকে বড় কথা, পুলিশের ভরসায় থেকে নিজে প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়নি। দ্যাখা গেল তো, পুলিশ থাকলেও চোর সবার সামনে দিয়েই পালিয়ে যেতে পারে— না ঃ এসব ভাবনার জটিলতায় আর যেতে ইচ্ছে করছে না।

সমস্ত জীবন এইরকম নিয়তিবদ্ধ থেকে অনিশ্চয়তার দিকেই তো চালিত হয়েছি। খুবই সাধারণ জীবনযাপন, কোনো হেলদোল নেই। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়ে উঠতে

পারিনি, ধবস্তও হয়ে যাইনি। চারপাশে এত এত লোক, ওরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কি ভাবে না, জানি না। আমার চোখে ওদের অধিকাংশ আমার মতই সাধারণ, তবু এই নিয়তিসর্বস্বতার ভেতরেও কেউ কেউ নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, নিজেকে সার্থক প্রতিপন্ন করতে চায়, এটাও তো দেখছি। কোন সে অন্তঃসার, যা তাদের এইভাবে প্রাণিত করে!

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে, এইসব ভাবতে ভাবতে মনে হল, আমার বোধে কোনোভাবেই ওরা রেখাপাত করছে না। আশ্চর্য! অথচ প্রতিদিন যেমন হয়, আজও ঘটল। একটি লোক কোথা থেকে আমার পাশে এসে, আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকে, কথা বলতে থাকে। লোকটি কে, কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কোনোদিন ঠাহর করতে পারিনি। গায়ে পড়ে তার এই সহযোগ, তা-ও আমাকে অবাক করে নি কখনো। সে এসেই সমস্ত দিন যা যা ঘটেছে, যদি কিছু বিশেষ তার মধ্যে, নানাধরনের প্রশ্নে তার বিশ্লেষণ করে। আমি উত্তর দিই সাধ্যমত। কখনো খুশী হয়, কখনো হয় না। অবশেষে প্রতিদিনই একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের মুখোমুখি করে আমাকে,—কেন তবে বেঁচে আছি, বেঁচে না থাকলে কি এমন ক্ষতি হত পৃথিবীর?

কোনোদিন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, তাই পাল্টা প্রশ্ন করি, বেঁচে না থাকলে তবুও কি পৃথিবীর কোনো লাভ হত? লোকটিও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হেসে বলে, সত্যিই তো, এটা বেশ কথা হল। পৃথিবীকেও আমরা দুজনে একই প্রশ্ন তো করতে পারি, তুমিও তো কোটি কোটি বছর ধরে এত লোকজনের একঘেয়ে জীবনযাপন, তাদের আশা-আকাঙ্খা, হতাশা-ব্যর্থতা, কারো কারো বা অস্মিতা বুঝে নিয়ে ঘুরেই চলেছ, ঘুরেই চলেছ। কেন, তা কি ভেবে দেখেছ কোনোদিন? খোঁজ নিয়েছ কি, কে তোমায় এমনভাবে চালনা করছে, দেখেছ তাকে? আড়ালে থেকে তার এইসব কান্ডকারখানা, কোনোদিন হদিস পেলে না তার,—এ নিয়ে ভেবেছ কখনো? তুমি এই আবর্তনে না এলে কার কী ক্ষতি হত? আবর্তনে এসেও কারো কিছু লাভ হয়েছে কি? আমি আর ঐ লোকটা দুজনেই জানি, পৃথিবী এর উত্তর জানে না, উত্তর দিতে হয়তো নিষেধ করেছে কেউ। এবং তখনই দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠি। লোকটি তারপর কিভাবে যে আমার পাশ থেকে সরে যায়, টের পাইনা। স্বস্তির কেমন একটা ঘোর নিয়ে ঘরে ফিরি।

প্রতিদিনের মত আজও লোকটি এসেছে। পাশে পাশে হাঁটছে অন্যদিনের মত, একটু বেশী প্রগলভতা নিয়ে। বারবার জিজ্ঞেস করছে, আজ একটু অন্যরকম হল না? দিনের বেলার ঐ ঘটনাটা? বললাম, তেমন কিছু না তো।—তুমি তো মরেও যেতে পারতে, কিন্তু বেঁচে আছ তো। লোকটার প্রশ্নের ঢঙেই বললাম, মরে গেলেই বা ক্ষতি কি হত? মরে না গিয়ে এই যে বেঁচে আছি তাতেই বা কি লাভ হচ্ছে পৃথিবীর?

লোকটি এবার না-হারার মেজাজে,—বাঁচা-মরার লাভ-ক্ষতিতে এতই যদি নিস্পৃহ, মাঝামাঝি কিছু একটা তবে অবশ্যই আছে। খুঁজে পেয়েছ কি?

আমাকে রীতিমত বিহ্বল করে তারপরই লোকটি আমার পাশ থেকে সরে গেছে।

দিনের শেষে সন্ধের পর রাত্রির দিকে এগোচ্ছি ক্রমশ। সমস্ত দিনটা গুছিয়ে মুড়ে নিতে হবে ঘুমের ভেতরে যাবার জন্যে। বাজার করা হল না, দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে কতকিছু ঘটে গেল। সতর্কীকরণই তার অবশেষ। কিসের সতর্কতা! মৃত্যুকে আরো কিছুদিন দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে? মৃত্যু হলে বা না হলে কী প্রভেদ! আমার মত আরো অনেকে এইভাবে মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেবার জন্যে প্রাণপাত করে যাচ্ছে। কোন প্রত্যাশায়? কি লাভ ওদের? জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে বিশেষ কী করছে ওরা? এই যে অজস্র প্রাণপ্রবাহ ভারী করছে পৃথিবীটাকে; জীবনের বিভব তলানিতে ঠেকে গিয়ে চলমান বিভব থেকে কিছু কিছু আহরণ, অবশেষে তাকে ক্ষয় করে ফেলা, এছাড়া তাদের এই কর্মধারায় কী আছে আর? ঘুমের ভেতরে নিজের আশ্রয় খুঁজে পরদিনের জন্যে নতুন বিভবের অন্বেষণ, এরপর দিনের শেষে ক্ষয় করে ফেলার জন্যেই তো!

ওঘরে টেলিফোন বাজছে। কার টেলিফোন? দিল্লী থেকে ছেলে করছে হয়তো। বাজুক। ওর মা ধরবে, উদ্দীপিত হবে ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে। ওখানেই ওর বিভব, দু-একদিন থাকবে, তারপর আবার ফোনের অপেক্ষায়-অপেক্ষায় সেই বিভব ক্ষয় করে ফেলার জন্যে।

স্ত্রী-র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইন্দ্রজিৎ তোমার সঙ্গে কথা বলবে, এঘরে এসো।

ওঘরে গিয়ে, ফোন হাতে নিয়ে, কে, ইন্দ্রজিৎ? কেমন আছিস?

আমি ভাল আছি। তোমার কি কান্ড হল আজ? দিনকাল ভাল নয়, সাবধানে চলাফেরা করবে। দূরে আছি, চিন্তা হয়।

আমার কিচ্ছু হয়নি, চিন্তা করিস না। আমাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই। তুই ভাল থাক।

তোমাকে একটা সুখবর দিই। আমার প্রমোশন হল, মাইনেও বাড়ল অনেকটা। ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বরে অন্য মাত্রা।

আমি কি উদ্দীপিত হচ্ছি? কিছুটা বিভব বাড়ল মনে হয়। ছেলে তো আমারই প্রসৃতি। ওর উন্নতি তাই আমাকেও ছুঁয়ে গেল! আমার জীবনে তেমন কিছু ঘটেনি, ছেলের জীবনে ঘটছে, ও আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন থাকব না, আমার প্রতীক হয়ে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে, আমাকে বহন করবে, আমার মৃত্যুকে গৌণ করে প্রতিষ্ঠা দেবে। তারপর দায়িত্ব নেবে ওর ছেলে বা মেয়ে।

বললাম, এই তো চাই। তুই আরো বড় হ। এইসব তুচ্ছ ঘটনায় আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু বলতে পারলাম না, তোর মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব।— কেন বলতে পারলাম না!

এসব কথা বলা যায় না, অনুভবের ভেতরে নতুন মাত্রা যোগ হয় শুধু।

ফোন রেখে দেবার আগে ছেলে বলল, আগামী রোববার দিনকয় ছুটি নিয়ে কোলকাতা যাচ্ছি। দ্যাখা হবে।

ইন্দ্রজিৎ আসছে শুনে দিনের অবসানও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এতকাল প্রতিক্রিয়াহীন আমার শরীরে-মনে নতুন প্রাণপ্রবাহ। ঘুমোতে যাবার আগে নতুন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, ঘুম

থেকে উঠে আবার একটা উজ্জ্বল দিন, এইরকম তিনটে দিন পার করে ইন্দ্রজিৎ আসবে, ওকে দেখব। ওর ছোটবেলা থেকে এই বয়েস পর্যন্ত অস্তিত্বের ভেতরে নিজেকে খুঁজব, কোনোদিন না-পাওয়া প্রতিষ্ঠাকে দেখব। জানতে পারব, পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণপ্রবাহের ভেতরে অন্তত একটি প্রবাহে আমার ভূমিকা আছে, আমারই প্রসৃতি এখন সেই প্রবাহকে বেগবান রেখেছে।

এইসব ভাবছি, তখন সেই লোকটা এসে উঁকি দিয়েছে। হেসে বলল, কিছু একটা খুঁজে পেলে নাকি! সারাৎসার কিছু?

আমি কিছু বললাম না। অনুভবে আমার সারাৎসার নিয়ে সন্তানের এগিয়ে যাওয়া। অন্য মাত্রা সেখানে। লোকটির কথা যেন শুধুই কথা, উত্তর দেবার আদৌ প্রয়োজন নেই, শুধু ভাবনাচিন্তা প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে—বেঁচে থাকা বা মৃত্যু এখন পক্ষ-প্রতিপক্ষ, কোনোটাই অনুভবকে জারিত করছে না, সমন্বিত ভাবনায় শুধু ছেলে, যে তিনদিন পর আসবে। ওকে দেখব, আমার প্রসৃতি আমার হাত থেকে দৌড়ের লাঠি নিয়ে এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে। যে পুরনো অবস্থানে আমি ছিলাম, সেখানে কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয় আর, জেনে গিয়ে ভারহীন মনে হচ্ছে। একটা ঘোর এসে আচ্ছন্ন করতে করতে দেখলাম, লোকটা কখন পাশ থেকে সরে গেছে।

এখন আর কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নেই। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়ে, দিন ও রাতের তফাৎ থাকল না। বালক, কিশোর, যুবক ও প্রৌঢ়ের মধ্যে তারতম্য নেই আর, ঘুমের ভেতরে যাওয়া না-যাওয়াতেও প্রভেদ নেই কোনো, এমনই এক অনিকেত বোধের ভেতরে নিজেকে চলে যেতে দেখছি আমি।